ছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা। মাতার নাম—মহামায়া। সনাতন মিশ্র সদাচারী ও ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। তাঁর পাণ্ডিত্যের যশও ছিল প্রচুর। রাজপণ্ডিত বলে সারা নবদ্বীপ অঞ্চলে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। এই সুপণ্ডিত ও বিত্তবান্ পিতার সংসারে আনুমানিক ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

কন্যা কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সনাতন মিশ্র ও তাঁহার পত্নী মহামায়া দেবী তাহার বিবাহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকেন। এ সময়ে স্থানীয় পণ্ডিত কাশীনাথ একদিন মিশ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। পাত্র স্বর্গত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, বিশ্বম্ভর। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দিক দিয়ে নবদ্বীপের সারস্বত সমাজে তাঁর জুড়ি নেই। এই তো সেদিন নবীন পণ্ডিত বিশ্বম্ভর পদ্মার ওপারে সফর করতে গিয়েছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব সেখানকার পণ্ডিত সমাজে এবং তরুণ বিদ্যার্থী মহলে স্বীকৃত হয়েছে, লাভ করেছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। এই সফর থেকে বিশ্বম্ভর বেশ কিছু অর্থও উপার্জন ক'রে এনেছেন।

কাশীনাথ বিশ্বম্ভরের মাতা শচীদেবীর দ্বারা নিয়োজিত। তাঁর মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে সনাতন মিশ্র আনন্দিত হয়ে ওঠেন। পত্নীকে বলেন, "সজ্জন আর বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বলে বিশ্বম্ভরের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সুনাম ছিল। তাছাড়া, পাত্র নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। কুলশীল আর বিদ্যাবত্তার দিক বিবেচনা ক'রে এ কাজ খুবই করণীয় বলে আমার মনে হয়।"

মহামায়া দেবী তো মহা উল্লসিতা। বলেন, বিশ্বম্ভরের রূপ কন্দর্পের মতো। আমার মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সে উপযুক্ত বর তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, শুনেছি বিশ্বম্ভরের চতুষ্পাঠী খুব ভাল চলছে, শচীদেবীর সংসার আজকাল অত্যন্ত সচ্ছল।"

কাশীনাথ সোৎসাহে বলতে থাকেন পাত্রের কথা, "অধ্যাপক হিসেবে বিশ্বম্ভর ইতিমধ্যেই বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। নবীন পড়ুয়ারা আজকাল তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়ার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র।

বিশেষ ক'রে, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে তর্কে পরাজিত করার পর থেকে তাঁর যশ ও প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছে। কুল শীল, রূপ, গুণ ও বিত্তের দিক দিয়ে বিশ্বম্ভরের মতো পাত্র নদীয়ায় আর কে আছে। হ্যাঁ, একটু খুঁত আছে, দোজবর। তবে প্রথমা স্ত্রীকে নিয়ে ক'দিনই বা সে ঘর করেছে? সব দিক বিচার করলে এমন পাত্র এ অঞ্চলে পাওয়া কঠিন।"

উত্তরে সনাতন মিশ্র জানান, "পণ্ডিত, এ বিয়েতে আমাদের মত আছে। শচীদেবীকে আপনি তাহলে প্রস্তুত হতে বলুন।"

"তিনি প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন।" সোৎসাহে বলেন পণ্ডিত কাশীনাথ: "নিজে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, একলাটি সংসার আর কতদিন আগলাবেন? তাছাড়া, বিশ্বম্ভর তাঁর একমাত্র পুত্র। বিদ্যারসে মত্ত হয়ে সে দিন কাটাচ্ছে, হঠাৎ কখন তার অগ্রজ বিশ্বরূপের মতো সেও বিবাগী হয়ে ওঠে, ঘর ছেড়ে পালায়, এজন্য শচীদেবীর শঙ্কার অবধি নেই। আপনার কন্যাকে বহুদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে দেখেছেন। বলেছেন, এ মেয়ে রূপসী তো বটেই, গুণপনাও তার কম হবে না। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরা, নম্র স্বভাবা ও সুলক্ষণযুক্তা। তাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে, অবিলম্বে পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে শচী তাকে ঘরে তুলতে চান।"

উভয় পক্ষের সম্মতি পাবার পর বিবাহের দিন ধার্য হয়ে গেল।

এই শুভ সংবাদে বিশ্বম্ভরের বন্ধু বান্ধবেরা সবাই মহা আনন্দিত। বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় বিশ্বম্ভরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী। উভয়ে এগিয়ে এলেন বিয়ের প্রস্তুতিতে সাহায্য করার জন্য। বুদ্ধিমন্ত খানের আর্থিক সঙ্গতি প্রচুর। সোৎসাহে তিনি বল্‌লেন, "এ বিয়েতে যা কিছু খরচ পড়বে, আমি তার ভার নেবো।"

মুকুন্দ সঞ্জয়ও পশ্চাদ্‌পদ নন, তিনি সোল্লাসে বলেন, "বিশ্বম্ভরের বিয়েতে আমারও তো কর্তব্য রয়েছে, ব্যবস্থাপনার কাজ আমি দেখাশুনা করবো।"

বুদ্ধিমন্তের উৎসাহ আনন্দ সবাইকে ছাপিয়ে ওঠে, পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলে দেন, "ভাখো ভাই, আমাদের নিমাইর বিয়ে

কিন্তু বামুনে ঢঙ-এ হতে দেবো না, খুব হৈ চৈ ক'রে, রাজসিক ভাবে, এটা করাতে হবে।"

বিয়ের অধিবাসের কি ঘটা। নবদ্বীপের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবারকে নিমন্ত্রণ করা হলো, আপ্যায়ন করা হলো মিষ্টি, গন্ধ, চন্দন তাম্বুল ও মাল্য দিয়ে। মনোহর বরবেশে বিশ্বম্ভরকে সাজিয়ে সাড়ম্বরে বর চলন করা হলো। চৈতন্য ভাগবত এই শোভাযাত্রার আনন্দোচ্ছ্বাস ও জৌলুসের বিবরণ দিয়েছেন :

দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভধ্বনি বই কোনো দিগে নাহি আর॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গাতীরে।
পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর।
চলিল হইয়া দুই সারি প্যাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে॥
নর্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয় ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল॥
বরগোঁ শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে বাদ্যভাণ্ড বাজি যায় কত॥

এ বিয়ের হৈ-হুল্লোড়ে সারা নবদ্বীপে প্রাণচাঞ্চল্য জেগে ওঠে। অনেকেই বলাবলি করতে থাকেন, কোনো বিয়েতে এত ধুমধাম বড় একটা চোখে পড়ে নি।

সনাতন মিশ্র বিত্তবান্ ব্যক্তি। তাছাড়া, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর একমাত্র সন্তান, তাই তাঁর গৃহেও সাজসজ্জা ও আড়ম্বর কম দেখা যায় নি। মনোহরমূর্তি বর দেখে সবাই পুলকিত। কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়েও বয়ে যায় এই পুলকের জোয়ার।

বিবাহান্তে দোলায় চড়ে বর বধূ যাচ্ছেন, আর আশপাশ থেকে মহিলারা হর্ষভরে বলে উঠছেন, "এযেন হরগৌরী চলেছেন।" কেউ বলছেন কামদেব আর রতির কথা, কেউ বলছেন—রামসীতা।

পরম সমাদরে পুত্রবধূকে বরণ ক'রে ঘরে তুললেন শচীদেবী। আজ তাঁর কি আনন্দের দিন। এ জীবনে পুত্রকন্যার শোক কম সইতে হয় নি তাঁকে। তারপর হারিয়েছেন প্রতিভাধর তরুণ পুত্র বিশ্বরূপকে, বাপ মায়ের বুকে শেল হেনে সংসার ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছে সে। তারপর ঘটেছে স্বামীর দেহান্ত, বালকপুত্র নিমাইকে নিয়ে দারিদ্র্যের সঙ্গে কি কম সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে? সে সংগ্রামে শেষটায় জয়ী হয়েছেন তিনি। দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন নিমাই তাঁর মানুষ হয়েছে, পাণ্ডিত্যে সে তরুণ অধ্যাপকদের অগ্রগণ্য, অজস্র সংখ্যক পড়ুয়া আজ ভিড় করছে তাঁর চতুষ্পাঠীতে। অর্থ মান যশ সবই অর্জন করেছে নিমাই। শুধু তাই নয়, সুলক্ষণযুক্ত রূপসী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ ক'রে সে নিয়ে এসেছে। অর্থশালী পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, কিন্তু শচীদেবীর পুত্র নিমাইও মানে যশে কম নয়। তাছাড়া, যে আড়ম্বরের সঙ্গে নিমাইর বিবাহ সুসম্পন্ন হলো, তাই বা নবদ্বীপে কে কবে ঘটতে দেখেছে? শচী-দেবীর চোখ মুখ আজ তাই আনন্দে হাসিতে আত্মতৃপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। আর কিশোরী নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া? অসামান্য স্বামীর গৌরবে তিনি গরবিনী। কন্দর্পের মতো রূপ নিমাইর। বিদ্যার দীপ্তিতে আননখানি সদা ঝলমল করছে। এই অল্পবয়সে অধ্যাপনা বৃত্তির শীর্ষে আরোহণ করেছেন তিনি। রূপে এমন স্বামী পাওয়া ক'জনার ভাগ্যে ঘটে? বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় তাই প্রেমে পুলকে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে।

বিশ্বম্ভরও কম খুশী নন এই বিবাহে। কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া

অনিন্দ্যসুন্দরী, রূপে গুণে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সে অতুলনীয়া। রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র তাঁর একমাত্র কন্যাকে রাজরানীর মতোই গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক-রাজ বিশ্বম্ভরের সংসারটিতে তার আবির্ভাব ঘটেছে রাজরানীরই মতো। এই কিশোরী বধূর প্রেমের দুর্বার জোয়ারে বিশ্বম্ভর আজ ভেসে চলেছেন পরম আনন্দে।

বিশ্বম্ভরের এ সময়কার অধ্যাপক মূর্তিটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে সাধক-কবি বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে:

শিষ্য সঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব মনোহর॥
হাস্যযুত শ্রীচন্দ্র বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্যদৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব কলেবর॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্র রূপে তহি অনন্ত বিজয়॥
শ্রীললাটে উর্ধ্বে সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন॥

বিশ্বম্ভরের সুগৌর কান্তি, বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্ব দেখিয়া সবাই তাঁহার প্রশস্তি করেন, কেউ কেউ বলেন এমন তেজ সাধারণ মানুষের সম্ভবে না, এই তরুণ অধ্যাপকের জন্ম হয়তো বা বিষ্ণু অংশে।

বিষ্ণুপূজা, অধ্যাপনা, গঙ্গাস্নান ও বিদ্যাচর্চায় অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের দিনরাতের বেশীর ভাগ অংশ কেটে যেতো। জননী শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গেও অনেকটা সময় তিনি হাস্য পরিহাসে অতিবাহিত করতেন।

অবধূত নিত্যানন্দ তখন সবেমাত্র নবদ্বীপে এসে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। সুদর্শন সদানন্দময় প্রাণোচ্ছল এই যুবকটিকে শচীদেবী গ্রহণ করেছেন তাঁর পুত্রস্নেহ দিয়ে।

শচীদেবী সেদিন রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর সবিস্তারে তা বর্ণনা করলেন পুত্র বিশ্বম্ভরের কাছে। বললেন, "বাবা নিমাই, আমি স্বপ্নে দেখলাম, নিত্যানন্দ আর তুমি এ দু'জনেই যেন পাঁচ বছরের বালক হয়ে গিয়েছ আর দু ভাই সারা বাড়িময় দৌরাত্ম্য ক'রে বেড়াচ্ছো। এক সময়ে তোমরা আমার ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকলে, আর অমনি সেখানে আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণ বলরাম দু ভাই। তারা বললেন, তোমরা কে বলতো ? আমাদের এ ঘরে ঢুকেছো কার নির্দেশে ? এই ঠাকুরঘরে দুধ, দই, সন্দেশ, ক্ষীর যা কিছু নিবেদন করা হয়েছে, তা সবই আমাদের। তোমরা এ সবের কিছুই পাবে না।"

"বল কি মা, তোমার ঠাকুরেরা তো বড় ঝগড়াটে, নিবেদিত বস্তু কাউকে খেতে দেবেন না ?" রসিকতা করিয়া বলেন বিশ্বম্ভর।

"তা বাবা, আমার নিত্যানন্দও বড় কম যায় না। সে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিল, 'দ্যাখো, তোমাদের সেকাল কিন্তু আর নেই, সব বদলে গেছে। সেটা ছিল গোয়ালার যুগ, তাই তোমরা হৈ-হুল্লোড় ক'রে দই মাখন সব লুটেপুটে খেয়েছো। এটা ব্রাহ্মণদের যুগ, এবারে আমরা এসব খাবো, ভালোয় ভালোয় তোমরা সরে পড়ো, নইলে মেরে ঢিট্ ক'রে দেবো।'

"এভাবে ঝগড়াঝাঁটি চললো কিছুকাল, তারপর তোমরা চার-জনেই ঠাকুরের ভোগ কাড়াকাড়ি ক'রে খেলে। তারপর নিত্যানন্দ ডাকলো—মা, আমায় কিছু খেতে দাও। অমনি আমার ঘুম ভেঙে

গেল। ভোরবেলার স্বপ্ন প্রায়ই ফলে যায়। তা বাবা নিমাই, আমি তো এ স্বপ্নের কোনো মানে বুঝতে পারছিনে।”

সরমে জড়িতা নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া দোরের পাশে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনছিলেন। তাঁর দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সুরসিক বিশ্বম্ভর বললেন,—

বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কারো ঠাঁই পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্ত তোমার স্বপ্নেতে হৈল দড়॥
মুঞি দেখোঁ বারে বারে নৈবেদ্যের কাজে।
আধা আধি থাকে, না কহি কারে লাজে॥

এবার দোরের পাশে দাঁড়ানো বিষ্ণুপ্রিয়াকে শোনাবার জন্য একটু উচ্চতর কণ্ঠে বিশ্বম্ভর সহাস্যে বলে ফেললেন,

তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥

(চৈ-ভাগবত)

স্বামীর এই পরিহাস নিপুণতায় বিষ্ণুপ্রিয়াও হেসে ওঠেন আড়াল থেকে।

এই পরিহাস বাক্যের মধ্য দিয়ে তাঁর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনের সুখ সৌন্দর্য যেমন প্রতিভাত হয়, তেমনি বুঝা যায় কৃষ্ণরসে রসায়িত পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একটি প্রাণবন্ত আনন্দময় তরুণ স্বামী, পত্নীর জন্য যার আদর এবং ভালবাসার অবধি নেই।

কবিকর্ণপুর রচিত নাটকের এক সংলাপের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি বিশ্বম্ভরের প্রেম ও মমত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠ্‌তে দেখি।

শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে বিশ্বম্ভর সেদিন ইষ্টগোষ্ঠী করছেন। সহসা প্রবীণ আচার্য অদ্বৈতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রভু

রহস্যভরে বললেন, "জয় হোক আমাদের এই সীতাপতির, কীর্তিতে যিনি অনুপম—"

রসিকতা ক'রে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে সীতাপতি অর্থাৎ কীর্তিমান্ রামচন্দ্র রূপে অভিহিত করছেন, কিন্তু তার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর কথা।

আচার্য বৃদ্ধ হলেও পরিহাস নৈপুণ্যে কম নন, তিনি উত্তর দিলেন "এখানে রঘুনাথ কই ? বিরাজিত রয়েছেন দেখছি, স্বয়ং যদুপতি রূপে আপনি স্বয়ং।" প্রভুকে যদুপতি কৃষ্ণের অবতার বলে অভিহিত করলেন আচার্য।

ভক্তপ্রবর শ্রীবাস মুচকি হেসে টিপ্পনী কাটলেন, "এ কথা ঠিক। তবে এ আমলে দেখছি 'ভক্তি' হয়েছেন তিরোহিতা।" যদুপতি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি রাধা কাছে নেই, এই ইঙ্গিত দিলেন শ্রীবাস।

প্রভুর উত্তর, "তা হবে কেন ? আপনাদের মতো মহাবৈষ্ণবদের সঙ্গেই যে যুক্ত রয়েছেন শ্রীবিষ্ণু-ভক্তি।"

উচ্চ হাস্য ক'রে অদ্বৈত আচার্য মন্তব্য করেন, "যদুপতি কৃষ্ণ ইদানীং সেবিত হচ্ছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার দ্বারা।"

বলা বাহুল্য, এ কথায় উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল।

এমন সময়ে ঘরের ভেতর থেকে বিশ্বম্ভর জননী শচীদেবী বলে পাঠালেন, অদ্বৈত আচার্য যেন তাঁর গৃহেই সেদিন ভোজন ও বিশ্রাম সম্পন্ন করেন।

ভক্তপ্রবর শ্রীবাসও সোৎসাহে এ অবসরে নিজের দাবিটি রাখলেন প্রভুর কাছে, "তা হলে, এ বাড়িতে আমার ভোজনটিও হতে পারবে।"

প্রভু বিশ্বম্ভর জানেন, নিত্যকার রন্ধনের জন্য বেশীর ভাগ পরিশ্রম করেন নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, বৃদ্ধা শাশুড়ীকে বেশী পরিশ্রম করতে দিতে তিনি রাজী নন। তাই আসল কথাটি উহ্য রেখে প্রভু বললেন, "এত লোকের জন্য রান্না করতে এঁর বড় পরিশ্রম হবে।"

অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে কোণঠাসা করার এ সুযোগ ছাড়লেন না।

বললেন, "প্রভু, বলুন—এঁর নয়, তাঁর।" দূরে রন্ধনশালায় কর্মরতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য ক'রেই আচার্য বললেন—'তাঁর'

বিষ্ণুপ্রিয়ার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি প্রভু উদাসীন তো ছিলেনই না, বরং যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখতেন। এবং এ কথাটি তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত-মহলের সবারই জানা ছিল।

বিদ্যার অপরূপ বিলাস ছিল তরুণ অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের, সেই সঙ্গে ছিল তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রতিভার দীপ্তি। গঙ্গাতীরে শিষ্যগণ সহ যখন তিনি তাঁর বিদ্যাচক্রে উপবেশন করতেন, কেউ তাঁর এবং তাঁর মণ্ডলীর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারতো না। নদীয়ার নরনারী মাত্রেই বিদ্যাবিলাসী এবং বিদ্যাদর্পী মহাপ্রতিভাধর এই বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে জানতেন। জানতেন বিষ্ণুপ্রিয়াও।

গঙ্গাতীরে যে যে জনে দেখে প্রভুর মুখ।
সেই পায়ে অতি অনির্বচনীয় সুখ ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্বজন ॥
কেহো বোলে "এত তেজ মানুষের নহে ;"
কেহো বোলে "এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়ে ॥"
কেহো বোলে "বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি ; কথনো না নড়ে ॥
রাজচক্রবর্তি-চিহ্ন দেখিয়ে সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি বল ॥
অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গা-সমীপে বসিয়া ॥
'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে, 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল স্থাপয় ॥
প্রভু বোলে "তারে আমি বলিয়ে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥

সেই বাক্য যদি বাখানিয়ে আর বার।
আমা' প্রবোধিবে, হেন দেখি শক্তি কার ?"
এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব-গর্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সভার॥

(চৈ-ভাঃ ১৷৯)

অধিক রাত্রে স্বামী তাঁর বিদ্যাচক্র থেকে গৃহে ফিরতেন, শ্রান্তি অপনোদনের পর বসতেন গৃহের বিষ্ণুপূজায়। ভোগরাগ প্রদান ক'রে বসতেন ভোজনে। এ সময়ে জননী শচীদেবী আর বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া সযত্নে করতেন আহার্য পরিবেশন। তারপর শয়নগৃহে একান্তে তাঁর সেবার অধিকার পেতেন বিষ্ণুপ্রিয়া, আনন্দে হয়ে উঠতেন উচ্ছল।

কৃষ্টিবান্, ধনী রাজপণ্ডিতের একমাত্র সন্তান বিষ্ণুপ্রিয়া। জন্মাবধি লালিতা হয়েছেন পরম যত্নে, বাল্য ও কৈশোর তাঁর অতিবাহিত হয়েছে পরম সুখে। স্বামীর ক্ষুদ্র ও সচ্ছল সংসারটিতে আসার পর থেকে সে সুখ দিন দিন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাশুড়ী দেব দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণা এবং পূতচরিত্রা। একমাত্র পুত্রের বধূ, রূপসী ও গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেন তিনি নিজের কন্যাটির মতো। তাঁর স্নেহ ও সমাদরে বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূত। প্রাণপ্রিয় পতি বিশ্বম্ভরের আদর সোহাগের তো অবধিই নেই, তাঁর স্নেহ-প্রেম রসে অভি-সিঞ্চিত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন।

বিয়ের পর থেকে যে স্বামীকে তাঁর পাশে বিষ্ণুপ্রিয়া দণ্ডায়মান দেখেছেন তিনি কন্দর্পকান্তি নয়নমন লোভন পুরুষ, যুবা বয়সেই অপরিসীম তাঁর ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য, নদীয়ার শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক রূপে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। সব চাইতে বড় কথা, তিনি অসামান্য প্রেমিক ও রসিক-পুরুষ, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর অনুরাগের তুলনা নেই। এই স্বামী-সৌভাগ্য যে কোনো পুরনারীর ঈর্ষার বস্তু।

স্বামী সোহাগিনী তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়ার এ অনন্য সুখ সৌভাগ্য কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। বিধির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে হঠাৎ একদিন এই সৌভাগ্যময় জীবনে ছেদ পড়ে যায়। জীবনসর্বস্ব স্বামীকে চিরতরে

হারান বিষ্ণুপ্রিয়া। চরম দুঃখ দহনের মধ্য দিয়ে, তীব্র জ্বালার মধ্য দিয়ে, প্রকাশিত হয় তার জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। সে অধ্যায় আত্মিক সাধনার সিদ্ধিতে ভরপুর। ইষ্ট ও পতি ও দয়িতের পরম-প্রাপ্তির আলোয় তা সমুজ্জ্বল।

সে-বার গয়ায় পিতৃকার্য করতে গিয়েছেন বিশ্বম্ভর পণ্ডিত। এই সময়ে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শনের পরই তাঁর জীবনে ঘটলো এক বৈপ্লবিক রূপান্তর। দিব্য প্রেমরসে রসায়িত হয়ে উঠলো তাঁর সারা দেহ মন প্রাণ। দুই নয়ন থেকে অঝোর ধারে ঝরতে লাগলো পুলকাশ্রু। অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখা দিল তাঁর ভাবাপ্লুত দেহে।

বিধির বিধানে প্রেমভক্তিরসের সিদ্ধ সাধক ঈশ্বরপুরী সেদিন গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে উপস্থিত। দিব্যদর্শন এই তরুণ অধ্যাপককে তিনি জানেন বহুদিন থেকে। নবদ্বীপে এর পিতার গৃহে তিনি পদার্পণও করেছেন একাধিক বার।

ঈশ্বরপুরী উপলব্ধি করলেন, বিশ্বম্ভরের জীবনে এবার এসেছে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা। ঈশ্বর প্রেরিত এই যুবক, এবার ঐশ্বরীয় কর্ম তাঁকে উদ্‌যাপন করতে হবে।

কৃপাভরে ঈশ্বরপুরী এবার বিশ্বম্ভরকে দান করেন দশাক্ষরী কৃষ্ণমন্ত্র। এই চৈতন্যময় মন্ত্র তরুণ বিশ্বম্ভরের সারা সত্তায় এনে দেয় বিস্ময়কর আত্মিক উজ্জীবন। প্রেমভক্তির রসপ্রবাহ উৎসারিত হতে থাকে তাঁর অন্তস্তল থেকে। নবকিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করেন বিশ্বম্ভর। তারপর এই মূর্তির অন্তর্ধানে হয়ে ওঠেন উন্মত্তের মতো। 'কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার কৃষ্ণ' বলে হাহাকার করতে থাকেন নিরন্তর।

এই দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাপূত স্থানে যাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অতঃপর সঙ্গী বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নবদ্বীপে।

পূর্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকে সর্বক্ষণ ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে ॥
"স্বামী নিলা কৃষ্ণ! মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ! এই দেই বর।
সুস্থচিত্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বম্ভর ॥"
লক্ষ্মীরে[১] আনিঞা পুত্রসমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চা'য় ॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
"কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!" বোলে অনুক্ষণ ॥
কথনো কথনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে ॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে ॥

(চৈ-ভাঃ ২।১)

বিষ্ণুপ্রিয়া আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর স্বামীর? তবে কি এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা? অথবা উন্মাদ রোগ? যে স্বামীর হাতে হাত সঁপে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে সংসার জীবন তিনি শুরু করেছিলেন, সে যেন আজ কত দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কোন্ অজানা লোকের দিকে ক্রমে সরে সরে যাচ্ছে।

টোলের ছাত্রেরা সবাই এসে শচীমার কাছে অভিযোগ জানায়, অধ্যাপক বিশ্বম্ভরের পক্ষে আর তাদের পড়ানো মোটেই সম্ভব নয়। যে কোনো গ্রন্থের সূত্র বা ব্যাখ্যায় কৃষ্ণরসকে, কৃষ্ণতত্ত্বকে তিনি

---

১ ভক্তকবি বৃন্দাবন দাস বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম উচ্চারণ না ক'রে তাঁকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করেছেন।

টেনে নিয়ে আসেন, কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দাম স্রোতে কোথায় যেন তিনি ভেসে চলে যান।

দোরের আড়াল থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া শোনেন সব কথা। নয়নের জলে বসন ভিজে ওঠে। ঘন ঘন ছাড়েন দীর্ঘশ্বাস।

শেষটায় ছাত্রদের বলে দেন বিশ্বম্ভর, "ভাই, আমার অবস্থা তোমাদের বলে বুঝাবার নয়। দুচোখ দিয়ে আমি যে দিকে তাকাই, কেবলি দেখি কৃষ্ণময়। কৃষ্ণবর্ণ এক কিশোর মুরলী বাজিয়ে আমার প্রাণমন কেড়ে নিচ্ছে। শ্রবণে অবিরাম কেবলি আমি শুনতে পাই কৃষ্ণনাম। আমার পক্ষে তোমাদের পাঠ নেওয়া, তাই আর সম্ভব নয়, তোমরা আমায় মার্জনা করো।"

এরপর কৃষ্ণভক্ত একদল লোক নিয়ে বিশ্বম্ভর মেতে ওঠেন কীর্তনানন্দে।

ভক্ত বৈষ্ণবদের কারুর কারুর অন্তরে হয় আশার সঞ্চার। বিদ্যাদর্পী বিশ্বম্ভর পণ্ডিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। হরিনাম কীর্তনে কত লোককে মাতিয়ে তুলেছেন। তাঁরা প্রাণ খুলে বিশ্বম্ভরকে বলেন তাদের মনের কথা, "ভাই, পাষণ্ডীদের অনাচারে দেশ ভরে উঠেছে। তোমার ভেতরে ভক্তিপ্রেমের এই ভাবতরঙ্গ দেখে আমরা মহা উল্লসিত। আশা হচ্ছে, তোমাকে কেন্দ্র ক'রে, ভগবান এক নূতন যুগের অভ্যুত্থান সম্ভব ক'রে তুলবেন।"

ভক্ত বৈষ্ণবেরা পাষণ্ডীদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকেন সদাই, এবার সাহস ক'রে বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের কাছে নিবেদন করেন তাঁদের দুঃখময় নৈরাশ্যময় জীবনের কথা। কৃষ্ণ-পাগল বিশ্বম্ভর উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তাদের মর্মব্যথা জেনে। ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে বিশ্বম্ভরের ঐ সময়কার মানসিক অবস্থার পরিচয় আমরা পাই :

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিঞা ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাঢ়িল প্রচুর॥
"সংহারিব সব" বলি করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বোলে বারেবার॥

ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মূর্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষেণে মারিবারে যায়॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে॥
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সভারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যবহার॥
"বিধাতা যে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন॥
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষেণে হাসে, ক্ষেণে কান্দে, ক্ষেণে মূর্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষেণে বোলে "ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা"॥
ক্ষেণে গিয়া গাছের উপরডালে চড়ে।
না মেলে লোচন, শূন্য পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না স্ফুরে॥"

(চৈ-ভাঃ ২।২)

সাধারণ মানুষ দিব্যোন্মাদের কি বুঝবে? অষ্ট সাত্ত্বিক প্রেমবিকার কখনো তারা চোখে দেখে নি। বিশ্বম্ভরের এই অবস্থা দেখে তারা শচীদেবীকে বলে, "ওগো, বায়ু-রোগ হয়েছে তোমার পুত্রের, বৈদ্য ডেকে এনে ভালো ক'রে চিকিৎসা করাও, আর দেরি ক'রো না।"

শচীদেবী প্রমাদ গণেন। পুত্রের একি ব্যাধি হয়েছে তা বুঝে উঠতে পারছেন না। কি ক'রে কোন্ চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে উঠবে তাই বা কে জানে?

শ্রীবাস পণ্ডিত এ পরিবারের নিকট আত্মীয়, বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। শচীদেবী তাঁকে ডেকে পাঠালেন পরামর্শের জন্য।

দেখে শুনে শ্রীবাস বললেন, "ওগো, তোমার পুত্রের বায়ু রোগ হয় নি, হয়েছে কৃষ্ণভক্তির উদয়। এ অবস্থায় এসব হয়েই থাকে।

এখন,থেকে বিশ্বম্ভরের বিষয়ে কোনোরূপ দুশ্চিন্তা করবে না, কাউকে এসব কথা জানাবেও না।"

অদ্বৈত আচার্য নদে শান্তিপুরের প্রখ্যাত সাধক এবং ভক্তিধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তাঁর ওপর বৈষ্ণবদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। বিশ্বম্ভর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, মহাবৈষ্ণব অদ্বৈতের দর্শন পাওয়া মাত্র হুঙ্কার দিয়ে পড়েন ভূমিতলে, অত্যাশ্চর্য প্রেমবিকার প্রকাশ পায় তাঁর সারা দেহে। অদ্বৈত উপলব্ধি করেন, এ মহাভাবময় প্রেম মনুষ্যে সম্ভব নয়। ভাববিহ্বল হয়ে বিশ্বম্ভরকে তিনি অর্চনা করেন ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে।

প্রভুর এসময়কার ভাব শাবল্যের অপরূপ বর্ণনা পাই ভক্তকবি বৃন্দাবন দাসের লেখনীতে :

যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু 'শেষ'॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে নদী শতশত ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্টঅট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দ মূর্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ-ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে॥
সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥
অপূর্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নরজ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥

নবদ্বীপের পরিচিত অপরিচিত বহু লোকই দিনের পর দিন দেখতে আসে বিশ্বম্ভর মিশ্রকে সবাই বলাবলি করে, কত লোকই তো বৈষ্ণবের জীবন যাপন করছে, সাধন ভজন, কীর্তন নিয়ে আছে।

কিন্তু কই, তাদের শরীরে তো এধরনের অত্যাশ্চর্য সাত্ত্বিক বিকারের নিদর্শন ফুটে ওঠে না। বিশ্বম্ভরের দেহে মনে যা প্রকাশিত হচ্ছে, তা অতিমানবীয়। নিশ্চয় ঐশ্বরীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার মধ্যে।

কেহো বোলে "এ পুরুষ অংশ অবতার।"
কেহো বোলে "এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার॥"
কেহো বোলে "শুক কিবা প্রহ্লাদ নারদ।"
কেহো বোলে "হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥"
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে "কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি॥"
কেহো বোলে "এই বুঝি প্রভু অবতার।"
এইমত মনে সভে করেন বিচার॥
বাহ্য হৈলে ঠাকুর—সভার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
"কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন।"
বলিয়ে ছাড়য়ে শ্বাস, করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে।
প্রভু বোলে মোর দুঃখ করো নিবেদনে॥
প্রভু বোলে "মোহর দুঃখের অন্ত নাই।
পাইয়াও হারাইলুঁ জীবন-কানাঞি॥

(চৈ-ভাঃ ২।২)

বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে আসে বিশ্বম্ভরের এই ভাবোদ্বেল অবস্থার কথা। কৃষ্ণ বিরহে সদাই তিনি উন্মত্তবৎ বিচরণ করছেন।

"কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলে বিশ্বম্ভর একদিন আর্তনাদ করছেন, প্রিয় সখা গদাধর আশ্বাস দিলেন, "নিমাই, তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে এত উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছো কেন, কৃষ্ণ তো তোমার হৃদয়েই রয়েছেন বিরাজিত।" 'হৃদয়ে রয়েছেন' শুনে, প্রেমোন্মত্ত বিশ্বম্ভর নখ দিয়ে নিজের বক্ষ চিরে ফেলতে লাগলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করা হলো।

ঘরে ফিরে এসে যেটুকু সময় জননী ও জায়ার সঙ্গে অতিবাহিত করেন, তাতেও দেখা যায় এক অব্যক্ত মানসিক চঞ্চলতায় তাঁর দেহ মন তরঙ্গিত হচ্ছে, জীবনের পূর্বতন ছন্দ যেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

বিশ্বম্ভরের এই তীব্র প্রেমার্তি, কৃষ্ণবিরহের এই দহন জ্বালা অতঃপর ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, কিছুটা শান্ত ও আত্মস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। এবার কৃষ্ণ মিলনের আনন্দাবেশে অধীর হয়ে পড়েন, নটবর কৃষ্ণের লীলাময় ভঙ্গিমার করেন অনুকরণ। এ সময়ে আর তাঁর উদ্দামতা ও উন্মত্ততা নেই, আছে সুমধুর ভাববিলাস।

মাঝে মাঝে কৃষ্ণাবেশ ঘটে তাঁর অন্তরে, কৃষ্ণবেশে সজ্জিত করেন নিজের অনিন্দ্যসুন্দর দেহটি। বিশ্বম্ভরের এই মধুর ভাবটি বিষ্ণুপ্রিয়ার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ককে কিছু পরিমাণে হ্রাস করে। নটবর কৃষ্ণের মোহন বেশে স্বামীকে সানন্দে নিজ হস্তে তিনি সাজিয়ে দেন, ভাব-বিহ্বল হৃদয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে, স্বর্গীয় আনন্দে দেহ মন প্রাণ স্পন্দিত হতে থাকে।

কৃষ্ণভাবে সদা বিভাবিত বিশ্বম্ভরের এ সময়কার রূপসজ্জা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত কবি ও প্রখ্যাত কীর্তন বিশারদ বাসু ঘোষ যা লিখেছেন, আজো তা ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিত করে অগণিত ভক্তদের হৃদয়ে :

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেড়িয়াছে মালতীর মালে॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুলশাখা॥
কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ॥

তা দেখিয়া বাসু ঘোষ কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে॥

(ভক্তিরত্নাকর)

ভক্তপ্রবর বংশীবদন উত্তরকালে প্রভু-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া ও জননী শচীদেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি এসময়ে কৃষ্ণলীলার ভাবরসে মত্ত হয়ে কৃষ্ণ বলরাম বেশে নিজেদের সজ্জিত করতেন, নবদ্বীপের ভক্তদের হৃদয়ে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ উঠতো। বিষ্ণুপ্রিয়া আর শচীদেবীও এই মধুর লীলাবিলাস দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। অন্তত বায়ুরোগগ্রস্ত বা কৃষ্ণবিরহখিন্ন অবস্থায় বিশ্বম্ভর তাঁদের যেভাবে আতঙ্কিত করতেন, তা আর এখন নেই। বিশ্বম্ভরের নূতনতর ভাবাবেশ ও সাজসজ্জা তাঁদের আনন্দ আর তৃপ্তিরই খোরাক যোগাতো। বাসু ঘোষের পদের অনুরূপ একটি পদ লিখে বংশীবদন বিশ্বম্ভরের তৎকালীন মানসিকতার চমৎকার এক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন :

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শাওলী বলি ডাঁকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাঁইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমার আবেশ।
শিরে চূড়া শিখিপাখা নটবর-বেশ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন বলে চল গোবর্দ্ধন।

(পদকল্পতরু)

এই পর্যায়ের পর শুরু হয় বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্যপ্রকাশ। তাঁহার এই

প্রকাশের কাহিনী ভক্ত ও প্রতিবেশিনীরা বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বর্ণনা করতে থাকেন দিনের পর দিন। নিজভাবে সদা মত্ত, স্বতন্ত্র পুরুষ, অবধূত নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরকে বরণ ক'রে নিলেন তাঁর প্রভু রূপে। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ব্যাস পূজা করতে গিয়ে নিত্যানন্দ দর্শন করলেন বিশ্বম্ভরের দিব্য রূপ, ইষ্টজ্ঞানে তাঁর গলায় মাল্য অর্পণ ক'রে চিরতরে করলেন আত্মসমর্পণ। শুধু তাই নয়, নিজের পবিত্র দণ্ড কমণ্ডলু ভেঙে ফেলে অবধূত জীবনকে বিসর্জন দিলেন। বিশ্বম্ভরকে মেনে নিলেন নিজের প্রভুরূপে। অদ্বৈত আচার্য শ্রীবাস, মুরারী নিত্যানন্দ, গদাধর, নরহরি, পুণ্ডরীক, হরিদাস প্রভৃতি আপ্তকাম বৈষ্ণব সাধকদের জীবন এখন থেকে আবর্তিত হতে থাকলো প্রভু বিশ্বম্ভরকে, প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র ক'রে।

নিজের গৃহেও এ সময়ে প্রভু একদিন ঐশ্বরীয় ঐশ্বর্য কিছুটা প্রকটিত করেন। উদ্দেশ্য, জননী শচীদেবীকে প্রত্যক্ষভাবে, আর পরোক্ষে জায়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে, তাঁর বর্তমানের ঐশ্বরীয় সত্তা—ঐশ্বরীয় জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে একটু অবহিত ক'রে রাখা।

নিত্যানন্দকে প্রভু সেদিন তাঁর গৃহে ভোজনের জন্য আহ্বান করেছেন। আগেই তাঁকে বলা হয়েছে, "দ্যাখো শ্রীপাদ, তুমি কিন্তু শান্ত হয়ে বসে আহার করবে আমার সঙ্গে। মাঝে মাঝে প্রেমে বিভোর হয়ে তুমি উদ্দাম হয়ে যাও, উলঙ্গ হয়ে নৃত্য শুরু করো। আজ এসব কিছু ক'রো না, সংযত হয়ে ভোজনে বসবে।"

উভয়ে খেতে বসেছেন, রান্নাঘর থেকে থরে থরে ভোজ্যদ্রব্য সব বিষ্ণুপ্রিয়া এগিয়ে দিচ্ছেন, আর জননী অপার সন্তোষে দু ভায়ের পাতে তা ঢেলে দিচ্ছেন। সহসা শচীদর্শন করেন এক অপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য। বিশ্বম্ভর যেন রূপান্তরিত হয়েছেন এক জ্যোতির্ময় শ্যামল দিব্যশ্রীমণ্ডিত দিব্য পুরুষ রূপে। হস্তে তাঁর নানা আয়ুধ, আর তাঁর বক্ষস্থলে জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে বিরাজিত রয়েছেন বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া। এ বিস্ময়ের দৈবী দৃশ্য দেখে ভাবাবেগে অধীর হয়ে পড়েন শচীদেবী, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে।

সংবিৎ পাবার পর দেখা গেল, দেহ তার ভাবাবেশে ঘন ঘন কম্পিত হচ্ছে, বার বার ফেলছেন দীর্ঘশ্বাস, আর অস্ফুটস্বরে বলতে চাইছেন তাঁর বিস্ময়কর দর্শনের কাহিনী।

এরপর জননী শচীদেবীর পক্ষে আর গৃহকর্ম করা সম্ভব হলো না, ঘরের ভেতরে গিয়ে তিনি শয্যায় শায়িত হয়ে পড়লেন। বধূমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া রত হলেন তাঁর সেবায়, আর গৃহভৃত্য ঈশান বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের পাত্রাবশিষ্ট পরিষ্কার ক'রে ফেললেন।

শচীমাতার মুখে এদিনকার দিব্য দর্শনের সব কথা শ্রবণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বার বার মনশ্চক্ষে তাঁর ভেসে উঠতে থাকে বিশ্বম্ভরের অলৌকিকী জ্যোতির্ময় মূর্তি। বার বার অন্তরে গুঞ্জরণ করতে থাকে শ্বশ্রূমাতার প্রশ্ন—"বৌমা নিমাইর ঐ দিব্যমূর্তির বুকে আমি যে তোমার আলোয়-ভরা মূর্তিখানি দেখলাম! এ আবার কি রকমের দর্শন গো। বুঝতে পেরেছ তুমি কিছু?"

লজ্জানত বিষ্ণুপ্রিয়া মাথা নেড়ে জানান, এ দিব্য দর্শনের তত্ত্ব তাঁর জানা নেই।

কিন্তু স্বামীর দিব্য জীবনের, অলৌকিক জীবনের সত্যতা সেদিন দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরপটে। সেই সঙ্গে স্বামীর সহধর্মিণী রূপে তাঁর নিজের একটা দৈবী ভূমিকা রয়েছে, সে তত্ত্বটিও উপলব্ধি করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

পণ্ডিত বিশ্বম্ভর তাঁর বিদ্যাদর্প ত্যাগ ক'রে পরিণত হয়েছেন মহাবৈষ্ণবে, তরুণ ও বর্ষীয়ান্ বৈষ্ণব সাধকেরা তাঁকে নিয়ে শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রতিদিন নর্তন কীর্তন করছেন, এটাই এতদিন জানা ছিল। এবার জানা গেল, বিশ্বম্ভর "কাঁহা কৃষ্ণ মুরলীবদন বলে আর ক্রন্দন করছেন না, গ্রহণ করেছেন ঈশ্বরীয় ভাব। "মুঁই সেঞি, মুঁই সেঞি" বলে দাবি করছেন নিজের ভগবত্তার এবং সে দাবি তাঁর অনুগত ও সহধর্মী বৈষ্ণবেরা সোৎসাহে মেনে নিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, অদ্বৈত ও শ্রীবাসের মতো বয়োবৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ বৈষ্ণব, নিত্যানন্দের মতো সারা ভারত পরিক্রমাকারী সাধক এবং

অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তেরা বিশ্বম্ভরের অভিষেক উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন করেছেন, তাঁকে ঘোষণা করেছেন পরম-ঈশ্বর বলে, রাজরাজেশ্বর বলে।

শ্রীবাস-গৃহের পরম পবিত্র বিষ্ণুখট্টায় বসে দৃপ্তকণ্ঠে বিশ্বম্ভর নিজেই বলেছেন, "তোমরা আমার অভিষেক গীত গাও, আমার অভিষেক সম্পন্ন করো।"

একথা শোনার পর ভক্তেরা তো আনন্দে বিহ্বল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি পুরুষ সূক্ত পাঠ ক'রে গঙ্গাজলে তাঁকে স্নান করান, ষোড়শোপচারে করেন তাঁর পূজা-অনুষ্ঠান। আনন্দাশ্রু-পুলকিত নয়নে করেন তাঁর স্তুতিগান।

এই দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে বিশ্বম্ভর সাত প্রহরকাল অতিবাহিত করেন, তাঁর তখনকার ঐশ্বরীয় ভাব ও ঐশ্বর্য দেখে ভক্তেরা বিহ্বল হয়ে পড়েন।

বিশ্বম্ভরের এই অভিষেক-ক্রিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। এ ঘটনার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলার বৈষ্ণবদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে নি, বাংলার সাহিত্য, সংগীত, শিল্প অর্থাৎ সমগ্র সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

মুরারী গুপ্ত এবং কবিকর্ণপুর বিশ্বম্ভরের অভিষেক উৎসবের উল্লেখ করেছেন, নিত্যানন্দের মুখে শুনে বৃন্দাবন দাসও এই অভিষেক ও অর্চনার মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। ইহা অপেক্ষা বিশ্বস্ত বিবরণ আমরা পাই সেদিনকার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত বাসু ঘোষের রচিত পদে :

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজায়ে সুস্বরে।
গোরা চাঁদের অভিষেক করে সহচরে॥
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালি।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ্য থালী॥
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
তার জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের মুখ করে নিরীক্ষণ।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে॥

বিশ্বম্ভরের সেদিনকার এই ঐশ্বর্য প্রকাশের কাহিনী নদীয়ার ঘরে ঘরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। গৃহকোণে বসে তাঁর জননী শচীদেবী এবং জায়া বিষ্ণুপ্রিয়াও এই কাহিনী শুনতে পান। স্বভাবতই বিশ্বম্ভরের এই অভিষেক ও বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণবদের আনুগত্যের কথা শুনে তাঁর সাধন-শক্তি সম্পর্কে তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠেন।

গোবিন্দমাধব বাসুর ভণিতাযুক্ত একটি পদে দেখা যায়, স্বয়ং শচীদেবীও উৎসাহিতা হয়ে অন্যান্য বৈষ্ণব পরিবারের নারীদের সঙ্গে এই অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন :

তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরত্রি করিল।
নিমজ্জন করি শিরে ধান্যদূর্বা দিল॥ (পদকল্পতরু)

বিশ্বম্ভরের সাধন-জীবনের এই নব পর্যায়, তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবের এই ঐশ্বর্য প্রকটন স্বভাবতই তরুণী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে একটা নূতন অভিজ্ঞতার স্তরে এনে দাঁড় করায়। গয়া থেকে ফিরে আসার পর স্বামী কৃষ্ণরসে মজে ছিলেন, একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তরূপে সর্বত্র তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই ভক্তিরসের ভাবাবেগ ও মত্ততা কম্‌লে আবার তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন, এ আশা বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে পোষণ করছিলেন। কিন্তু এই অভিষেক ক্রিয়া, বিশ্বম্ভরের নিজের এই ভগবত্তার দাবি তাঁকে যেন জীবন-বিচ্ছিন্ন এক নূতন আত্মিক স্তরে সংস্থাপন ক'রে দিল। সে স্তরটি প্রেমময়ী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার নাগালের বাইরে। এই ভগবত্তা-আরোপিত নূতন বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তরুণী জায়া বিষ্ণুপ্রিয়ার পূর্বতন যোগটি যেন বিচ্ছিন্ন প্রায়।

পরবর্তী স্তরে দেখা যায় বিশ্বম্ভরের নূতনতর মহিমার প্রকাশ। তখন তিনি প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নামে বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে অভিহিত। তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাসের নাম-প্রচারণ

পাষণ্ডী জগাই মাধাই উদ্ধার শুধু সারা নবদ্বীপকেই নয়, সারা গৌড়-রাজ্যের মানুষকে মুগ্ধ ও বিস্মিত ক'রে তোলে।

তারপর দেখা যায় প্রভুর কাজীদমনের লীলা। সহস্র সহস্র ভক্ত বৈষ্ণব নিয়ে যেভাবে তিনি সুলতানের প্রতিনিধি কাজীকে তাঁর গৃহে অবরোধ করেন, তাঁকে নির্জিত ক'রে তাঁর ধর্মান্ধতা ভেঙে দেন, তা সমকালীন জনজীবনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে, সূচিত করে ধর্মাচরণের নূতনতর আত্মপ্রত্যয়।

এই ধরনের এক একটি ধাপ দিয়ে প্রেমধর্ম আন্দোলনের নেতা, ভগবৎ-শক্তির সংবাহক নেতা, বিশ্বম্ভর অগ্রসর হচ্ছেন আর তাঁর অলৌকিক মহিমা বিস্তারিত হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরে। গৃহকোণে বসে বিষ্ণুপ্রিয়াও দিনের পর দিন শুনতে পাচ্ছেন স্বামীর এইসব অলৌকিক কাহিনী, আর মনে মনে তাঁকে বরণ ক'রে নিচ্ছেন নিজের আত্মিক জীবনের প্রভুরূপে, দিক্‌দিশারী গুরুরূপে।

শ্রীবাস অঙ্গনের নর্তন কীর্তন শেষে ঘরে ফিরে এসে স্বামী যতক্ষণ ভাবাবেশে উন্মত্তপ্রায় থাকেন ততক্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর নিকটে থেকেও থাকেন বহুদূরে। ধরাছোঁয়া ও নাগালের বাইরে অবস্থিত, সাত্ত্বিক ভাববিকারসম্পন্ন এই প্রেমভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ তখন তাঁর দৃষ্টিতে আর মানব নয়, দেবতাস্বরূপ। তারপর ভাবাবেশ কেটে গেলে বিশ্বম্ভর যখন পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন, সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন, পতিব্রতা প্রেমময়ী স্ত্রীকে প্রেমভরে তিনি বুকে টেনে নেন, তখন এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

বিশ্বম্ভর কখনো এই মাটির পৃথিবীর মানুষ, কখনো বা অপ্রাকৃত ব্রজের লীলাময় দিব্য পুরুষ—তাই তো তাঁকে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিস্ময়, আনন্দ ও বিষাদের অবধি নেই।

কিন্তু স্বভাবজাত আত্মিক সংস্কার নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া জন্মেছেন, তাই মনে প্রাণে এ সত্যটিও তিনি উপলব্ধি করছেন যে, স্বামীর সহধর্মিণী হিসেবে তাঁর নিজেরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সে ভূমিকা কি তা এখনো তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের এই চাঞ্চল্যকর অবস্থা যখন চলছে, তখন কিছুদিনের জন্য তিনি পিতৃগৃহে চলে যান। ফিরে এসে দেখেন, বিশ্বম্ভরের জীবনস্রোত আরো দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে, একটা বিরাট রূপান্তর সাধিত হয়েছে তাঁর আত্মিক সাধনায়।

কৃষ্ণ-অনুরাগী বিশ্বম্ভর এবার হয়ে উঠেছেন মহাবৈরাগী। ঘর সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিয়েছেন তিনি। শ্রীবাস অঙ্গনের নৃত্যকীর্তন ভরা রসময় জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে, এবার তিনি চরম ত্যাগ বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করতে চান। বৈরাগীর দণ্ড ধারণ ক'রে জনজীবনের সমক্ষে দাঁড়িয়ে বলতে চান—সর্বময় কৃষ্ণকে যদি পেতে চাও তবে ত্যাগ করো তোমাদের সর্বস্ব, বৈরাগ্যের গৈরিকে রাঙিয়ে তোল তোমাদের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ জীবন যদি মাধুর্যময় ভগবানকে পেতে চাও, যদি ব্রজরস উপভোগ করতে চাও।

নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে বলেন বিশ্বম্ভর, "পাতকী উদ্ধারের ব্রত নিয়ে আমি আবির্ভূত হয়েছি, কিন্তু গৃহের ভোগসুখে জড়িয়ে থাকলে তো আমার আহ্বানে কেউ সাড়া দেবে না, ত্যাগ বৈরাগ্যময় সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করলে তবেই জনসাধারণ আমার ডাকে সাড়া দেবে, এগিয়ে আসবে; তবেই আমার উদ্ধারণ ব্রত উদ্‌যাপিত হবে।"

ভক্তেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রভু বিশ্বম্ভরের এই সন্ন্যাসের কথা শুনে। কিন্তু প্রভু তাঁর সংকল্পে অটল, তা থেকে বিচ্যুত করবে এমন শক্তি কারুর নেই।

জননী শচীদেবীকেও বিশ্বম্ভর একদিন জানিয়ে দেন তাঁর মনের কথা। আর্তস্বরে ক্রন্দন ক'রে ওঠেন জননী। একের পর এক পুত্রকন্যারা তাঁকে শোকসাগরে ভাসিয়ে লোকান্তরে চলে গিয়েছে। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর মাতৃহৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, তা আজো শুকায় নি। তারপর স্বামীহারা হয়েছেন শচীদেবী। নিঃসহায় নিঃসম্বল জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল তাঁর স্নেহের নিমাই—বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী স্বরূপিণী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে সে ঘরে

এনেছে, অধ্যাপনা-বৃত্তির ভেতর দিয়ে ঘর ভরে তুলেছে ধনসম্পদে। গয়া থেকে আসার পর 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, তা একরকম মন্দ ছিল না। কিন্তু এবার সে তাঁর অসহায়া জননীকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করতে চায়!

বিষাদখিন্ন জননীকে অনেক ক'রে প্রবোধ দেন বিশ্বম্ভর। ধর্মের কথা, শাস্ত্রের বিধানের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন, "যে মানব সাধন-ভজন ক'রে ভগবানকে না পায়, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতো নিষ্ফল তার জীবন। ভগবান কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য সন্ন্যাস আমায় নিতেই হবে মা। তবে সন্ন্যাসী হলেও, তোমার মত নিয়ে, তোমার কাছাকাছিই আমি বাস করবো। তোমার কোনো ভয় নেই, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যথাসাধ্য তোমার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশুনা করবেন।"

উন্মাদিনীর মতো হয়ে ওঠেন জননী। বিশ্বম্ভর এবার সান্ত্বনা দেন, "মা গো, এখনি তো আমি ঘর সংসার ছেড়ে যাচ্ছিনে, তুমি অমন ক'রে কেঁদে ভাসিও না। ধৈর্য ধর, শান্ত হও।"

মায়ের হাতের কোন্ কোন্ রান্না বিশ্বম্ভর উপাদেয় মনে করেন, এবার তার বর্ণনা দিতে থাকেন সোৎসাহে। এমনি ক'রে বৃদ্ধা জননীকে ভুলিয়ে দেন তাঁর আসন্ন বিচ্ছেদের কথা।

বিষ্ণুপ্রিয়া পিতৃগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। শাশুড়ীর মুখে, বিশ্বম্ভরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের মুখে, শুনতে পান স্বামীর সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছার কথা। বিষাদ আর দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে আসে তাঁর অন্তরে। অজানা আতঙ্কে বুক দুরু দুরু করতে থাকে। গভীর নিশায় শ্রীবাস অঙ্গনের নর্তন কীর্তন সেরে বিশ্বম্ভর ফিরে আসেন। বিশ্রাম এবং ভোজন শেষে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হন শয়নকক্ষে। এবার পতিকে জড়িয়ে ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া ফেটে পড়েন কান্নায়, অশ্রুজলে ভিজে যায় অঙ্গের বসন। বলতে থাকেন, "আমি শুনতে পেয়েছি সব কথা। আমায় চিরতরে ত্যাগ ক'রে তুমি সন্ন্যাস নেবে, স্থির করেছো। কিন্তু কেন? কি আমার অপরাধ? তা স্পষ্ট ক'রে বলো।"

বিশ্বম্ভর নানাভাবে তরুণী পত্নীকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার মন সে প্রবোধ বাক্যে শান্ত হয় না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমি বুঝেছি, আমি হচ্ছি তোমার প্রধান অন্তরায়, তাই আমাকে এড়ানোর জন্যই তুমি ঘর সংসার ত্যাগ করতে চাচ্ছো। বেশ তো, আমিই বরং এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। বাকী জীবনটা আমি বাপের সংসারে বাস ক'রেই কাটিয়ে দেবো। তোমার পায়ে পড়ি, তবু তুমি ঘরে থাকো। যেমনভাবে ভজন কীর্তন ও ইষ্টগোষ্ঠী ক'রে কাটাচ্ছো, তেমনি ক'রেই চলতে থাকো। আমি নিজেই তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি।"

পরম আদরে বিশ্বম্ভর পত্নীকে কাছে টেনে নেন, বলেন, "তুমি আমার পথের বাধা নও বিষ্ণুপ্রিয়া। ওকথা বলে আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি আজ কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। আমার কৃষ্ণের পথ রাজপথ, সবাই সে পথ দিয়ে যেতে পারে, লাভ করতে পারে তাঁকে। সে পথে তুমি, আমার সহধর্মিণী, কেন বাধা হতে যাবে?"

এ সান্ত্বনায় শান্ত হয় না বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা। অশ্রুর প্লাবন বয়ে চলে তাঁর দুই নয়নে।

বিশ্বম্ভর আবার বোঝান, "শান্ত হও বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার কথা ধৈর্য ধরে শোন। সন্ন্যাস নেবার কথা আমার মনে এসেছে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না কৃষ্ণের অমোঘ আহ্বান আসে, স্থির সিদ্ধান্ত আমি নিই কেমন ক'রে। কৃষ্ণের কৃপার ওপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে আছি আমি, আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। আমি চাইছি তুমিও আমার মতো কৃষ্ণভজনে মত্ত হও, কৃষ্ণ কৃপার জন্য সদা উন্মুখ হয়ে থাকো। নাম তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যকার বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে ওঠো তুমি, তাই আমি চাই। বিষ্ণুর মিলন পথে, কৃষ্ণের মিলন পথে, তুমিও এগিয়ে এসো, সে পথে তোমার আমার ভেতরে এতটুকু বিচ্ছেদ থাক্‌বে না। এসো কৃষ্ণসত্তায় পৌঁছে আমরা দুজনেই নিবিড়তর মিলন-সুখ সম্ভোগ করি।"

চতুর বিশ্বম্ভর সেদিন এমনিভাবে বিষ্ণুপ্রিয়ার শোকাচ্ছন্ন মনকে

প্রবোধিত করলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের নির্ধারিত দিনটির কথা আপাতত এড়িয়ে গেলেন।

শুধু তাই নয়, প্রিয়তমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিলেন তাঁর মনের সমস্ত কিছু শোক ও শঙ্কা।

স্বামীর আদরে সোহাগে প্রগল্‌ভা হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া। আবদার ক'রে বলেন, "আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আজ রাতে তোমায় মনের মতো ক'রে সাজাই, প্রাণভরে তোমার দেবদুর্লভ রূপ দেখি।"

সানন্দে সম্মতি দেন বিশ্বম্ভর। পতির প্রশস্ত ললাটে অজস্র চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন বিষ্ণুপ্রিয়া। নূতন ক'রে কাজল রেখা এঁকে দেন তাঁর আয়ত নয়ন দুটিতে। কণ্ঠে তাঁর দুলিয়ে দেন স্বহস্তে গাঁথা মালতীর শুভ্র মালিকা।

বিশ্বম্ভরের চোখে মুখে অপূর্ব আনন্দের দীপ্তি। সকৌতুকে বলেন, "এবার আমিও সাজাবো তোমায়, দেখবো তোমায় নব বধূর বেশে।

"পুরুষমানুষ আবার মেয়েদের সাজাতে জানে নাকি?" খল্‌ খল্‌ ক'রে হেসে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

দক্ষ সজ্জাকরের মতো বিশ্বম্ভর সাজিয়ে তোলেন তাঁর প্রিয়াকে। চন্দন, কুঙ্কুম আর কজ্জলের রেখায় রেখায় প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখকান্তি। সজ্জা শেষে দেখা যায় বিশ্বম্ভরের প্রেম সম্ভাষণ আর প্রগাঢ় আলিঙ্গন। আনন্দে উচ্ছল হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বম্ভরের জীবনে এসে গেল ইষ্টদেব কৃষ্ণের অমোঘ আহ্বান। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের এই দিনটিতে সংসার আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করলেন তিনি। প্রেরিত পুরুষের মহাজীবনে উন্মোচিত হলো এক নূতনতর অধ্যায়।

গভীর রাত্রি, বৃদ্ধা জননী পাশের ঘরে ঘুমন্ত। প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়াও শয্যায় শুয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। মরজীবনের এই বন্ধনের দিকে শেষ বারের মতো দৃষ্টিপাত করেন বিশ্বম্ভর, মনে মনে করেন চির বিদায় গ্রহণ। তারপর জননীর দ্বারের সম্মুখে নম্র নতি জানিয়ে দ্রুতপদে ছুটে চলেন কাটোয়ার দিকে। লক্ষ্য তাঁর

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর নিভৃত কুটির। সেখানে গিয়ে তাঁর সম্মুখে বসে বিরজা হোম সম্পন্ন ক'রে, গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস দীক্ষা, চিরজীবনের তরে ছেদ টেনে দেবেন গার্হস্থ্য-জীবনে।

অমঙ্গলের ইঙ্গিত সর্বাগ্রে ফুটে ওঠে মায়ের মনে। হঠাৎ এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় শচীদেবীর। নিমাইর শয়নঘরে এসে করেন করাঘাত। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বার বার ডাকেন, "নিমাই, আমার নিমাই।"

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া জেগে ওঠেন তাঁর নিদ্রা থেকে, পাশে তাকিয়ে দেখেন স্বামী শয্যায় শায়িত নেই, আর বাইরে থেকে বার বার শোনা যাচ্ছে শ্বশ্রূমাতার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর। আলুথালু বেশে ছুটে গিয়ে দ্বার খুলে দেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

"বৌমা, নিমাই আমার ঘরে রয়েছে তো, তার সম্পর্কে এক দুঃস্বপ্ন দেখে যে আমি হঠাৎ জেগে উঠলাম।"

ভীত চকিত হরিণীর মতো এদিক ওদিকে তাকান বিষ্ণুপ্রিয়া। অসহায়ার মতো বলে ওঠেন : "মা, তিনি তো নেই। নিঃশব্দে ঘরের দোর খুলে কখন বেরিয়ে পড়েছেন। কোথায় গেছেন, তা আমি জানিনে।"

মুহূর্তে নিজের এই চরম দুর্দৈবকে উপলব্ধি করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। বুঝলেন, স্বামী চিরতরে ত্যাগ করেছেন তাঁকে, ছুটে বেরিয়েছেন সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। কদিন ধরে এই দুর্দৈবের ছায়াপাতই তো বার বার হচ্ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্লোকে, আজ তা সংঘটিত হয়ে গেল। দৈবের বিধান নির্মম ক'রে মুছে দিয়ে গেল তাঁর দাম্পত্য জীবনের সকল কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা।

অন্তরের অন্তস্তল থেকে হুহু ক'রে উৎসারিত হলো কান্নার বন্যা, তারপর অসহায়ভাবে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

শচীদেবী তখনো তারস্বরে কেঁদে চলেছেন, ডাকাডাকি করছেন গৃহভৃত্য ঈশানকে, পরিবারের একনিষ্ঠ সেবক বংশীবদনকে। বলছেন তাদের, "ওরে, তোরা নিতাই, শ্রীবাস, আর সবাইকে ঝটিতি ডেকে

নিয়ে আয়, তাঁরা আমার নিমাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক, নইলে যে সর্বনাশ হবে। যা যা, তোরা, খুঁজে ছাখ, কোন্ পথে কোথায় নিমাই আমার চলে গেল।"

শেষ রাত্রে, শুক্লপক্ষের আলোয় ভরা আকাশের নিচে ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা একে একে জড়ো হলেন শচীদেবীর আঙিনায়। প্রভু, তাঁদের জীবন মরণের প্রভু, চলে গিয়েছেন। তাই তাঁদের সবাকার জীবনের আলো গিয়েছে নিভে।

নিত্যানন্দ প্রবোধ দিলেন শচীদেবীকে, "মা, তোমার নিমাই কাটোয়ায় গিয়েছে, আচার্য কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস নেবার জন্য। একথা কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে তিনি জানিয়েছিলেন আগে থেকে। আমরা এক্ষুনি কাটোয়ায় ছুটে যাচ্ছি। প্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে হয়তো পারবো না, কিন্তু, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার নিমাইকে নিয়ে আমি ফিরে আসবো, তোমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটাবো।"

নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন তখনি দ্রুতপদে ধাবিত হলেন কাটোয়ার দিকে। ভক্তজন আর প্রতিবেশীরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে ঘিরে রইলেন সংবিৎহারা শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

প্রত্যক্ষদর্শী তরুণ ভক্ত বংশীবদন সেদিনকার এই দুর্দৈবের এক বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন তাঁর শোকার্তি ও বিলাপ সমন্বিত পদে :

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা॥

আর কি দুভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথায় নাই॥
নির্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়॥

(পদকল্পতরু)

বিশ্বম্ভরের অন্তর্ধানের পর শচীদেবী আর বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েই শোকাচ্ছন্ন হয়ে বিলাপ করতে থাকেন তারপর সংজ্ঞাহীন হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়েন। প্রতিবেশিনী ও ভক্ত পরিবারের মহিলাদের যত্ন ও শুশ্রূষার ফলে তাঁদের চৈতন্য ফিরে আসে।

অতঃপর জানা গেল বিশ্বম্ভরের গতিবিধি। কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছ থেকে সন্ন্যাস-মন্ত্র নিয়ে ভারতী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হয়েছেন তিনি। নূতন নামকরণ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েও শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির সাধনা ত্যাগ করেন নাই। অবিরত মুখে জপে চলেছেন কৃষ্ণনাম, আর সমাগত নরনারীকে করজোড়ে বলছেন, "পরম প্রভু কৃষ্ণের নাম তোমরা কীর্তন করো, এই পাপময় কলিযুগে এছাড়া উদ্ধারের আর পথ নেই।" কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণনাম জপের জন্য শুধু অনুরোধ জানিয়েই প্রভু ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তাঁর ক্রন্দন আর আর্তি দিয়ে সবাইকে কাঁদাচ্ছেন। "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" বলে কেঁদে কেঁদে তিনি বৃন্দাবনের পথে চলছেন। আর যারা একবার তাঁর দেবদুর্লভ রূপ

দেখছে, তাঁর মুখের প্রাণ গলানো নাম শুনছে, তাদের দুচোখেও নামছে অশ্রুর ধারা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে উদ্বাহু হয়ে সবাই নৃত্য করছে, চলছে পিছে পিছে।

কখনো কৃষ্ণরসে আবিষ্ট হয়ে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে, কীর্তন করতে করতে প্রভু চলেছেন, আর নিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁর দেহকে আগ্‌লে রাখছেন সতর্কভাবে।

চতুর নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের পথ থেকে প্রভুকে ভুলিয়ে নিয়ে এলেন শান্তিপুরে। সেখানে অদ্বৈত আচার্যের গৃহে অতিথি হলেন প্রভু। এসংবাদ পেয়ে শত শত ভক্ত এসে জুটলো তাঁর দর্শনের জন্য। এই সুযোগে, প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে নিত্যানন্দ শচীদেবীকে আনয়নের জন্য উপস্থিত হলেন নবদ্বীপে।

কিন্তু শোকার্তা শচীমাতা আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকাতে পারেন না নিত্যানন্দ। প্রভুর অদর্শনের পরদিন হতেই এই দুই সর্বহারা নারী এক মুষ্টি অন্নও মুখে তুলে দেন নি।

নিত্যানন্দ শচীদেবীকে নিবেদন করলেন প্রভুর কথা। তারপর বললেন, "মা, তোমায় কথা দিয়েছিলাম প্রভুর সঙ্গে তোমার দর্শন ঘটাবো। সে সুযোগ উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চল শান্তিপুরে, সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবে।" একথা শুনে শচীদেবী যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

আবার বলেন নিত্যানন্দ, "শুনলাম, তোমরা এ কয়দিন উপবাসে রয়েছো। শিগ্‌গীর উঠে রান্নার যোগাড় করো। তোমরা অন্ন গ্রহণ না করলে, আমিই বা করি কি করে? আমি কিন্তু বড় ক্ষুধার্ত।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে উঠতে হলো, উভয়ে মিলে রন্ধন সমাপ্ত করলেন। পরিতোষ সহকারে নিত্যানন্দকে ভোজন করিয়ে, তারপর নিজেরা ভঙ্গ করলেন উপবাস।

এদিকে অঙ্গনে শিবিকা এসে উপস্থিত হয়েছে। শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ে তৈরী হয়ে এসে সামনে দাঁড়ান। এবার নিত্যানন্দকে

নিষ্ঠুরের মতো বলতে হয়; "মা, প্রভু বলে দিয়েছেন, শুধু তোমাকেই শান্তিপুরে নিয়ে যেতে। কিন্তু শ্রীমতীর যাবার নির্দেশ নেই।"

শচীদেবী বেঁকে দাঁড়ান, বলেন, "নিতাই, এ তোমাদের কেমন বিচার? বৌমা শুধু একটিবার নিমাইকে দেখতে পাবে না? বেশ, তাহলে আমার যাওয়া হবে না শান্তিপুরে।"

এবার এগিয়ে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়া। শান্ত ধীর স্বরে বলেন, "মা, আমি তাঁর কাছে গেলে তাঁর সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ হবে, হয়তো এজন্যই আমায় যেতে বারণ করেছেন। আমি সহধর্মিনী। তাঁর আচরিত ধর্ম রক্ষা করা আমারই কর্তব্য। কিন্তু আপনি কেন যাবেন না? তিনি যে আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন।"

শাশুড়ীকে নানাভাবে বুঝিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে রওনা ক'রে দেন। সবাই চলে গেলে, ঘরের দুয়ার বন্ধ ক'রে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়েন, শয্যা গ্রহণ করেন ভূমিতলে।

হৃদয়ভেদী হাহাকার জেগে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকে। হায়, স্বামীভাগ্যে সারা নদীয়ায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। তাঁর মতো এমন পাওয়া কেউ পায় নি। আবার সেই পরম পাওয়াকে হারিয়ে ফেলে এমন মর্মছেঁড়া কান্নাও কেউ কাঁদে নি।

সন্ন্যাসী পুত্রকে নীলাচলে বাস করার কথা বলে শচীদেবী ফিরে এলেন শান্তিপুর থেকে। কিন্তু অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দেবেন তিনি কি ক'রে? নবদ্বীপে ফিরে এসে বধূকে জড়িয়ে ধরলেন দুহাত দিয়ে, তারপর সংজ্ঞাহীনা হয়ে লুটিয়ে পড়লেন গৃহের অঙ্গনে।

বিরহের দুঃসহ আগুন ধিকিধিকি ক'রে জ্বলছে বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে। এবার এ হৃদয় বুঝি পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। কিন্তু এ দুঃসহ আগুনের তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাঁকে।

পুত্রশোকে বিহ্বল শাশুড়ীকে যে তাঁকেই সতর্কভাবে আগলে রাখতে হবে, নিরন্তর সেবা পরিচর্যা দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতে হবে। চির-আরাধ্য স্বামীর, পরমপ্রিয় প্রাণপ্রভুর, জননী মৃতকল্প হয়ে

রয়েছেন, আর রয়েছেন বিষ্ণুপ্রিয়ারই উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে। তাই শাশুড়ীর সেবাও হয়ে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার আচরণীয় ধর্মকর্মের এক বৃহৎ অংশ।

এই নূতন পরিস্থিতিতে নিজের জন্য নূতন দিনচর্যার ব্যবস্থা করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। ভোগের পথ চিরতরে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রময় পথটি বেছে নিয়েছেন তাঁর স্বামী। তাই সেই ভোগের পথ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়াও সরে এলেন, গ্রহণ করলেন কঠোর বৈরাগ্য আর তপস্যাময় জীবন।

রাত্রিশেষের অন্ধকার যখন তরল হয়ে আসে, নিঃসীম আকাশে দেখা যায় বিবর্ণ তারামণ্ডলের স্পন্দন, প্রাক্-প্রত্যূষের সেই জনবিরল গঙ্গায় প্রতিদিন স্নান সমাপন ক'রে আসেন বিষ্ণুপ্রিয়া। সারা দিন রাতে আর কেউ তার দর্শন পায় না।

বিষ্ণুপূজার কক্ষে বসে, একপাশে তুলে রাখা পতিদেবতার কাষ্ঠ-পাদুকার সম্মুখে ধ্যান জপে তিনি নিবিষ্ট হন। বেলা বৃদ্ধি পেলে শাশুড়ীর স্নান-আহার ও সেবা পরিচর্যায় কিছুটা সময় ব্যয়িত হয়। বাকী সময়টা আবার তিনি অতিবাহিত করেন ধ্যান জপে। স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী ইষ্টরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন পরমপ্রভু কৃষ্ণকে। তাই গভীর রাত অবধি বিষ্ণুপ্রিয়া নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করেন তাঁর ভজন সাধন।

স্বামীর প্রতিটি কথা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরপটে। একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমি যেমন কৃষ্ণের ভজন করছি, কৃষ্ণরসে মজে আছি, তুমিও তেমনি করো। কৃষ্ণসত্তার ভেতর দিয়েই ঘটবে আমাদের মিলন, আর সে মিলন হবে ছেদহীন, অন্তহীন।"

তাই নিত্যকার কর্ম, কৃচ্ছ্র সাধন, ধ্যান জপে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সেই বাণীকে অনুসরণ ক'রে চলেছেন, চলেছেন কান্নাময় বিরহ-পথ দিয়ে চিরমিলনের কেন্দ্রবিন্দুটি লক্ষ্য ক'রে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতি বৎসর গৌড়ীয়া ভক্তেরা চাতুর্মাস্যের সময় নীলাচলে যান এবং তাঁকে দর্শন ক'রে, তাঁর প্রেমময় সান্নিধ্যে থেকে, অপার আনন্দে মগ্ন হন।

এই ভক্তদের মধ্যে যাঁরা নবদ্বীপে আসেন, তাঁরা প্রভুর শোক-সন্তপ্তা মাতা ও জায়াকে নীলাচলের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু সংবাদ প্রদান করেন। নানা কাহিনী শুনে উভয়ে যেন প্রাপ্ত হন নব জীবন। তাঁদের মুখে প্রভুর জীবনচর্যা ও লীলাকথা শ্রবণ ক'রেই শচী-মা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

চৈতন্য-প্রভুর ভক্ত এবং আত্মীয়, চন্দ্রশেখর আচার্য, তাঁর একটি পদে শোকার্ত নবদ্বীপ ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার এক করুণ চিত্র দিয়েছেন। নীলাচল প্রত্যাগত ভক্ত জগদানন্দের প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতেই এটি এঁকেছেন তিনি :

ক্ষণেক রহিয়া,	চলিয়া উঠিয়া,	পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে,	দেখে ঘরে ঘরে,	লোক সব নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার,	না করে আহার,	কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী,	কান্দয়ে গুমরি,	থাকলে বিরহে বসি ॥
দেখিয়া নগর,	ঠাকুরের ঘর,	প্রবেশ করিল যাই।
আধমরা হেন,	ভূমে অচেতন,	পড়িয়া আছেন আই ॥
প্রভুর রমণী,	সেই অনাথিনী,	প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন,	মলিন বসন,	মুদল নয়ানে ধারা ॥
দাসদাসী সব,	আছয়ে নীরব,	দেখিয়া পথিক জন।
সোধাইছে তারে,	কহ দেখি মোরে,	কোথা হতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন,	মোর আগমন,	নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর,	পাঠাইল মোরে,	তোমাসভারেদেখিতে ॥
শুনিয়া বচন,	সজল নয়ন,	শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন	চলিল তখন,	শ্রীবাস মন্দিরে ধায়্যা ॥
শুনিয়া শ্রীবাস,	মালিনী উল্লাস,	যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল,	অমনি ধাইল,	পরাণ পাইল আসি ॥

মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া, উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইল গৌরহরি॥
শুনি শচী আই, সচকিত চাই, দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তাঁর ঠাঁই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা, পণ্ডিত কাঁদিয়া কয়।
সেই গোরামণি, যুগে যুগে জানি, তুয়া প্রেমে বশ হয়॥
হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত, সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে, সভাকারে সুখ দিয়া॥
চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর, বিষয়-বিষেতে রত।
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমৃত, তাহাতে না লয় চিত॥
(পদকল্পতরু)

মাতা ও পত্নীকে কিন্তু চৈতন্যপ্রভু কোনো দিনই বিস্মৃত হন নি। প্রতি বৎসর গৌড়ীয়া ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে নানা আনন্দরঙ্গ ক'রে গৃহে ফিরে আসতেন। এ সময়ে প্রভু তাঁদের সঙ্গে জননী শচীদেবীর জন্য নানা প্রকারের প্রসাদ এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য একখানি বহুমূল্য শাড়ি প্রেরণ করতেন। প্রভুপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার উদ্দেশে এই শাড়িটি প্রভুকে দিতেন তাঁর পরম ভক্ত, উড়িষ্যা-রাজ, প্রতাপরুদ্র গজপতি।

কোনোবার শ্রীবাস পণ্ডিত, কোনোবার বা অপর কারুর সঙ্গে প্রভুর এসব স্মারকচিহ্ন পৌঁছাতো তাঁর নবদ্বীপের গৃহে। বলা বাহুল্য, শচীদেবী আনন্দে অধীর হয়ে উঠতেন সন্ন্যাসী পুত্রের প্রেরিত এই সব বস্তু দেখে।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া ? তাঁর জন্য নির্দিষ্ট শাড়িটি সজল নয়নে, পরম ভক্তিভরে, তিনি গ্রহণ করতেন, সযত্নে রেখে দিতেন পেটিকায়। মাঝে মাঝে এই পবিত্র স্মারক বস্তুটি খুলে যখন বার করতেন, ভাবতেন, স্বামী তাঁর এখন বহুজনের প্রভু, বহুজনের সংত্রাতা, কিন্তু তবুও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তাঁর হৃদয়ের কোণে বিরাজ করছে অকৃত্রিম

ভালবাসা। সেই ভালবাসার স্মৃতিকে বার বার তিনি প্রোজ্জ্বল ক'রে তুলছেন, এই বহুমূল্য বার্ষিক উপহারের মধ্য দিয়ে।

স্বামীর কত পুরাতন কথা বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে ভিড় ক'রে আসতো, উথলে উঠতো কত অমৃতময় স্মৃতি। তখন ভাবাবেশে হারিয়ে ফেলতেন তিনি বাহ্যজ্ঞান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার তীব্র বিরহ সাধনার কথা, বিরহ-অগ্নিময় পঞ্চতপার কথা, অন্তর্যামী প্রভু শ্রীচৈতন্য জানতেন। আরো জানতেন তাঁর এই তপস্যার ক্রমিক সিদ্ধির কথা। কিন্তু সব জেনেও প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার বহিরঙ্গ জীবনের চারধারে সতর্ক হস্তে তুলে দিয়েছিলেন কঠোর নিয়ন্ত্রণের অনড় প্রাচীর।

এমনি প্রাচীর দিয়ে নিজের সন্ন্যাস জীবনকেও বেষ্টন ক'রে নিয়েছিলেন প্রভু। নারী সান্নিধ্য বা নারী সম্ভাষণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বলা বাহুল্য, বিষ্ণুপ্রিয়া ও তাঁর নিজের সম্পর্কিত এই নিয়ন্ত্রণের মূলে ছিল লোক-শিক্ষাদান। গোপী-প্রেম সাধনার পথে যারা আসবে, তারা সমস্ত কামনা-বাসনার বীজকে দগ্ধ ক'রে আসবে, এই ছিল তাঁর আধ্যাত্মিক উপদেশের নির্যাস। আর সেই জন্যেই কঠোর নিয়ন্ত্রণের নিগড়ে নিজেকে এবং নিজের ভক্ত শিষ্যদের বেঁধে নিয়েছিলেন তিনি।

কৃষ্ণরসে সদা রসায়িত, কখনো বা মহাভাবে নিমজ্জিত থাকতেন শ্রীচৈতন্য। তাই অনেক সময়ে ব্যবহারিক আচরণের দিকে, নীতি কঠোরতার দিকে, দৃষ্টি রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। কিন্তু দেখা গিয়েছে, এ সময়ে কেউ তাঁকে সজাগ ও সচেতন ক'রে দিলে, সাগ্রহে তিনি তা মেনে নিতেন, নিজেকে করতেন সতর্কভাবে নিয়ন্ত্রিত।

নীলাচলে এক সময়ে প্রভুর কাছে আসা যাওয়া করতে থাকে একটি সুদর্শন ওড়িশী ব্রাহ্মণ বালক। বালকটি পিতৃহীন, বিধবা মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত হচ্ছে। শুভ সংস্কার নিয়ে সে জন্মেছে। অতি শুদ্ধসত্ত্ব আধার। প্রভুর প্রতি এ বালক বড়ই আকৃষ্ট, অবসর পেলেই তাঁর কাছে এসে বসে থাকে, দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরে যায়।

প্রভুরও একটা বিশেষ স্নেহ জেগেছে এই ছেলেটি ওপর। সে এলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হাসি গল্প চলে।

ভক্ত দামোদর পণ্ডিত লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছেন দুজনের এই মেলা-মেশা, কিন্তু মন তাঁর এতে সায় দেয় নি। প্রায়ই ভাবেন, এ বিষয়ে তাঁর মত প্রভুর কাছে অবশ্যই তিনি পেশ করবেন। এ তাঁর এক পবিত্র কর্তব্য, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি।

একদিন ছেলেটি চলে যেতেই পণ্ডিত প্রভুকে চেপে ধরলেন। বললেন, "প্রভু-প্রভু বলে সারা দেশ ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এবার তারা সেই প্রভুর গুণ যশ ভালোভাবেই গাইবে।"

"মনে হচ্ছে, পণ্ডিত, তোমার মনে আমার সম্পর্কে একটা ক্ষোভ জেগেছে," প্রভু শান্তস্বরে উত্তর দেন।

"প্রভু, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বতন্ত্র পুরুষ। যে আচার আচরণ তুমি পছন্দ করো, তা অনায়াসেই করতে পারো। কে আর তাতে বাধা দেবে? কিন্তু কু-লোকের কু-মন্তব্য তুমি কি ক'রে আটকাবে? আর আমরা তোমায় যাঁরা ভালবাসি—তা সইতে পারবো কেন?"

"পণ্ডিত, তুমি আমার পরম আপন জন, যা বলতে চাও পরিষ্কার ক'রে বলো, নির্ভয়ে বলো।"

"তুমি সর্বজ্ঞ, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ। আমি আর তোমায় কি বলবো? কিন্তু এটা তুমি একবারও বিচার ক'রে দেখছো না,—ঐ বালকটি এক সুন্দরী তরুণী বিধবার পুত্র। বিধবাটি যত সৎস্বভাবই হোক, তার দোষ —সে পরমা সুন্দরী যুবতী। তুমিও এক পরম সুন্দর যুবক। লোকে এ নিয়ে কানাঘুষা করতে পারে। বলতে পারে, ঐ বালকের পেছনে রয়েছে তার সুন্দরী অল্পবয়স্কা জননী—তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই তুমি তাকে এতো কাছে টানছো, আদর যত্ন করছো। এ ধরনের কানাঘুষা আর নোংরা আলোচনার অবসর কেন তুমি সাধারণ মানুষকে দেবে?"

প্রভু কিন্তু একথা শুনে খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন, "দামোদর, আজ বুঝলাম, তুমি সত্যই আমার অন্তরঙ্গ বান্ধব। কোনো দিক দিয়ে

আমার বিরুদ্ধে ক্ষীণতম গুঞ্জন ওঠে, তা তুমি সহ্য করতে রাজী নও। আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে তুমি ঠিকই করেছো। আমার অশেষ কল্যাণ সাধন করেছো।"

বালকটির সহিত প্রভু তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবার কমিয়ে দেন, আর সেও তাঁর সমবয়স্ক খেলার সঙ্গীদের আকর্ষণে দূরে চলে যায়।

কিছুকাল পরে প্রভু একদিন দামোদর পণ্ডিতকে নিভৃতে ডেকে নিলেন, বললেন, "পণ্ডিত, আমি চাই, তুমি নবদ্বীপে গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করো। আমার মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুলে দিচ্ছি আমি তোমার ওপর।"

প্রভু দামোদর পণ্ডিতের প্রাণস্বরূপ! তাঁর পুণ্যময় সঙ্গ ছেড়ে যেতে হবে? এ যে পণ্ডিতের শিরে এক বজ্রাঘাত! চোখ দুটি তাঁর অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

জোড়হস্তে দামোদর নিজের বক্তব্য বলতে যাবেন, তার আগেই প্রভু বললেন, "পণ্ডিত, আমার মায়ের, আমার গৃহের, রক্ষকরূপে থাক্‌বে তুমি। আমি জানি, এ কাজের ভার আমি যোগ্য লোকের ওপরই দিচ্ছি। অন্য পরের কথা, আমায় শাসন করার মতো শক্তি তুমি ধারণ করো। তাই তো একাজে তোমায় আমি নিয়োজিত করছি।"

বলা বাহুল্য, জননীর নাম ক'রে বললেও তরুণী ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁর আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের কথাটিই ছিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের আসল উদ্দেশ্য। তিনি জানতেন, নবদ্বীপে তাঁর গৃহে সতত হাজির রয়েছেন ভক্ত বংশীবদন আর তাঁর চিরবিশ্বস্ত বর্ষীয়ান্ গৃহ ভৃত্য ঈশান। তাছাড়া, শ্রীবাস প্রভৃতি স্থানীয় বৈষ্ণব ভক্তেরা সদাই জননী শচীদেবীর আদেশ পালনে যত্নবান। প্রয়োজন হলে জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা উৎসুক। দেখাশুনা করার লোকের কোনো অভাব সেখানে নেই, অভাব রয়েছে এমন একজন কঠোর ন্যায়-নীতিনিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়কের যার ভ্রূভঙ্গীতে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে, সংযত ক'রে রাখবে তাদের আচার আচরণ।

দামোদর পণ্ডিত ছাড়া এমন ব্যক্তি আর কে আছে? তাই প্রভু তাঁর ওপরই সেদিন ন্যস্ত করলেন নবদ্বীপের গৃহের সমস্ত কিছু সামাজিক দায়িত্বের ভার।

প্রাণপুত্তলী নিমাইর বিচ্ছেদ-বেদনা কিন্তু জননী শচীদেবী আর বেশী দিন সহ্য করতে পারেন নি। অল্পদিনের মধ্যেই রোগে শোকে জর্জরিতা হয়ে শয্যা গ্রহণ করেন তিনি। তারপর একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া আর নবদ্বীপের শত শত চৈতন্য-ভক্তদের শোক সাগরে ভাসিয়ে ত্যাগ করেন মরদেহ। বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসার-জীবনের শেষ গ্রন্থিটি এভাবে সেদিন ছিন্ন হয়ে যায়।

নীরবে, নিভৃতে, নিঃসঙ্গভাবে এবার শুরু হয় তাপসী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-সাধনা। শচীমাতার জীবিতাবস্থায় প্রভুর গৃহের বাইরের দ্বার খুলে রাখা হতো, কারণ, ভক্তেরা প্রভু-জননীকে প্রণাম নিবেদন করতে আর তাঁর খোঁজখবর নিতে আসতেন। তাঁর তিরোধানের পর নিজের বহিরঙ্গ জীবনের ওপর বিষ্ণুপ্রিয়া টেনে দিলেন এক কৃষ্ণ যবনিকা।

শুধু খিড়কির দুয়ারটি রইল খোলা। এই দুয়ার দিয়ে পূর্ব অভ্যাসমতো শেষ রাত্রে একবার তিনি বহির্গত হতেন পুণ্যতোয়া গঙ্গায় অবগাহন করতে। সঙ্গে থাকতো বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশান এবং ভক্ত-প্রবর বংশীবদন। স্নান-তর্পণ শেষে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে তিনি বসতেন প্রভুর কাষ্ঠ পাদুকার সম্মুখে। প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করতেন ভজন পূজনে ও মানস-লীলা দর্শনে।

এবার আপন আহারের ওপর বিষ্ণুপ্রিয়া নিয়ে এলেন কঠোরতম নিয়ন্ত্রণ। ভজন পূজন ও ধ্যানের শেষে প্রতিদিন তিনি নাম জপে বসতেন। তাঁর তিতিক্ষাময় জীবনের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল। প্রতি সহস্র বার নাম জপ ক'রে এক একটি তণ্ডুলকণা পাশে সরিয়ে রাখতেন। এভাবে দিনশেষে দু' মুষ্টি তণ্ডুল সঞ্চিত হতো। তারপর

শাকপাতা সহ তা সিদ্ধ ক'রে প্রস্তুত করতেন নিত্যকার আহার্য। দিনের পর দিন এভাবে চলতো তাঁর জীবনধারণ।

স্নেহশীলা অভিভাবিকা শচীমাতা এখন আর নেই, তাই চরম ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের পথে রইলো না কোনো অন্তরায়। এই ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবনের সমিধে সাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বালিয়ে দিলেন দয়িত-বিরহের অগ্নি। আর এই অগ্নিবলয়ের ভেতর জ্যোতির্ময় মূর্তিতে দিনের পর দিন আবির্ভূত হতে থাকলেন তাঁর স্বামী, ইষ্ট, তাঁর পরমপ্রভু।

প্রভু শ্রীচৈতন্য ছিলেন প্রেমধর্মের মূর্ত বিগ্রহ, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন তাঁরই স্বরূপশক্তি। তাই ব্যবহারিক জীবনে যে ব্যবধান ও যে দূরত্বই দেখা দিক না কেন, চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগনদ্ধ আত্মিক জীবনে ছিল না কোনো সত্যকার বিচ্ছেদ বা অন্তরাল।

ইষ্ট-বিরহের একটা মাধুর্যময় পরম তত্ত্বের সন্ধান আমরা পাই বৈষ্ণব সাধকদের রসোজ্জ্বল ভাব-সাধনায়। বিরহকে তাঁরা বলেছেন, বিশেষরূপে রহা—আত্মিক প্রেম ও আত্মিক মিলনের এ এক অপরূপ রসঘন অস্তিত্ব। এ অস্তিত্ব সৎ, চিরন্তন এবং চৈতন্যময়।

বিরহ-সাধনার প্রসঙ্গে আরো একটা অসামান্য তত্ত্ব আমরা লাভ করি প্রাচীন রস-সাধক কবির পরম রম্য কাব্যপদ থেকে[১]—

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো
ন সঙ্গমস্তস্য।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি
তন্ময়ং বিরহে।

(পদ্যাবলী)

---

১ আর্যা ছন্দে রচিত এই অনুপম কবিতাটি নবম শতকের সাধক কবি আনন্দবর্ধন আচার্যের রচিত। তাঁর ধ্বন্যালোক-এ এটি পাওয়া যায়। কোনো কোনো গবেষকের মতে, এ কবিতা প্রাচীন রস-সম্প্রদায়ের রচিত, আনন্দবর্ধন হচ্ছেন এর সংকলয়িতা।

—ওগো, মিলন আর বিরহের ভেতর বিরহকেই তো করি আমি বরণ। কারণ, মিলনে পাই আমার প্রাণপ্রিয়কে 'এক'-রূপে, আর বিরহে যে দেখি তাঁকে সারা ত্রিভুবনময়!

বিরহের এই নিগূঢ় তত্ত্ব রূপায়িত হয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে। স্বামীরূপে যে বিশ্বম্ভর মিশ্র ছিলেন একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব পরম ধন, বিরহের তপস্যাময় জীবনে, সেই তিনিই আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর কাছে সর্বময়রূপে, সর্বস্বরূপে। তাইতো সাধন জীবনে পরম পাওয়া পেয়ে, পরম প্রভুকে পেয়ে, ধন্য হয়েছিলেন মহাবৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়া, হয়েছিলেন আপ্তকামা।

কিশোরী জীবনে প্রাণপ্রিয় স্বামী, তাঁর ইষ্টদেব, প্রেমভক্তির রসোজ্জ্বল দীপশিখাটি প্রজ্বালিত করেছিলেন। পঁচাশী বৎসরের অন্তে সেই শিখাটি ঊর্ধ্বায়িত হয়ে ওঠে, মিশে যায় পরমতমের জ্যোতিঃঘন সত্তায়, মরলীলায় ছেদ পড়ে যায় চিরতরে।

ভৈরবী যোগেশ্বরী

উষার আলো ছড়িয়ে পড়েছে গঙ্গার মৃদু তরঙ্গমালায়, আকাশের গায়ে আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দির শিখরে। ভবতারিণীর প্রভাতী পূজা শুরু হতে আর বেশী দেরি নেই।

মন্দিরের তরুণ পূজারী গদাধর তাঁর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে, সাজি হস্তে চলে এসেছেন গঙ্গার ধার ঘেঁষা পোস্তার বাগানটিতে। আপন মনে গুন্‌গুন্‌ ক'রে গাইছেন রামপ্রসাদী গান, আর সেই সঙ্গে চলছে পুষ্প চয়ন। মায়ের গলায় আনন্দভরে পরিয়ে দেবেন স্বহস্তে গাঁথা মনোহর মালার গুচ্ছ, চরণে দেবেন পুষ্পাঞ্জলি।

হঠাৎ গদাধরের দৃষ্টি পড়ে বকুলতলার ঘাটের দিকে। ওপার থেকে আসা একটি নৌকা ভিড়ছে সেখানে, আর তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন কাষায়-পরা, এলোকেশী এক পরমাসুন্দরী ভৈরবী। এক হাতে ত্রিশূল, আর এক হাতে গেরুয়া রং এর ঝুলি।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন গদাধর এই ভৈরবীর দিকে। এ মুখচ্ছবি, মস্তকের অবিন্যস্ত কেশরাশি, উজ্জ্বল আয়ত নয়ন—এ সবই যে তার চেনা। কালীমন্দিরে ধ্যান করার সময় দেখেছেন। জগজ্জননী ইঙ্গিতে জানিয়েছেন তাঁকে এই মহিয়সী তন্ত্রসিদ্ধা সাধিকার আগমনের কথা।

ফুলের সাজি হস্তে দ্রুতপদে নিজের কক্ষে চলে আসেন গদাধর। ভাগনেকে ডেকে বলেন, "ওরে হৃদু, তুই এক্ষুনি ছুটে বকুলতলার ঘাটে যা দিকি নি। দেখ্‌বি, এক পরমাসুন্দরী ভৈরবী সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।"

বিস্ময়ের সীমা নেই হৃদয়ের। মাতুলের সে সহকর্মী, সেবক ও সদা পার্শ্বচর। এতদিন ধরে দেখে আস্‌ছে, ত্যাগ তিতিক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও ভক্তিপথের সাধনায় তাঁর কি অটুট নিষ্ঠা। মেয়েদের ধার কাছ দিয়ে

কখনো তো তাঁকে ঘেঁষতেই দেখা যায় না। হঠাৎ এ সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি আজ এত ব্যস্ত কেন? তায় আবার নিজেই বলছেন, এ সন্ন্যাসিনী পরমা সুন্দরী!

"কোনকালে জানাশুনো নেই, আমি ডাকলেই সে আমার সঙ্গে এখানে আসবে কেন?" আপত্তির সুরে হৃদয় বলে ওঠে।

"ওরে তুই গিয়ে শুধু বল্, আমি হেথায় তাকে ডাক্‌ছি। দেখ্‌বি, ঠিক চলে আসবে। যা—যা আর দেরি করিসনে। ওকে দিয়ে আমার বড় দরকার।"

হৃদয় জানেন, সাধনার উচ্চস্তরে অবস্থিত মাতুল কিছুটা ক্ষেপাটে ও একরোখা। একবার যা সংকল্প করবেন, তা থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা শক্ত। তাঁর সঙ্গে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই।

ধীর পদে হৃদয় চলে যান গঙ্গার তীরে। দেখেন, বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে ভৈরবী তাঁর তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিচ্ছেন।

"আমার মামা এ মন্দিরের পূজারী ঠাকুর। মা ভবতারিণীর এক বড় ভক্ত। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন।" নিবেদন করেন হৃদয়।

কিছুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ না দেখিয়ে ভৈরবী উত্তর দেন, "তবে চলো বাবা, তাঁর সাথে দেখা করি গিয়ে।" সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশূল আর ঝুলি নিয়ে এগিয়ে চলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে, পথ দেখিয়ে চলেন হৃদয়, ভাবনা তার খেই হারিয়ে যায়।

ঠাকুরের ঘরে ঢুকে তাঁর দর্শন পাওয়া মাত্র ভৈরবী বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে অভিভূত। দুই নয়নে ঝরতে থাকে পুলকাশ্রু। ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, "বাবা, তুমি এখানে বসে রয়েছো। তুমি গঙ্গা-তীরে আছো জেনে, আমি যে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"

"আমার কথা কি ক'রে জানতে পারলে, মা?" উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেন ঠাকুর।

"মা জগদম্বা কৃপা ক'রে জানিয়েছিলেন, তোমাদের তিন জন

সাধকের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে, আর সাহায্য করতে হবে। দু'জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে পূর্ববঙ্গে। আজ গঙ্গাতীরে এখানে এসে তোমাকেও পেলাম।"

"জগদম্বার নির্দেশে যদি এসেছো মা, তাহলে এখানে স্থির হয়ে ব'সো। আমার সব কথা শোন।" একথা বলে, সরল বালক যেমন তার মায়ের কাছে বসে পরমানন্দে মনের কথা খুলে বলে, তেমনি ঠাকুর রামকৃষ্ণও বিবৃত করতে থাকেন তাঁর সাধন ভজনের কথা, নানা দৈহিক মানসিক প্রতিক্রিয়া এবং সমস্যার কথা।

অপার ধৈর্য ও উৎসাহ নিয়ে ভৈরবী তাঁর বক্তব্য শোনেন। কখনো উৎসাহে তাঁর আয়ত নয়নদুটি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, আবার কখনো করুণায় হয় অশ্রুসজল।

শুদ্ধাভক্তির সাধন পথে যে চরম কৃচ্ছ্র সাধন করছেন, রাগানুগা ভক্তি সাধনায় শ্যামা মায়ের সঙ্গে যে আচার আচরণ করেছেন, জগজ্জননীর দিব্য দর্শন যে ভাবে ঘটেছে, সব বললেন ঠাকুর। আরো বললেন,—কয়েক বৎসর আগেকার দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা। তখন অনেকে ভেবেছিলো, তাঁর বুঝি বা বায়ুরোগ হয়েছে। সে অবস্থার পরিবর্তনের পর দিব্যদর্শন ও দিব্য অনুভূতিও এসেছে কত বিচিত্র রূপে রসে। সম্প্রতি আবার এসে গিয়েছে এক অদ্ভুত দিব্যভাবের জোয়ার। কেউ বলছে এ উন্মাদ রোগ, কেউ বলছে যোগজ বিকার। গঙ্গাপ্রসাদ মস্ত বড় কবরেজ। তাঁর ওষুধও তো কত খাওয়া হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

প্রাণ খুলে নিজের অবস্থার সব বিবরণ দেবার পর ঠাকুর সরল বালকের মতো তাঁর এই ভৈরবী মাকে জিজ্ঞেস করেন বার বার, "হ্যাগো, আমার এসব কি হয় বলতো ? আমি কি পাগল হলুম ? মা জগদম্বাকে ডেকে ডেকে, শেষটায় আমার এই কঠিন ব্যাধি হলো ?"

ভৈরবীর মনপ্রাণ ভরে উঠেছে ঠাকুরের সব কথা শুনে। আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন, "তোমায় কে পাগল বলে, বাবা ? মহাভাবের উদয় হয়েছে তোমার দেহে মনে। সাত্ত্বিক প্রেমবিকার!

—এ পরম ঐশ্বর্যের মূল্য সাধারণ মানুষ বা সাধারণ সাধকেরা নিরূপণ করবে কি ক'রে ? আমি তোমায় সত্যি বলছি, এ রকমটি হয়েছিল কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা রাধারানীর, হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এ সবের বিবরণ রয়েছে। আমার এই ঝুলির ভেতরে শাস্ত্রের নানা পুঁথি আছে। তা থেকে তোমায় আমি পড়ে শোনাবো, বুঝিয়ে দেবো। জীবনে সত্যিকার ঈশ্বরীয় প্রেমের ঢল নামলে যে এ অবস্থাই হয়!"

কক্ষের অদূরে বসে, দু'জনের এ অন্তরঙ্গতা, এ অকপট প্রাণ-খোলা আলাপ আলোচনা হৃদয় মনোযোগ দিয়ে শোনে। বিস্ময়ে ভরে ওঠে তার মন। তাঁর প্রিয় মাতুল কি তবে এতটা এগিয়ে গিয়েছে সাধন ভজনে ? সত্যিই কি তাই ?

কথায় কথায় বেলা হয়ে গিয়েছে। স্নান সেরে মন্দিরে গিয়ে দেবী দর্শন ক'রে এলেন ভৈরবী। মা ভবতারিণীর প্রসাদী ফলমূল মাখন মিছ্‌রি আনালেন ঠাকুর। ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছেন, ভৈরবী তাঁর প্রতি মাতৃভাবে ভাবিতা, মায়ের প্রসাদ ঠাকুর আগে না খেলে তিনি খাবেন না। তাই নিজে আগে প্রসাদ নিয়ে, তাঁকে খাওয়ালেন।

ভৈরবীর কণ্ঠদেশে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্রে ঝুলানো রয়েছেন তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীর নারায়ণ-শিলা। এবারে এই নারায়ণের সেবার জন্য ভোগ রন্ধন করতে হবে ভৈরবীকে। খাজাঞ্চিকে বলে মন্দির-ভাণ্ডার থেকে আটা-চাল ঘি দিয়ে দেওয়া হয়। এবার হৃষ্টচিত্তে পঞ্চবটীতলে বসে তিনি রত হন রন্ধনকর্মে।

ভোগ প্রস্তুত করা হলে নারায়ণ শিলার সম্মুখে তা নিবেদন ক'রে ভৈরবী ইষ্ট পূজায় নিবিষ্ট হন। নয়ন নিমীলিত ক'রে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন গভীর ধ্যান তন্ময়তায়। দুই নয়নে দরদর ধারে বইতে থাকে প্রেমাশ্রুর ধারা, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হয় তিরোহিত।

ঠাকুর এ সময়ে রয়েছেন তাঁর নিজের কক্ষে। হঠাৎ তিনি এক অনিবার্য আকর্ষণ বোধ করেন পঞ্চবটী তলায় উপস্থিত হবার জন্য।

তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে ছুটে যান সেখানে। দিব্যভাবের এক বিপুল বন্যায় তিনি প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত।

তারপর ঘটে এক অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ভেতর থেকে কোন্ এক দিব্যশক্তি তাঁকে ভৈরবীর নিবেদিত ভোগান্ন পাত্রের কাছে ঠেলে নিয়ে বসিয়ে দেয়। ভাবাবিষ্ট অবস্থায়, অবলীলায় তিনি ভোজন করতে থাকেন ঐ পাত্র থেকে।

কিছুক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন ক'রে ভৈরবী দেখতে পান এই দৃশ্য। দিব্য আনন্দের আবেশে দেহ তাঁর তখন কণ্টকিত, কপোল বেয়ে ঝরে পড়ছে পুলকাশ্রু। এ কী অদ্ভুত রহস্য? ঠিক এমনি ভাবে, এমনি ভঙ্গীতে বসে ইষ্টদেব তাঁর নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করছেন, এ যে তিনি এতক্ষণ ধ্যাননেত্রে দর্শন করছিলেন!

ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ততক্ষণে ফিরে এসেছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনার অন্ত নেই।

সলজ্জ ভীত কণ্ঠে বলতে থাকেন, "কে জানে বাপু, কেন হঠাৎ বেসামাল হয়ে এসব আমি ক'রে বসি।"

দিব্য আনন্দের আভা ফুটে ওঠে ভৈরবীর আননে। নয়ন দুটি হর্ষোজ্জ্বল। জননীর মতো স্নেহপূর্ণ স্বরে আশ্বাস দেন, "বেশ করেছো, বাবা। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, এ কাজ তুমি করো নি। করেছেন তিনি যিনি তোমার ভেতরে জাগ্রত হয়ে উঠেছেন। কে এ ভোগান্ন গ্রহণ করেছেন, কেন করেছেন, তা কিন্তু আমার উপলব্ধিতে এসে গিয়েছে।"

ঠাকুর তখনো আমতা আমতা করছেন, "তাই তো বাপু, বেহুঁশ হয়ে কি কাজ ক'রে বসলুম।"

"বাবা, আবার বলছি, তুমি ঠিকই করেছো। আরো বলি, আমি বুঝতে পেরেছি, আগের মতো আনুষ্ঠানিক ইষ্টপূজা ও ভোগান্ন নিবেদনে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমার পূজা এতদিনে সার্থক হয়েছে।"

ইষ্টদেব রঘুবীরজী দক্ষিণেশ্বরের এই কালীপূজারী সাধকের দেহে

মনে আত্মায় জাগ্রত হয়ে উঠেছেন—এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে উঠলো ভৈরবীর অন্তরে। ভাবাবেগের প্রাবল্যে ঠাকুরের ভোজন-অবশিষ্ট শ্রদ্ধাভরে তিনি গ্রহণ করলেন সেদিন। তারপর দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়ে, অশ্রু-ছলছল নয়নে, দীর্ঘদিনের আরাধিত ও সেবিত পবিত্র শিলাখণ্ডকে গঙ্গাগর্ভে দিলেন বিসর্জন।

এখন থেকে ঠাকুরকে অপত্যরূপী ইষ্টরূপে দেখতে শুরু করেন ভৈরবী। ঠাকুরকে স্বপ্রতিষ্ঠ করতে, তাঁর অধ্যাত্মজীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত ক'রে তুলতে, তিনি ব্রতী হয়ে পড়েন।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অখ্যাত পূজারী, চব্বিশ বৎসরের তরুণ সাধক, ঠাকুর গদাধরের ভবিষ্যৎ সার্থক মূর্তিটিকে নিজের মানসপটে সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই ঈশ্বর-প্রেরিতা ভৈরবী। জননীর মমত্ব-বর্মে ঘিরে রেখেছিলেন তাঁকে। নিজ সাধনজীবনের অনুভূতি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিব্য জীবনের পথে। বিশেষ ক'রে তন্ত্র সাধনা ও তন্ত্রক্রিয়ার দৃঢ় ভূমিতে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

দৃপ্ত কণ্ঠে সর্বপ্রথমে সর্বসমক্ষে ভৈরবী ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অধ্যাত্ম-তনয়ের পরম সম্ভাবনা। তার ফলেই ত্বরান্বিত হয়েছিল যুগাচার্য মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অভ্যুদয়।

দেবী জগদম্বার নির্দেশে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণে ভৈরবী হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন কৃপা ও দাক্ষিণ্যের পূর্ণকুম্ভ হস্তে, কল্যাণী মাতৃকা রূপে অপার নিষ্ঠায় রক্ষা করেছিলেন রামকৃষ্ণকে। দিয়েছিলেন অভয়মন্ত্র আর সঞ্জীবনী শক্তি। তারপর প্রায় ছয় বৎসরের ব্যবধানে দৈবী ইঙ্গিতে নিজেকে তিনি অপসৃত ক'রে নেন, অন্তর্হিত হন রহস্যময় যবনিকার অন্তরালে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যতদিন মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে, ততদিনই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ঐশী কৃপায় লব্ধ তাঁর তরুণ বয়সের এই অধ্যাত্ম-জননী মহাসাধিকা ভৈরবীর নাম।

উত্তরবঙ্গে যশোহরের এক সম্ভ্রান্ত, তন্ত্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণ বংশের কন্যা ভৈরবী যোগেশ্বরী। আনুমানিক ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জন্মান্তরের শুভ সংস্কার ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রবণতা বাল্যকালেই তাঁর জীবনে জেগে উঠতে দেখা যায়। তরুণ বয়সে মুমুক্ষার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, ঘর-সংসারের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বার হয়ে পড়েন সদ্‌গুরুর সন্ধানে। নানা তীর্থ ও সিদ্ধপীঠ এ সময়ে তিনি পরিব্রাজন ক'রে বেড়ান।

তখনকার দিনে, তীর্থে জনপদে, পথে প্রান্তরে বিপদ ছিল পদে পদে। সে সময়ে রূপলাবণ্যময়ী এই তরুণী সাধিকার পক্ষে আত্মরক্ষা ক'রে পথ চলা ছিল অতি কঠিন ব্যাপার। ইষ্টদেবের কৃপায় এবং নিজের সাহস ও শক্তির বলে নানা বিপদ হতে তিনি মুক্ত হন, উত্তীর্ণ হন বহুতর কঠোর পরীক্ষায়।

উত্তরকালে কাশীধামে এসে এই তরুণী সাধিকা কিছুকাল বাস করতে থাকেন। এখানেই এক সিদ্ধ কৌল সাধকের কাছে তন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন, গুরু-কৃপায় হন পূর্ণাভিষিক্তা ভৈরবী।

তন্ত্রশাস্ত্রে ও তন্ত্রতত্ত্বে পারদর্শিনী হয়েছিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। তন্ত্রের নিগূঢ় ক্রিয়াসমূহও ছিল তাঁর অধিগত। কিন্তু এতে তাঁর মন ভরে ওঠে নি। তাই রাগাত্মিকা বৈষ্ণবীয় সাধনার পথেও তিনি অগ্রসর হন। মধুর রসের তত্ত্ব ও ভাবসাধনায় হয়ে ওঠেন পারঙ্গম। তারপর গুরুর আদেশ নিয়ে, ইষ্টদেব রঘুবীর-শিলাকে কণ্ঠে ঝুলিয়ে শুরু করেন দীর্ঘ দিনের তীর্থ পরিক্রমা।

সাধনপথের এই মধুকর বৃত্তি এবং উচ্চতর অনুভূতি ভৈরবী যোগেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক সংস্কারমুক্ত, উদারবুদ্ধি, চৈতন্যময় সিদ্ধির স্তরে। তাই বুঝি ঠাকুর রামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার গুরুরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন তিনি, প্রত্যাদেশ পেয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের দেবীমন্দিরে।

যোগেশ্বরী দেবীর পিতামাতার পরিচয় কারুর জানা নেই। বিবাহ করেছিলেন কিনা, সধবা বা বিধবা কোন্ অবস্থায় মুক্তির

আকাঙ্ক্ষায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, এসব কোনো তথ্যই আজ আর সহজলভ্য নয়। গুরুরূপে তিনি বরণ করেছিলেন কোন মহাপুরুষকে, গুরুপ্রদত্ত সাধনার ক্রম ধাপে ধাপে কিভাবে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সে ইতিহাসও চাপা পড়ে রয়েছে বিস্মৃতির অতল গর্ভে।

পূর্বাশ্রমের সকল পরিচয় নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলেন এই সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে, প্রিয় শিষ্য গদাধরের শিক্ষাগুরু রূপে দীর্ঘ দিন তিনি অবস্থান করেন। জননীর স্নেহ ও দাক্ষিণ্যের মধ্য দিয়ে করেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনের লালন ও বিবর্ধন। যুগাচার্য রামকৃষ্ণ-রূপে ত্বরান্বিত করেন তাঁর অভ্যুদয়। কিন্তু পুত্রপ্রতিম এই পরমপ্রিয় শিষ্যের কাছে পূর্ব-জীবনের স্মৃতিচারণ যোগেশ্বরী দেবী করেছেন, একথা শোনা যায় নি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকেও এই হঠাৎ-পাওয়া শিক্ষাগুরুর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে কোনোদিন অযথা কৌতূহলী হতে দেখা যায় নি। কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্তী দীক্ষা নিয়েছিলেন পূজকরূপে তাঁর নিজের দেহশুদ্ধি এবং শ্যামাপূজার শাস্ত্র-অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জনের জন্য। তাঁর এই প্রথম দীক্ষা গ্রহণের মধ্যে এর চাইতে বড় তাৎপর্য কিছু ছিল না। তরুণ সাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণ মা-জগদম্বার সাধনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর জন্মান্তরের শুভ সংস্কারের বলে, তাঁর অসামান্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধাভক্তির বলে। ইষ্টদেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থও হয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু মুমুক্ষার আর্তি তাঁর তখনো শান্ত হয় নি। নির্বিকল্প সমাধির জন্য, পরাশক্তি মহামায়ার পূর্ণতর উপলব্ধির জন্য, পরব্রহ্মের পরম আস্বাদ লাভের জন্য, তিনি অধীর উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। এজন্য শুধু তাঁর আত্মকৃপা অর্থাৎ নিজস্ব ত্যাগ বৈরাগ্য ও ধ্যানমননই যথেষ্ট নয়, চাই শাস্ত্রসম্মত সাধন স্তরসমূহের অতিক্রমণ।

মহাশক্তিকে 'মা' বলে ডেকেছেন ঠাকুর, তাই প্রথম দিকে শক্তি সাধনা বা তন্ত্রোক্ত সাধন-বিধির ক্রমগুলো জানতে এবং প্রত্যক্ষ ভাবে তার অনুষ্ঠান করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। দেবী

ভবতারিণী তাঁর প্রিয় পুত্রের এ ব্যাকুলতায় চঞ্চল না হয়ে পারেন নি। এর ফলেই সেদিন সম্ভাবিত হয়েছিল ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর কল্যাণকর আবির্ভাব। এবং অচিরে অদূর ভবিষ্যতের মহাসাধক রামকৃষ্ণকে করেছিলেন তিনি আবিষ্কার।[১]

দৈব প্রেরিতা এবং মাতৃসমা এই তন্ত্রগুরু। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনোমুকুরে উভয়ের সাক্ষাতের পূর্বাহ্ণে এই গুরুর যে ছায়াপাত ঘটেছিল তার তথ্য পাই আমরা রামকৃষ্ণ-পুঁথিতে। ঠাকুরের আদি-যুগের ভক্তশিষ্য অক্ষয়কুমার সেন ঠাকুরের সঙ্গ করেছিলেন, তাঁর মুখ থেকে ভৈরবীর বর্ণনা শুনেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

পুলকে পূর্ণিত তনু গদ্‌গদ স্বরে।
মা বলিয়া প্রভুদেব সম্বোধিলা তাঁরে॥
এ নহে সামান্যা নারী বহু গুণাকর।
যেমন উপরে বাহ্য তেমতি ভিতর॥
শ্রীহরি চরণ আশে ত্যাগী সন্ন্যাসিনী।
সাধন ভজন কত করেছেন তিনি॥
দেবভাষা বিশারদা বিশেষ প্রকারে।
সুগূঢ় শাস্ত্রের বাক্য ভাল ব্যাখ্যা করে॥
... ...
লিখিতে তাঁহার কথা কি আছে শকতি।
প্রভু বলিতেন চারিবেদ মূর্তিমতী॥
তন্ত্র-গীতা-পুরাণাদি ভক্তি-গ্রন্থ যত।
অক্ষরে অক্ষরে তার সব কণ্ঠস্থিত॥
ব্রাহ্মণী[২] তাঁহার আখ্যা হৈল এইখানে।
সেহেতু ব্রাহ্মণী বলি সকলেই জানে॥

---

১ অনেকের মতে, ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীই তাঁর অধ্যাত্মভনয় গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের নামকরণ করেছিলেন—রামকৃষ্ণ।

২ কৌল সাধনার গুরু ভৈরবী-যোগেশ্বরী দেবীকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাতৃসমা

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক কুঠুরীতে বাস করতে থাকেন ভৈরবী। দেবী দর্শন, পূজা ধ্যানের পর প্রতিদিন পঞ্চবটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি মিলিত হতেন। শাস্ত্রতত্ত্ব আর অধ্যাত্ম-সাধনার প্রসঙ্গে কেটে যেত দীর্ঘ সময়। এতদিনের আত্মিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর ভাব শাবল্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঠাকুর বিবৃত করতেন এই মাতৃসমা সাধিকার কাছে, তুলে ধরতেন তাঁর নিজের বহুতর সমস্যা ও সন্দেহের কথা।

পরম উৎসাহে ভৈরবীও ঝুলি থেকে খুলে ফেলতেন গীতা, ভাগবত, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থের পাতা। বুঝাতেন ঠাকুরকে, "এই ত্যাখো বাবা, তোমার দেহে মনে যা-যা ঘটেছে, তা দেখা গিয়েছিল রাধারানী আর শ্রীচৈতন্যের ভেতরে। একে বলে মহাভাব। সাধন-ভজনহীন সংসারী মানুষেরা কি ক'রে বুঝবে এ পরম বস্তুকে? তাদের কেউ ভাবছে, কঠোর সাধনায় ফলে তোমার মাথায় বায়ুর প্রকোপ হয়েছে, কেউ ভাবছে এ নিছক উন্মাদ-রোগ, কেউ ভাবছে মা-কালীর কৃপার ঢল নেমেছে আর তাই তুমি বেসামাল হয়ে পড়েছো।"

"তাই তো মা, তুমি যে একেবারে নূতন কথা, নূতন তত্ত্ব বলতে শুরু করলে," বিস্মিত বালকের মতো উত্তর দেন রামকৃষ্ণ।

"হ্যাঁ বাবা, আমি ঠিক কথাই বলছি, শাস্ত্রের কথাই বলছি। তোমার সব অবস্থা আমি পুঁথি খুলে খুলে প্রমাণ ক'রে দেবো, পণ্ডিতদের সামনেও এ প্রমাণ উপস্থিত করবো আমি।"

ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ নিয়ে, কয়েকটি দিন উভয়ের পরমানন্দে কেটে যায়। তারপর হঠাৎ সেদিন রামকৃষ্ণের হুঁশ হয়। তাই তো, ভৈরবীকে নিজে মাতৃজ্ঞান করছেন, আর তিনিও হয়েছেন বাৎসল্য রসে পূর্ণ, পুত্রাধিক স্নেহে অগ্রসর হয়েছেন রামকৃষ্ণের সাধন

জ্ঞান করতেন, তাই তাঁকে নাম ধরে ডাকা সম্ভব হতো না, তাঁর কথা উল্লেখ করতেন বামনী (ব্রাহ্মণী) বলে।

পথে সাহায্য করতে। কিন্তু ভৈরবী পরমা সুন্দরী নারী, বয়স প্রায় চল্লিশ হলেও অঙ্গে যৌবন-লাবণ্য এখনো টলমল করছে। তাঁদের দুজনার এই মেশামেশি, বিশেষ ক'রে রাত্রিকালে ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান সাধারণ মানুষ তো তেমন সুচক্ষে দেখবে না। মন্দিরে কত ধরনের দর্শনার্থী রোজ আসে। পূজারী, সেবক, পাচক, দারোয়ানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ভৈরবী ও ঠাকুরের এই নিষ্কলুষ সম্পর্কটা তারা বাঁকা চোখে, হীন চোখে, দেখতেও পারে।

ভৈরবীকে ডেকে বলেন তাঁর মনের কথা। তিনিও সায় দিয়ে বলেন, "তুমি ঠিকই বলেছো, বাবা। নিন্দুককে সুযোগ দিতে নেই। ব্যবহারিক দিকটার দিকে নজর দিতে হবে বৈকি।"

দক্ষিণেশ্বরের আশপাশ সব ঠাকুরের নখদর্পণে। বলেন, "তুমি মা, মণ্ডলদের ঘাটে গিয়ে বাস করো। জায়গাটা নিরিবিলি, পাশেই একটা ছোট শ্মশান। ভালো লোক, ভক্ত লোক, সব কাছাকাছি রয়েছে, তোমায় তারা দেখাশুনা করবে, যত্নে রাখবে।"

সত্যি, ভৈরবীর পক্ষে এ ঘাটটি হয়ে দাঁড়ালো একটি আদর্শ বাসস্থান। দক্ষিণেশ্বরের বাগানের অতি নিকটে, কিছুটা উত্তরে, এই ঘাট। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনের সহায়তা করার প্রত্যাদেশ পেয়ে ভৈরবী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সে কাজ এস্থানে থেকে অতি সহজে করা যাবে। ঠাকুরের প্রতি অপার বাৎসল্য রসে আবিষ্ট হয়েছেন ভৈরবী, দিনে যতবার ইচ্ছে ততবার মন্দির চত্বরে এসে তাঁকে তিনি দেখে যেতে পারবেন। পঞ্চবটীতেও বসতে পারবেন তাঁকে নিয়ে।

মণ্ডলদের ঘাটে এসে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করলেন ভৈরবী। ঘাটের মালিকেরা সাগ্রহে এই দিব্যদর্শনা সন্ন্যাসিনীকে অভ্যর্থনা জানালেন। স্থানীয় ধনী জমিদার নবীন নিয়োগীর ভক্তিমতী স্ত্রী সোৎসাহে এগিয়ে এলেন তাঁর থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য। ঘাটের একপাশের ঘরে একটি তক্তপোশ এনে দিয়ে সন্ন্যাসিনী

মায়ের শয্যা তৈরি হলো। ভক্ত নারীরা প্রচুর চাল ডাল ঘি ময়দাও রেখে গেলেন তাঁর কাছে।

স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে অনেকে অল্পদিনের ভেতর ভৈরবীর প্রতি আকৃষ্টা হয়ে পড়েন। সিদ্ধা সাধিকারূপে তাঁর খ্যাতি রটে যায় এ অঞ্চলে। সেই সঙ্গে ভৈরবীর মুখে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহিমা অবগত হয়ে সবাই বিস্মিত হয়ে যান। কালীমন্দিরের যুবক পুরোহিত, ছোট ভট্‌চাজের একটু ভাব-টাব হয়, কালীমায়ের ভর হয়, লোক পরম্পরায় গ্রামবাসিনীরা এ কথাই শুনেছেন। কিন্তু সারা ভারত পরিব্রাজন ক'রে আসা, এই তেজস্বিনী ভৈরবীর মুখে শোনা যাচ্ছে সেই পূজারী ব্রাহ্মণের অপার মাহাত্ম্যের কথা! তিনি নাকি শুধু সিদ্ধপুরুষই নন, একটি অবতারকল্প পুরুষ। তাঁকে দর্শন করলেও নাকি পুণ্য হয়। দল বেঁধে, গঙ্গাস্নান সেরে, ভক্তিমতী মেয়েরা ভৈরবীর পিছু পিছু যেতে শুরু করেন রামকৃষ্ণের দর্শনে।

রামকৃষ্ণ-পুঁথিতে অক্ষয়কুমার সেন গ্রাম্য মেয়েদের এই দর্শন বিষয়ে লিখেছেন:

যত্ন করে অন্তঃপুরে রমণীর গণ।
ভক্তিভরা প্রভুকথা করেন শ্রবণ॥
কিবা ধন প্রভুদেব কি চরিত তাঁর।
এরে নররূপধারী হরি-অবতার॥
ভক্তিভরে নমস্কারে কিবা ফলে ফল।
বারেক দর্শন করে চিত নিরমল॥
পেলে অণুকণা কৃপা জীবে কিবা পায়।
ব্রাহ্মণী উন্মত্তা হয়ে প্রভু গুণ গায়॥
ধরে পায় ব্রাহ্মণীর রমণীর গণ।
কি উপায়ে করে তাঁরা প্রভুরে দর্শন॥
দরশনলুব্ধমনা দেখি বামাদলে।
উষায় আনিত সঙ্গে গঙ্গাস্নান ছলে॥

এইরূপ ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায়।
ব্রাহ্মণী রমণীমন মজিয়া বেড়ায়॥
মন দিয়া শুনিবারে যদি কর হেলা।
বুঝিতে নারিবে মন শ্রীপ্রভুর লীলা॥
গিরিপদে বিন্দু বিন্দু মাত্র ঝরে জল।
প্রণালী আকার করে ক্রমশঃ কেবল॥
তৃণ ভাসে হেন স্রোত নাহিক প্রথমে।
বলবতী স্রোতস্বতী সাগরসঙ্গমে॥
তেমনি বুঝিবে মন কার্য শ্রীপ্রভুর।
সামান্য ধরিয়া উঠে যায় কত দূর॥

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে ভৈরবী যোগেশ্বরী কর্তৃক এই মাহাত্ম্য প্রচার ও ভক্তসঙ্ঘ সংগঠনের প্রাথমিক প্রয়াসের একটা বিশেষ তাৎপর্য ও মূল্য রয়েছে। এ প্রয়াস দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পরিচালক ও দর্শনার্থীদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক বেশী সজাগ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ক'রে তোলে। ঠাকুরের আত্মবিশ্বাসকেও করে উদ্দীপিত।

মথুরানাথ বিশ্বাস ছিলেন রানী রাসমণির জামাতা, তাঁর এস্টেটের পরিচালক ও কালীমন্দিরের কর্তাব্যক্তি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাধন-জীবনের প্রথম দিককার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিনি। মথুর সত্যই সৌভাগ্যবান্। যে সময়ে মন্দিরের দর্শনার্থী ও কর্মচারীরা রামকৃষ্ণকে পাগ্‌লা ছোট ভট্‌চাজ্‌ বলে জানতো, তাঁর আর্তিময় মাতৃসাধনাকে উপহাস করতো বায়ুরোগ বলে, সেই সময়ে মথুরই ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেন তাঁর মাহাত্ম্য।

ঠাকুরের ত্যাগ বৈরাগ্য নানাভাবে মথুর যাচাই করেছেন, শুদ্ধাভক্তির বন্যা প্রবাহ ও দিব্যোন্মাদের অবস্থাগুলো সন্দর্শন করেছেন বৎসরের পর বৎসর। জেনেছেন তাঁকে মা জগদম্বার একটি শুদ্ধসত্ত্ব, ভক্তিসিদ্ধ সাধকরূপে। এক অমোঘ আকর্ষণে বাঁধা পড়েছেন মথুর এই তরুণ সিদ্ধ তাপসের চরণে। তাছাড়া, বার বার নানা

বৈষয়িক বিপদের ঝড় ঝঞ্ঝায় রক্ষা পেয়েছেন তাঁরই কৃপাবলে। বাবা বলে ডেকেছেন তাঁকে, বসিয়েছেন আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসার আসনে।

দক্ষিণেশ্বরে এলেই দেবী দর্শনের শেষে মথুর এই বাবার সঙ্গে পরমানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত ক'রে যান। ঈশ্বরীয় নানা কথা আলোচিত হয়, উভয়ের মনের কথা অকপটে একে অন্যের কাছে তুলে ধরেন। মাঝে মাঝে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে মথুর জানবাজারে রানীর প্রাসাদোপম ভবনেও নিয়ে আসেন, সেবা যত্ন করেন আশ মিটিয়ে।

সেদিন মথুর কালীবাড়িতে এসেছেন। বাবার সঙ্গে পঞ্চবটীতে বসে নানা ঈশ্বরীয় কথায় ও হাস্য পরিহাসে লাঘব করছেন নিজের মনের ভার, দুশ্চিন্তার ভার।

এখানে কথাপ্রসঙ্গে নবাগতা তন্ত্রসাধিকা ভৈরবীর কথা উঠলো। তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে সাধু সন্তেরা আসতেন, মন্দিরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে বরাদ্দ করা সিধা নিয়ে ভোগরাগ লাগাতেন তাঁরা, তারপর আবার বেরিয়ে পড়তেন সংকল্পিত পরিব্রাজনে। এই আগন্তুক সাধুদের ভেতর ভৈরবীটি যেন অতি স্বতন্ত্র ধরনের। শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনার উৎস দুই-ই রয়েছে তাঁর জীবনে।

মথুর আরো শুনলেন, ভৈরবী কয়েকদিন হয় এসেছেন, আর এসেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন এ অঞ্চলে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আসা নাকি দৈবাদেশে। তিনি কিছুদিন যাবৎ সাধক রামকৃষ্ণেরই খোঁজ করছিলেন গঙ্গার তীরে তীরে।

বালকের মতো সহজ সরল ভঙ্গীতে রামকৃষ্ণ বললেন, "শুধু তাই নয় গো সেজবাবু, এখানকার সম্বন্ধে এমন সব নতুন আর অদ্ভুত কথা সে বল্‌ছে, যা সহজে কেউ বিশ্বেস করবে না।"

"কি বলছেন ভৈরবী, বল তো বাবা?" সাগ্রহে জানতে চান মথুর।

নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বল্‌তে থাকেন ঠাকুর,

"এখানটায় নাকি ঈশ্বরের অবতরণ ঘটেছে। বায়ু রোগ-টোগ নাকি কিছু নয়, এ হচ্ছে মহাভাব, যা দেখা গেছলো রাধারানী আর মহাপ্রভু চৈতন্যের ভেতর। ভৈরবী আরো বলছেন এখানকার সম্বন্ধে—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।"

মাতৃভাবে ভাবিতা ভৈরবীর এই দাবি স্নেহের প্রাবল্য বশত অতিভাষণ কিনা, এ দাবি যুক্তিসহ ও শাস্ত্রসম্মত কিনা, সে আলোচনা আমরা এখানে করবো না। কিন্তু এই বিদুষী ও অভিজ্ঞা সাধিকার সেদিনকার এই দৃপ্ত ঘোষণা যে পঁচিশ বৎসরের তরুণ সাধক রামকৃষ্ণের অন্তরে একটা চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ঠাকুর সম্পর্কে ভৈরবীর এই ধারণার মূলে হয়তো ছিল প্রধানত তিনটি কারণ। প্রথমত, দৈবাদিষ্ট হয়ে গঙ্গাতীরের এই দেবী মন্দিরে এসে ভৈরবী এমন এক সাধকের শিক্ষাগুরু হতে চাইছেন, যিনি এক পরম শুদ্ধসত্ত্ব, অপাপবিদ্ধ আধার, যাঁর ভেতরে রয়েছে আগামী দিনের ঈশ্বরপ্রেরিত এক বিরাট পুরুষের অভ্যুদয় সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত তাঁর ধারণা হলো, রামকৃষ্ণের দেহে ভক্তি গ্রন্থে বর্ণিত মহাভাবের লক্ষণসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে সেসময়কার ঘটনা শুনে ভক্ত অক্ষয় সেন লিখেছেন :

ভক্তিমুখী ব্রাহ্মণী ভক্তির আচরণ।
অবিরত ভক্তিশাস্ত্র করে অধ্যয়ন ॥
একদিন সমাসীন প্রভুর গোচরে।
অনুরাগে ভক্তিগ্রন্থ পড়ে ভক্তিভরে ॥
যথা অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিবরণ।
নানাবিধ অশ্রু আদি পুলক কম্পন ॥
যবে যে ভাবের কথা পড়েন ব্রাহ্মণী।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে তাহা উদয় তখনি ॥
পড়ে গ্রন্থ আর প্রভু-অঙ্গ পানে চায়।
বর্ণিত প্রত্যক্ষ দুঁহে একত্র মিলায় ॥

করতালি দিয়া তবে নেচে নেচে বলে।
এইতো গৌরাঙ্গদেব নিতায়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথাতথা পুরী মধ্যে এই বার্তা ঘোষে॥
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌরগুণধাম।
সাব্যস্তে সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥

এ ছাড়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে সিওড়ের অলৌকিক দর্শনের কাহিনীটি শুনেও ভৈরবী কম উৎসাহিত হন নি। বছর দেড়েক আগে ঠাকুর কামারপুকুরে গিয়েছিলেন। হৃদয়ের বাড়ি কাছেই, সিওড় গ্রামে। সেখানে পালকিতে চড়ে একদিন তিনি বেড়াতে গেলেন।

মাথার ওপরে নিঃসীম আকাশের মহা বিস্তার, নিচে যতদূরে চোখ যায়, ধু-ধু করছে শস্যভরা শ্যামল প্রান্তর। মাঝে মাঝে বট পাকুড়ের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাহকেরা সুযোগমতো পালকি নামিয়ে বসছে, তামাক খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। প্রকৃতির এই রম্য পরিবেশে ঠাকুরের মনের গতি স্বভাবতই তখন ঊর্ধ্বমুখী। পরমানন্দে ভাবলোকে তিনি বিচরণ করছেন।

হঠাৎ সে সময় তাঁর নয়নসমক্ষে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠলো এক অপূর্ব দৃশ্য। দেখলেন, তাঁর দেহের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটি বালকমূর্তি, নয়নমন-লোভন তাঁদের রূপ, দিব্য আনন্দের আভায় চোখ মুখ ঝলমল করছে। বালক দুটি কখনো ঠাকুরের পালকির পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। কখনো হাসি গল্পে আনন্দে রঙ্গে তারা প্রগল্‌ভ, উচ্ছল। কখনো বা ঝোপে-ঝাড়ে প্রান্তরে ছুটাছুটি করছে বনফুল আহরণের জন্য। কিছুক্ষণ এই সব লীলাখেলা ও রঙ্গরসের পর দিব্য মূর্তি দুটি আবার ঠাকুরেরই দেহের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

এ কয়দিনের ঘনিষ্ঠতায় নিজের সাধন ভজন ও অলৌকিক অভিজ্ঞতার নানা কথাই রামকৃষ্ণ তাঁর এই ভৈরবী মায়ের কাছে সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে সিওড়ের এই অতীন্দ্রিয় দর্শনের কাহিনীটি বাদ দেন নি।

একথা শুনে ভৈরবী ভাবাবেগে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন। সহর্ষে বলেছিলেন, "বাবা, তুমি কিন্তু ঠিকই দেখেছো। এবার যে নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। নিত্যানন্দ আর চৈতন্যদেব দুটিতে এবার এসেছেন একসঙ্গে। তাঁরা যে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তোমারই দেহে।"

"কি জানি বাপু, কে জানে অত সব কথা।" বলে ঠাকুর সেদিন চুপ ক'রে যান।

অভ্যাসমতো মথুরের কাছে নিজের অনেক কথাই ঠাকুর মন খুলে বলে থাকেন। পঞ্চবটীতে বসেও সেদিন বলছিলেন। ভৈরবীর অবতার তত্ত্বের জের টেনে ঠাকুর মথুরকে বললেন, "আমি তো এর কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে বাপু, তোমার কি মনে হচ্ছে বলতো?"

বাবার ওপর মথুরের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা ও আস্থা। কিন্তু মথুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ়চেতা পুরুষ, ইংরেজী পড়েছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের কিছু কিছু সন্ধান রাখেন। তাছাড়া, সুদক্ষ বিষয়ী মানুষ তিনি, তাই লোক চরিত্রের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এত বছরের অভিজ্ঞতার ফলে মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন, দেবী জগদম্বার অসীম কৃপা রয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ওপর। আর ঠাকুরকে তিনি বহু আপদ বিপদে আশ্রয়-স্বরূপ বলে গণ্য ক'রেও আসছেন। এ সবই ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলে তাঁকে অবতার-টবতার আখ্যা দেওয়া—এতটা অবধি যেতে তিনি রাজী নন।

মুচকি হেসে মথুর বলেন, "বাবা, আমাদের শাস্ত্রে আছে, অবতার দশটি। তার বেশী কি ক'রে বলা যায়?"

কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে পঞ্চবটীর অনতিদূরে দেখা গেল ভৈরবীকে। সঙ্গে কয়েকটি ভক্ত সঙ্গিনী। তাদের নিয়ে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে পরম স্নেহভরে এগিয়ে আসছেন।

"ঐ যে গো, ঐ ভৈরবীর কথাই তোমায় এতক্ষণ বলছিলাম," সানন্দে বলে ওঠেন রামকৃষ্ণ।

কাছে এলে দেখা গেল—ভৈরবীর হাতে একটি ভোজনের থালা,

তাতে প্রচুর মিষ্টান্ন, ক্ষীর, ননী সর সাজানো। এ যেন নন্দরানী মা-যশোদা। বাৎসল্য রসে দেহমনপ্রাণ ভরপুর। সঙ্গিনীদের নিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় গোপালকে খাওয়াতে এসেছেন। ভাবাবেগে সারা দেহ কাঁপছে, চোখমুখ আরক্তিম।

মথুর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এই প্রিয়দর্শনা সন্ন্যাসিনীর দিকে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু যৌবনের তরঙ্গ যেন থমকে আছে তাঁর নিটোল দেহে। কাঁচা সোনার মতো বর্ণ, ভাবে ঢুলুঢুলু আয়ত দুটি নয়ন, আর মাথার দুপাশ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আলুলায়িত দীর্ঘ কেশরাশি। বিস্ময়কর আকর্ষণ রয়েছে এই সন্ন্যাসিনীর ভেতর।

ঠাকুরের পাশেই মথুর উপবিষ্ট। তাই বাৎসল্যভাবে উদ্দীপিতা ভৈরবী নিজেকে তাড়াতাড়ি সংযত ক'রে নেন, শান্ত ও স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরম স্নেহভরে মিষ্টির থালাটি এগিয়ে দেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের হাতে।

ঠাকুর সাদরে তা গ্রহণ করেন, পরমানন্দে রসালো খাদ্যগুলি করেন নিঃশেষিত। এবার বালকের মতো সহজ ভঙ্গীতে তাঁর ভৈরবী মাকে বলেন, "ওগো, তুমি এখানকার সম্বন্ধে যা বল, সে সব আজ এঁকে বলছিলাম। তা, এঁর মতে তো দশ অবতারের বেশী নেই। তবে ?"

সন্ন্যাসিনীকে জোড় হস্তে নমস্কার করেন মথুর। সহাস্যে স্বীকার করেন, "হ্যাঁ, বাবাকে এ কথাই আমি বলছিলাম বটে।"

আশিস্ জানাবার পর শাস্ত্রীয় তথ্য প্রমাণ দিতে উদ্যত হন ভৈরবী, "কেন বাবা, আমি তো অশাস্ত্রীয় কিছু বলি নি ? শ্রীমদ্‌ভাগবত ভক্তিশাস্ত্রের আকর গ্রন্থ। তাতে স্বয়ং ব্যাসদেব প্রথমে চব্বিশটি প্রধান অবতারের কথা লিখেছেন, তারপর উল্লেখ করেছেন আরো বহুতর অবতারের কথা। তাছাড়া, বৈষ্ণব পণ্ডিতদের পুঁথিতেও রয়েছে, মহাপ্রভু আবার আবির্ভূত হবেন জীব-কল্যাণের জন্য।"

কোনো মন্তব্য না করে, বিতণ্ডায় না জড়িয়ে, মথুর নীরবে শুনে যাচ্ছেন তাঁর কথা।

এবার ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ভৈরবী বলে ওঠেন, "আমি তো দেখছি, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য বার করা যায়। শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের তোমরা ডেকে আনো, বাবা। আমি শাস্ত্র প্রমাণ থেকে আমার কথার সমর্থন দেখাবো।"

এই বিদুষী সন্ন্যাসিনীকে মথুর এ সময়ে আর ঘাঁটাতে চান নি। কিছুটা নীরব থেকে, অপর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে থাকেন ঠাকুরের সঙ্গে। তারপর করেন বিদায় গ্রহণ।

কয়েকদিন পরের কথা। মথুর মা-ভবতারিণীকে দর্শন করতে এসেছেন। লক্ষ্য করলেন, নবাগতা ভৈরবী দেবীর ধ্যান মনন সেরে মন্দির থেকে অবতরণ করতে যাচ্ছেন।

মথুর একটা বড় জমিদারী ও ব্যবসায়ের সর্বনিয়ন্তা। যেমন তীক্ষ্ণধী, তেমনি আমোদপ্রিয় এবং পরিহাস নিপুণ বলে তাঁর খ্যাতি আছে। এই ভৈরবী কোন্ স্তরের সন্ন্যাসিনী, সাধনা ও সিদ্ধির কোন্ স্তরে তিনি অধিষ্ঠিতা, কোনো কিছুই তাঁর জানা নেই। সংসার-জীবনে অনেক সৎ ও সুধী ব্যক্তির পদস্খলন মথুর দেখেছেন। ভ্রষ্ট সাধুসন্ত ও সন্ন্যাসিনীদের খবরও তিনি ঢের জানেন। বিশেষত তান্ত্রিকদের ভোগবাদ ও যৌন বিচ্যুতির অনেক রসালো কাহিনীও তাঁর জানা। তাই এই ভৈরবী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তখনো তাঁর আসে নি।

ঠাকুরের মুখে ভৈরবীর প্রশংসা শুনেছেন বটে, কিন্তু নির্বিচারে তা গ্রহণ করতে পারেন নি। ভেবেছেন, বাবা সরল মানুষ, ভৈরবীর স্নেহের স্পর্শে বিগলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে সন্দেহ করা বা যাচাই করার কথা বাবার হয়তো মনেই আসে নি। তাই বলে আমরা পাকা সংসারীরা গৈরিক দেখেই একজনকে বিশ্বাস করে বসবো কেন? তাই এঁর সম্বন্ধে সন্দেহে বিস্ময়ে আন্দোলিত হচ্ছে মথুরের মন। তরুণ বয়সে যৌবনচঞ্চল দেহ মন নিয়ে ইনি কত পরিব্রাজন করেছেন। পথে প্রান্তরে মাঠেঘাটে একলাটি ঘুরে বেড়িয়েছেন। কত কামুক গৃহী ও সন্ন্যাসী হয়তো এঁর পেছনে লেগেছে। কারুর

সঙ্গে কি একটা নট্‌ঘট্ হয় নি ? এখনি বা কি ? ইনি মধ্যবয়সী বটে, কিন্তু দেহের রূপ যৌবন পড়ন্ত হওয়া দূরে থাক, যেন অটুট রয়েছে।

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন ভৈরবী। আমুদে মথুর পরিহাসের সুরে ডেকে বলেন, "কিগো ভৈরবী, তোমার ভৈরবটি কোথায় ?"

ক্রুদ্ধা হলেন না এই প্রতিভাময়ী সন্ন্যাসিনী, তাঁকে এতটুকু অপ্রতিভ হতেও দেখা গেল না। স্থির নেত্রে রহস্যকারী মথুরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দেখালেন দেবী ভবতারিণীর পদতলে শায়িত মহাদেবের মূর্তির দিকে। প্রশান্ত স্বরে বললেন, "ঐ তো ওখানে রয়েছেন আমার ভৈরব।"

সুচতুর মথুর হটবার পাত্র নন, রসিয়ে উত্তর দিলেন, "ওটি তো অচল। পাথরে গড়া। আমি যে সচল ভৈরবের কথা বলছি।"

"যদি অচল শিবকে সচলই করতে না পারি, তবে ভৈরবী হয়েছি কেন ?" ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী।

গম্ভীর কণ্ঠের এই আত্মবিশ্বাস-ভরা বাণী শোনামাত্র মথুর বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। মুখে তাঁর আর কোনো কথা যোগালো না।

ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী যে একজন যোগবিভূতিসম্পন্ন উঁচুদরের সন্ন্যাসিনী, তা অচিরেই মথুর, রানী রাসমণি ও মন্দির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আরো জানা যায়, তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনা যেমন তিনি জ্ঞাত আছেন, তেমনি পারদর্শিনী তিনি রাগাত্মিকা ভক্তির সাধনায়।

এ সময়ে তরুণ সাধক রামকৃষ্ণের জীবনপ্রবাহে চলছে ভক্তিপ্রেম রসের প্রবল তরঙ্গাভিঘাত, আর সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড গাত্রদাহ। এ দাহের তাড়নায় বার বার গঙ্গায় অবগাহন করছেন, কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে বসে আছেন। কখনো বা চলছে ঘরের মেজে ভিজিয়ে আদুল গায়ে গড়াগড়ি দেওয়া। কিন্তু এ অন্তর্দাহের কোনো কমতি নেই, ভেতরটা যেন

জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে মরছেন দিনের পর দিন।

করুণ স্বরে ভৈরবীকে বললেন, "গায়ের জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার। কয়েক বছর আগেও একবার হয়েছিল, অনেক কাণ্ডের পর নিস্তার পাই। এবার কিন্তু প্রাণ বাঁচানো দায়। মথুর, হৃদু আর কবরেজরা তো চেষ্টা কম করে নি। কিছুতেই কিছু হলো না। মা-জগদম্বা এই খোলটাকে কি করবেন কে জানে ?"

"কিচ্ছু ভাবো না তুমি বাবা—এ তোমার কোনো ব্যাধি নয়।" স্নেহভরে আশ্বাস দেন ভৈরবী। "আসলে এ হচ্ছে ইষ্টবিরহের জ্বালা। মহাভাবের বেগ এমনিভাবে আসে, আর এমনি অন্তর্দাহ হয়। আমি এর ব্যবস্থা করছি।"

মথুর দক্ষিণেশ্বরে এলে ভৈরবী বলেন, "বাবার জন্য তোমরা ভেবো না। এ জ্বালার অব্যর্থ ওষুধ, গলায় সুগন্ধি ফুলের মালা ধারণ আর সারা শরীরে চন্দন লেপন।"

হাস্য সংবরণ করতে পারেন না মথুর। ভৈরবী পাগলের মতো এসব বলে কি ?

মনে মনে ভাবতে থাকেন, কাঁড়ি কাঁড়ি কবরেজী ওষুধ কতো খাওয়ানো হলো। মধ্যমনারায়ণ আর বিষ্ণুতেল মাথায় মাখানো হলো এতদিন ধরে। এ সবে কোনো ফল হলো না। আর এখন ফুলের মালা আর চন্দন দিয়ে ঠাকুরকে নট সাজিয়ে দিলেই এই দুঃসাধ্য রোগ সেরে যাবে ?

"কি বাবা, চুপ ক'রে রইলে যে ? আমার কথায় বিশ্বাস হলো না ? এ তো ব্যাধি নয় যে তোমার ডাক্তার কবরেজে সারিয়ে দেবে। এ যে ইষ্টবিরহের ব্যাধি। পুষ্প চন্দনে দেহকে বিভূষিত ক'রে, গাঢ়তর প্রেমভাবনার ভেতর দিয়ে ইষ্টের সঙ্গে একাত্মক হলে, তবেই তো এ যন্ত্রণার অবসান হবে। মাল্যচন্দনে দিব্যপ্রেমের স্ফুরণ হবে, এগিয়ে আসবে দেহের ভেতরে ইষ্টস্ফূর্তি।"

থমকে গেলেন মথুর বিশ্বাস। ভাবলেন, ভৈরবীর এ প্রস্তাব কিছুটা

হাস্যকর বটে, কিন্তু তাঁর কথা মেনে নিতে আপত্তিই বা কোথায়? ফুল আর চন্দন সংগ্রহ করা তো অতি সহজ কাজ। দেখাই যাক্‌না এর ফল কি দাঁড়ায়। অবস্থার যদি কোনো উন্নতি না হয়, রোগী নিজেই তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

ভৈরবীর কথা মতো, ঠাকুরকে গঙ্গায় স্নান করিয়ে এনে গলায় দোলানো হলো কয়েক লহর ফুলের মালা, আর সারা দেহ করা হলো চন্দনে চর্চিত।

তিন দিনের জন্য এই ব্যবস্থা। ফল সম্বন্ধে সকলেই সন্দিগ্ধমনা। কিন্তু তিন দিনের ব্যবধানে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই ঠাকুরের গায়ের অসহ্য জ্বালা একেবারে দূরীভূত হয়েছে। আনন্দে ভরে উঠেছে তার দেহ মন, গৌরকান্তি যেন ফেটে বেরুতে চাইছে।

অনেকেই বিস্মিত হলেন ভৈরবীর এই কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দেখে। সংশয়বাদী লোক সব সময়েই কিছু সংখ্যক থাকে, তারা বলতে থাকেন, "এটা কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে। এতো ওষুধ আর মাথার তেলের ফল ফলেছে, এতদিনে।"

ঠাকুর, মথুর এবং বিজ্ঞ ভক্তরা উপলব্ধি করলেন, ভৈরবীর দিব্যদৃষ্টি রোগ নির্ণয় আর ঔষধি প্রয়োগে ভুল করে নি, তাঁর মুখের বাক্যও প্রতিপন্ন হয়েছে অব্যর্থ বলে। ঠিক তিন দিনের দিনই ঠাকুর একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন।

ভৈরবীর বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও যোগবিভূতি সম্পর্কে মথুরের মূল্যায়ন এবার কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু এই সাধিকাটি যে যত্রতত্র ঠাকুরকে অবতার বলে প্রচার করছেন। সেকথা অনেকেরই বিশ্বাস হচ্ছে না। কেউ কেউ এ নিয়ে উপহাস ও নিন্দাও করছেন। তাছাড়া, মথুরের নিজেরও এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ নয়, তাই এ যাবৎ ভৈরবীর কথায় তিনি তেমন গুরুত্ব দেন নি।

কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো ঠাকুর রামকৃষ্ণেরই আগ্রহে ও অনুরোধে।

মথুরকে একদিন ধরে বসলেন, "বাম্‌নী এত সব কথা এখানকার সম্বন্ধে বলে বেড়াচ্ছে। বড় বড় পণ্ডিতদের আনিয়ে তর্কসভা করতে চাইছে। তা বাপু, একটিবার তাঁদের ডাকাও না। দেখাই যাক্, তারা কি বলে।"

মথুর ভাবলেন, বাবার যখন ইচ্ছে হয়েছে, দু একজন পণ্ডিতকে আহ্বান করা যাক্‌না কেন ? ওষুধ বিষুধে এযাবৎ কত খরচই তো হলো। এবার পণ্ডিতদের একটা সভা বসালে, তাদের আলোচনা শুনলে, ক্ষতি কি ?

শুধু তাই নয়, এ ব্যবস্থার ভেতরে একটা ক্ষীণ আশার আলোও দেখতে পেলেন মথুর। পণ্ডিতেরা যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির বলে ভৈরবীর কথাগুলো কেটে দেয়, তাতে অন্তত একটা উপকার হবে। বাবা বুঝতে পারবেন, অতিরিক্ত কঠোরতা ও ধ্যান ভজনের ফলে বায়ুরোগ তাঁর সত্যিই হয়েছে। সত্য ঘটনাটা উপলব্ধিতে এলে, তখন নিজেই নিজেকে অনেকটা তিনি সামলে নেবেন, শান্ত হতে চেষ্টা করবেন।

তাছাড়া, ভৈরবী দিন রাতের বেশী সময়ে তাঁর কাছেই থাকছেন। তাঁর অবতারের তত্ত্ব শুনতে শুনতে বাবার মাথাটা এবার হয়তো আরো বিগড়ে যাবে, হয়ে যাবেন উদ্দাম পাগল।

খোঁজখবর নিয়ে, ভেবেচিন্তে মথুর বিশ্বাস ঠিক করলেন, সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণকে আনা যাক্। আজকাল কলকাতা ও আশেপাশের বৈষ্ণব মহলে পণ্ডিতের খুব নামডাক। বাবার অবস্থাটি তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন।

ভৈরবী যোগেশ্বরীও শুনেছেন পণ্ডিতের কথা। তিনি সায় দিলেন এ প্রস্তাবে। স্থির হলো, ভৈরবীর সঙ্গে পণ্ডিতের বিচার অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে।

এসময়ে আর এক অদ্ভুত উপসর্গ এসে জোটে ঠাকুরের দেহে। নিরন্তর ক্ষুধার জ্বালায় তিনি অস্থির। আহারের পরিমাণ অবিশ্বাস্য

রকমে বেড়ে গিয়েছে। আকণ্ঠপুরে ভোজন করছেন, তারপরই আবার চাই। এ রাক্ষুসে ক্ষুধার যেন নিবৃত্তি নেই।

ভৈরবীকে জানালেন, "এ আবার কি রোগে ধরলো বলতো? দিনরাত খাই-খাই বাই হয়েছে। লোকেই বা বলবে কি?"

"না বাবা, এ তোমার কোনো রোগ-টোগ নয়। সাধনার উন্নত অবস্থায় মানুষের মোটা শ্বাস সূক্ষ্মতর হয়ে যায়, ঐ সূক্ষ্ম বায়ুস্তর কেবলই হতে থাকে উর্ধ্বমুখী। ফলে পাকস্থলীতে হয় শূন্যতাবোধ, খাই-খাই চলতে থাকে অবিরত। যোগ, তন্ত্র, ভক্তি, জ্ঞান সব সাধনার উচ্চাবস্থায়ই এ উপসর্গ এসে জোটে। এটা সাময়িক, ভয় পাবার কিছুই নেই। দাঁড়াও, আমি এর ব্যবস্থা করছি।

পরদিন মথুর দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর বালকের মতো তাঁর এই ক্ষুধা সমস্যার কথা তাঁকে শোনাতে থাকেন।

ভৈরবী কাছেই ছিলেন। সহাস্যে মথুরকে বললেন, "বাবার ঘরে ভাঁড়ে ভাঁড়ে চিঁড়ে-মুড়কি, লুচি-সন্দেশ রসগোল্লা সাজিয়ে রেখে দাও। ক'দিনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মথুর একাধারে বাবার ভক্ত, সেবক ও রসদদার। এ প্রস্তাব শুনে তাঁর আনন্দ উৎসাহের অবধি নেই। তাঁর আদেশে অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হলো প্রচুর ভোজ্যবস্তুর।

ভৈরবীও মহাহৃষ্ট, ঠাকুরকে বললেন, "নাও বাবা। তোমার ওষুধ-পত্রের যোগাড় হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন দিনরাত তোমার ঘরের ভেতর বসে থাকো, আর প্রাণ যখন যা চায়, পেটভরে তা খেতে থাকো। দেখবে, কয়েক দিনের ভেতর তোমার এ রাক্ষুসে খিদে চলে যাবে।

বস্তুত তাই হলো। অচিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঐ অস্বাভাবিক উপসর্গটি থেকে মুক্তি পেলেন।

আলোচনা সভার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। সঙ্গে রয়েছেন একদল ভক্ত ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও বৈষ্ণবসমাজে বৈষ্ণবচরণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তখন প্রচুর। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য অনেকে তাঁর দ্বারস্থ হতেন। তাঁর ভাগবত ও চরিতামৃতের পাঠ ও ব্যাখ্যানের কৌশল ছিল অসাধারণ। তাছাড়া, বিশিষ্ট একজন সাধক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বৈষ্ণবীয় মতের গুহ্য সাধনায়, কর্তাভজা-পন্থী পরকীয়া প্রেমসাধনায় ব্রতী ছিলেন বৈষ্ণবচরণ।

সভামধ্যে এই পণ্ডিত ও তাঁর দলবলের সম্মুখে রামকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এসে দাঁড়ালেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। সিংহিনীমাতা যেন তার শাবককে রক্ষার জন্য চেষ্টিতা।

সভার বিষয়বস্তু ছিলেন—ঠাকুর রামকৃষ্ণ। অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেখানে তিনি উপস্থিতও ছিলেন সেদিন। উত্তরকালে তাঁর মুখে সেদিনকার বিবরণ শুনে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

"ব্রাহ্মণী ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে লোকমুখে শুনিয়াছেন, এবং যাহা স্বয়ং চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ভক্তিপথের পূর্ব পূর্ব আচার্য সকলের জীবনে যে সকল অনুভব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঐ সকল কথার সহিত ঠাকুরের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া উহা একজাতীয় অবস্থা বলিয়া নিজমত প্রকাশ করিলেন।

"বৈষ্ণবচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনি যদি এবিষয়ে অন্যরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে ঐরূপ কেন করিতেছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।'

"মাতা যেমন নিজ সন্তানকে রক্ষা করিতে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হন, ব্রাহ্মণীও যেন আজ সেইরূপ কোন দৈববলে বলশালিনী হইয়া ঠাকুরের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর। আর ঠাকুর, যাঁহার জন্য এত কাণ্ড হইতেছে? আমরা যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি, ঠাকুর বাদানুবাদে নিবিষ্ট ঐ সকল লোকের ভিতর আলুথালুভাবে বসিয়া 'আপনাতে আপনি' আনন্দানুভব এবং হাস্য করিতেছেন। আবার কখন বা নিকটস্থ বেটুয়াটি হইতে দুটি মউরি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া

তাঁহাদের কথাবার্তা এমনভাবে শুনিতেছেন, যেন ঐ সকল কথা অপর কাহারও সম্বন্ধে হইতেছে! আবার কখন বা নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন কথা 'ওগো, এই রকমটা হয়' বলিয়া বৈষ্ণবচরণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন।"

সভার মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ উপলব্ধি করলেন, ইনি একজন অতি উচ্চকোটির মহাত্মা।

এবার ভৈরবীর মুখে ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন। ভক্তিশাস্ত্রের তথ্যপ্রমাণ সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্কও কিছুটা হলো।

সুপণ্ডিত হলেও বৈষ্ণবচরণ একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক। ঈশ্বরীয় ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি। সভাজনদের বিস্মিত ক'রে সাগ্রহে ভৈরবীর মতবাদই মেনে নিলেন।

আনন্দভরে বৈষ্ণবচরণ আরো বললেন, "উনিশ রকমের যে যে ভাব বা অবস্থার মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাব বলে নির্দেশ করেছেন, যা শুধু দ্বাপরযুগে রাধারানী আর এ যুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের হয়েছিল। মনে হচ্ছে, তার সবগুলো লক্ষণ এঁর ভেতরে প্রকাশিত। সাধারণত সাধকদের ভাগ্যক্রমে মহাভাবের দু-চারটে অবস্থাই প্রকট হয়। উনিশটি ভাবের উদ্দাম বেগ একযোগে উপস্থিত হলে কেউ তা ধারণ করতে পারেন না। এর আগে শুধু রাধারানী আর চৈতন্যদেবই সে সামর্থ্য দেখিয়েছেন।"

মথুর এবং উপস্থিত পণ্ডিত ও ভক্ত দর্শকেরা সবাই তো একথা শুনে হতবাক্।

বৈষ্ণবচরণের উচ্ছ্বাসময় স্বীকৃতি শুনে রামকৃষ্ণ নিজেও বালকের মতো উৎফুল্ল ও কৌতুকী হয়ে উঠেছেন। মথুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওগো, পণ্ডিত এসব কি বলছে? যা হোক্, রোগটোগ নয় জেনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।"

মথুর বাবাকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। বাবার কৃপায় এযাবৎ নানা সংকট থেকে তিনি ত্রাণ পেয়েছেন, ভবিষ্যতে

আরো বহুবার হয়তো পাবেন, এও তিনি বিশ্বাস করেন। কাজেই এ সভায় ভৈরবী ও আচার্য বৈষ্ণবচরণ কর্তৃক ঠাকুর রামকৃষ্ণের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি তাঁর ভালোই লেগেছে। তবে যুক্তিবাদী মানুষ তিনি, মন স্বভাবতই বিচারশীল। ভাবছেন, বাবা শুদ্ধসত্ত্ব শক্তিমান্ সাধক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অখ্যাত ভৈরবী আর বৈষ্ণব পণ্ডিত এ দুজনে ঠাকুরকে অবতার বললেই, তা সবাই মেনে নেবে কেন? আর এঁরা যে তাঁর সত্যকার মূল্য নিরূপণ করতে পেরেছেন, তা কি ক'রে বোঝা যাবে?

যা হোক্, সেদিন মথুরের মনের দুশ্চিন্তা কিছুটা হ্রাস পেল, বাবা আসলে মধ্যমনারায়ণ তেলের রোগী নন, উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার ফলেই তাঁকে মাঝে মাঝে এমন বেসামাল ও ক্ষেপাটে বলে মনে হয়।

আচার্য বৈষ্ণবচরণ কিন্তু অনেকাংশে বদলে গেলেন সেদিন থেকে। বিচার সভায় রামকৃষ্ণের দর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে এক অমোঘ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তিনি। উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর সাধন-জীবনের চাবিকাঠিটি রয়েছে এই অখ্যাত অজ্ঞাত কালীসাধকের হাতে।

ঠাকুরও তাঁর প্রতি করেছিলেন প্রসন্ন দৃষ্টিপাত। বেঁধেছিলেন তাঁকে কৃপার ডোরে।

তাই দেখা যেত, এর পর থেকে বৈষ্ণবচরণ সুযোগ পেলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হতেন। সাধনার নানা প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিতেন তাঁর কাছ থেকে, জেনে নিতেন নিজ জীবনের অনেক কিছু সমস্যার সমাধান।

শুধু তাই নয়, নিজের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও মুমুক্ষুদের তিনি অনেক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ঠাকুরের প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উপজিত না হলে বহুলখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য বৈষ্ণবচরণের পক্ষে এটা কখনো সম্ভবপর হতো না।

যদিও মত ও পথের কোনোই মিল ছিল না, তবুও বৈষ্ণবচরণ

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আগ্রহভরে তাঁর কর্তাভজা গুপ্ত সাধনচক্রে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন, "কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে কাছিবাগানে ঐ সম্প্রদায়ের আখড়ার সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঐস্থলে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ মত সাধনাদিতে রত থাকিতেন। ঠাকুরকে বৈষ্ণবচরণ এখানে কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এখানকার কতকগুলি স্ত্রীলোক ঠাকুরকে সদা সর্বক্ষণ সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকিতে দেখিয়া এবং ভগবৎপ্রেমে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ভাবাদি দেখিয়া, তিনি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয়ে সমর্থ হইয়াছেন কিনা জানিবার জন্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'অটুট সহজ' বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য বালক-স্বভাব ঠাকুর বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে ও অনুরোধে তথায় সরলভাবেই বেড়াইতে গিয়াছিলেন। উহারা যে তাঁহাকে ঐরূপে পরীক্ষা করিবে, তাহার কিছুই জানিতেন না। যাহাই হউক, তদবধি তিনি আর ঐ স্থানে গমন করেন নাই।

"ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্রবল, পবিত্রতা ও ভাবসমাধি দেখিয়া তাঁহার উপর বৈষ্ণবচরণের ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"

বৈষ্ণবচরণ এসময়ে ঠাকুরকে প্রায়ই দর্শন করতে আসতেন, তাঁর উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের কৃপাস্পর্শে নিজ জীবনের পুনর্গঠনেও তিনি প্রয়াস পেতেন।

বলা বাহুল্য, ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সারা অন্তর তখন তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর। দৈবাদেশ পেয়ে দক্ষিণেশ্বরে তিনি এসেছেন, তরুণ সাধক রামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছেন মাতৃরূপিণী অভিভাবিকারূপে। আবিষ্কার করেছেন তাঁর সাধন মাহাত্ম্য ও প্রতিশ্রুতিময় জীবনের পরম সম্ভাবনা।

মথুরের সঙ্গে দেখা হতেই ভৈরবী আবার নূতনতর তাগিদ দেন। "বাবা, নামকরা বৈষ্ণব আচার্যের সিদ্ধান্ত তো শোনা গেল। এবার একজন বড় তান্ত্রিক সাধক আনাও। তোমরা সবাই শোন, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে কি অভিমত সে দেয়।"

মথুরের কৌতূহলও উদগ্র হয়ে উঠেছে। বলেন, "বেশতো, কোন্ তান্ত্রিক আচার্যকে আনাতে চান, বলুন।"

"বাবা, শুনেছি ইন্দেশের গৌরী পণ্ডিত খুব উন্নত স্তরের সাধক। কৌলতত্ত্ব নাকি তাঁর বেশ জানা আছে। তাঁকে আনাও।"

সানন্দে সম্মত হলেন মথুর। আমন্ত্রণ জানিয়ে লোক পাঠানো হলো পণ্ডিতের কাছে।

গৌরীপণ্ডিত কয়েকটি বিশেষ তান্ত্রিক সিদ্ধাইর অধিকারী ছিলেন। প্রতিদিন মহাশক্তির অর্চনার পর তিনি হোম করতেন।

কোনো কোনো দিন তাঁকে একটি বিশেষ ধরনের হোম সম্পন্ন করতেও দেখা যেত। সাধারণত তাম্রাধারে বা মাটির ওপরে বালুকার বেদী রচনা ক'রে তার ওপর তান্ত্রিকেরা হোমাগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে থাকেন। গৌরী পণ্ডিতের ক্রিয়া ছিল অতি অদ্ভুত। নিজের বামহাতটি তিনি শূন্যে প্রসারিত করতেন, তার ওপরে থরে থরে সাজানো হতো একমণ পরিমাণ সমিধ কাষ্ঠ। তারপর এ সমিধে অগ্নি সংযোগ ক'রে, দক্ষিণ হাত দিয়ে পণ্ডিত দান করতেন ঘৃতাহুতি। এই সমিধের গুরুভার ও আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ গৌরী পণ্ডিত কিন্তু সহ্য করতেন অবলীলায় দণ্ডায়মান থেকে।

ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু উত্তরকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে এই অদ্ভুত হোমের কথাটি শোনা যেত। ভক্তদের কেউ কেউ সহসা এই কাহিনী বিশ্বাস করতে চাইতেন না, ঠাকুর তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলতেন, "ওরে আমি যে নিজের চক্ষে তাঁকে ওরকমটি করতে দেখেছি। ওটা তাঁর একটা সিদ্ধাই ছিল।"

গৌরী পণ্ডিতের দেবীপূজার এক বৈশিষ্ট্যের কথাও শ্রীরামকৃষ্ণের

মুখে শোনা যেত। দুর্গাপূজার সাড়ম্বর আয়োজন করতেন পণ্ডিত। তারপর নিজের সহধর্মিণীকে মূল্যবান বসন ও অলংকারে ভূষিত ক'রে উপবেশন করাতেন পবিত্র পূজা বেদীতে। তারপর দেবীজ্ঞানে তাঁকেই করতেন আরাধনা। নারীমাত্রকেই জগদম্বার অংশ স্বরূপ জ্ঞান করতেন গৌরী পণ্ডিত, তাই আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের শক্তিকে, স্ত্রীকে, প্রদান করতেন পূজার অর্ঘ্য।

গৌরী পণ্ডিতের একটি গুহ্য তন্ত্রসিদ্ধাই ছিল। তার সম্মুখীন হয়ে ঠাকুর নিজে কি কাণ্ড করেছিলেন তার সরস ও মজাদার বর্ণনা উত্তরকালে তাঁর মুখ থেকে অনেকে শুনতেন ও হেসে আকুল হতেন।

কারুর সঙ্গে কোনো শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্কের কথা থাকলে গৌরী পণ্ডিতকে ঐ বিশেষ সিদ্ধাইটি প্রয়োগ করতে দেখা যেত।

সভাক্ষেত্রে প্রবেশের সময়, 'হারে-রে-রে. নিরালম্বো লম্বোদর জননী কং যামি শরণং'—গম্ভীর স্বরে একথাগুলি উচ্চারণ ক'রে তান্ত্রিক আরাবে দশদিক তিনি প্রকম্পিত ক'রে তুলতেন।

সারদানন্দজী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ঠাকুর বলিতেন, জলদগম্ভীর স্বরে বীরভাবদ্যোতক 'হারে-রে-রে' শব্দ এবং আচার্যকৃত দেবী-স্তোত্রের ঐ এক পদ তাঁহার মুখ হইতে শুনিলে সকলের হৃদয় কি একটা অব্যক্ত ত্রাসে চমকিত হইয়া উঠিত। উহাতে দুইটি কার্য সিদ্ধ হইত। প্রথম, ঐ শব্দে গৌরীর ভিতরের শক্তি সম্যক্ জাগরিত হইয়া উঠিত; এবং দ্বিতীয়, তিনি উহার দ্বারা শত্রুপক্ষকে চমকিত ও মুগ্ধ করিয়া তাহাদের বলহরণ করিতেন। ঐরূপ শব্দ করিয়া এবং কুস্তিগীর পাহলোয়ানেরা যেরূপে বাহুতে তাল ঠোকে সেইরূপ তাল ঠুকিতে ঠুকিতে গৌরী সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন, পদদ্বয় মুড়িয়া তাহার উপর সেইভাবে সভাস্থলে বসিয়া তিনি তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তখন গৌরীকে পরাজয় করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত হইত না।

"গৌরীর ঐ সিদ্ধাইয়ের কথা ঠাকুর পূর্বে জানিতেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে পদার্পণ করিয়া যেমন গৌরী উচ্চরবে হারে-

রে-রে শব্দ করিলেন; অমনি ঠাকুরের ভিতর হইতে কে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গৌরীর অপেক্ষা উচ্চরবে ঐ শব্দ করাইতে লাগিল। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত ঐ শব্দে গৌরীও উচ্চতর রবে ঐ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চরবে হারে-রে-রে করিয়া উঠিলেন।

"ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেন, বার বার দুই পক্ষের সে হারে-রে-রে রবে যেন ডাকাত পড়ার মতো এক ভীষণ আওয়াজ উঠিল। কালীবাড়ির দারোয়ানেরা যে যেখানে ছিল, শশব্যস্তে লাঠিসোটা লইয়া তদভিমুখে ছুটিল। অন্য সকলে ভয়ে অস্থির!

"যাহা হউক, গৌরী এক্ষেত্রে ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর রবে আর ঐ সকল কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া শান্ত হইলেন এবং একটু যেন বিষণ্ণভাবে ধীরে ধীরে কালীবাটীতে প্রবেশ করিলেন। অপর সকলেও, ঠাকুর এবং নবাগত পণ্ডিতজীই ঐরূপ করিতেছিলেন জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল।

"ঠাকুর বলিতেন, তারপর মা জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাইয়ে লোকের বল হরণ ক'রে নিজে অজেয় থাক্‌তো, সেই শক্তির এখানে ঐরূপে পরাজয় হওয়াতে তার আর ঐ সিদ্ধাই থাকলো না। মা তাঁর কল্যাণের জন্য তার শক্তিটা (নিজেকে দেখাইয়া) এর ভেতর টেনে নিলেন।"

প্রথম দিনকার শক্তি সংঘাত এবং তারপর কয়েকটা দিন মন্দির-সংলগ্ন কুঠরীতে ঠাকুরের পুণ্যময় সান্নিধ্যে বাস ক'রে গৌরী পণ্ডিত বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন।

ঠাকুরের ভেতরকার ঈশ্বরীয় শক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের প্রবাহ তাঁর অহংবোধকে ক্রমে নির্জিত ক'রে ফেললো। তারপর নিজের অজ্ঞাতে শক্তিমান্ সিদ্ধ তান্ত্রিক একদিন এ তরুণ সাধকের চরণে ক'রে বসলেন আত্মসমর্পণ।

এ সব দেখেশুনে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর আনন্দের অবধি

নেই। পুত্রপ্রতিম রামকৃষ্ণের ভেতর ঈশ্বরীয় সত্তা ক্রমে জাগ্রত হয়ে উঠছে, অভ্যুদয় ঘটছে এক বিরাট পুরুষের, আর এই রামকৃষ্ণের সম্ভাবনাময় জীবনকে সর্বপ্রথমে তিনিই জনসমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তাই গর্বে ভরে উঠেছে তাঁর বুক।

আবার একটা বৃহত্তর বিচারসভা অনুষ্ঠিত হোক, এ ইচ্ছা প্রবল হয়ে ছিল ভৈরবী ও মথুর উভয়েরই অন্তরে। তাই কয়েক দিনের ভেতরেই তার আয়োজন করা হলো।

কলকাতায় আচার্য বৈষ্ণবচরণ এবং অন্যান্য পণ্ডিত ও সাধকদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। এবারকার সভা একটু বড় ধরনের।

নির্ধারিত দিনে, সভার প্রাক্কালে, দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। মায়ের সম্মুখে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে ভাবে উদ্বেল হয়ে ওঠে সারা দেহ মন প্রাণ।

অর্ধবাহ্য অবস্থায় মন্দির থেকে বেরিয়ে বারান্দায় নেমেছেন, এ সময়ে দেখা বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে। সবে মাত্র আচার্য সভা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন। দেবী দর্শনের জন্য এগিয়ে যেতেই পেলেন ঠাকুরের দিব্যোজ্জ্বল মূর্তির দর্শন। ভক্তির জোয়ারে বৈষ্ণবচরণের সারা দেহ তখন থরথর ক'রে কাঁপছে। ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করেন তাঁর প্রণাম।

ঠাকুরও তাঁর দর্শনে প্রেমানন্দে আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান নেই। আচার্য বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধে অবলীলায় তিনি আরোহণ ক'রে বসেন।

ভাবে প্রেমে আপ্লুত, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত এ শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের পুণ্যস্পর্শে বৈষ্ণবচরণও তখন অভিভূত। আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে, যুক্ত-করে, ঠাকুর রামকৃষ্ণের এক প্রশস্তিমূলক স্তবগাথা তখনি তিনি রচনা ক'রে ফেলেন, আবৃত্তি করেন পরম ভক্তিভরে। গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়তে থাকে পুলকাশ্রুর ধারা।

মন্দির সম্মুখস্থ নাট-মণ্ডপে দাঁড়িয়ে গৌরী পণ্ডিত, ভৈরবী, মথুর ও সভায় যোগদানকারী ভক্তজনেরা এই দৃশ্য দেখে হতবাক্।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান লাভ করেন, ভাবতন্ময় বৈষ্ণবচরণও

ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন। এবার উভয়ে ধীরে ধীরে উপনীত হন সভামণ্ডপে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবচরণের এই প্রেমময় মিলনদৃশ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সভাজনদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে অব্যক্ত ভাবতরঙ্গের। এ তরঙ্গের অভিঘাত অভিভূত করেছে তন্ত্রসিদ্ধ গৌরী পণ্ডিতকেও।

রোমাঞ্চিত দেহে, গদ্‌গদ কণ্ঠে, পণ্ডিত নিবেদন করেন, "আচার্য বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে কিছুক্ষণ শাস্ত্রীয় বিচার করবো ব'লে ভেবেছিলাম। কিন্তু এই মাত্র স্বচক্ষে দেখলাম, মাতৃসাধক ঠাকুর রামকৃষ্ণ আচার্যকে অশেষভাবে কৃপা করলেন। আমি উপলব্ধি করেছি, এই কৃপার বলে তিনি বিশেষভাবে বালীয়ান্ হয়ে উঠেছেন, তাই আজ আর আমি কোনো বিতর্কে জড়িত হতে চাইনে। তাছাড়া, আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠাকুরের মূল্যায়ন সম্পর্কে আমার এবং আচার্য বৈষ্ণবচরণের অভিমত একই প্রকারের। এ অবস্থায় বিতর্কসভা অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।"

অতঃপর উভয় পণ্ডিত সানন্দে শাস্ত্র ও সাধন প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা চালাইয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

গৌরী পণ্ডিত সেদিন কিন্তু ভয় পেয়ে বিতর্কে নিরস্ত হন নি। আসলে এ কয়দিন ঠাকুরের সঙ্গে থেকে, তাঁর প্রেমভক্তিময় পরিমণ্ডলে বাস ক'রে, নূতনতর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাঁর হয়েছে। তাছাড়া, নিজে তিনি উচ্চস্তরের তন্ত্রসিদ্ধ সাধক। সাধনোজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টি সহায়ে বুঝতে পেরেছেন, ঠাকুরের মাহাত্ম্য ও স্বরূপ। তাই তাঁর সম্পর্কে কোনো বাদানুবাদে আদৌ আর তাঁর ইচ্ছা বা আগ্রহ নেই।

কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন গৌরী পণ্ডিতের মন পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এটাকে (আঙুল দিয়ে নিজের দিকে দেখিয়ে) অবতার বলে। তা কি কখনো সম্ভব ? তোমার কি অভিমত, বলতো ?"

জোড়হস্তে, ভাবাপ্লুত কণ্ঠে, পণ্ডিত উত্তর দেন, "আপনি তার

চাইতেও বেশী। যাঁর অংশ থেকে অবতারদের উৎপত্তি, আপনি সেই পরম বস্তু।"

"ওরে বাবা, তুমি যে দেখ্‌ছি আবার সে পণ্ডিতকেও ছাড়িয়ে যাও," বালকের মতো খল্‌খল্‌ ক'রে হেসে ওঠেন রামকৃষ্ণ। "কিন্তু কেন এসব বলছো, বল দেখি? আমাতে কি দেখলে?"

গৌরী পণ্ডিত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে উত্তর দেন, "যা বলছি, তা ঠিকই বলছি। শাস্ত্রপ্রমাণ আর আমার নিজের প্রাণের উপলব্ধি থেকে বলছি। এর বিরুদ্ধে কেউ বলতে চাইলে, আমি বিতর্কের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।"

তেমনি বালকোচিত সারল্যের সঙ্গে বলেন ঠাকুর, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু, কে জানে বাপু, আমি তো কিছু জানিনে।"

গৌরী পণ্ডিত গম্ভীর স্বরে মাথা নেড়ে বলেন, "ঠিক কথা। শাস্ত্র তো ঐ কথাই বলেন, ব্রহ্ম বা মহাশক্তি সম্বন্ধে যিনি বলেন জানি না, তিনিই আসলে জানেন। আপনার সেই অবস্থা। যদি আপনি কৃপা ক'রে আপনার মাহাত্ম্য কাউকে জানান, তবেই সে বুঝতে পারে আপনার স্বরূপ।"

পরশমণি ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্পর্শগুণে গৌরী পণ্ডিত খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যার দর্প, বিচার-উদগ্র মন, সব কিছু যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পর কোথায় ভেসে চলে গেল।

পণ্ডিত বুঝলেন,—পাণ্ডিত্য, বাগাড়ম্বর ও প্রাণহীন পূজা অনুষ্ঠানে এতদিন বৃথা কালক্ষেপণ করেছেন। ঈশ্বর লাভ না করার ফলে জীবন তাঁর হয়েছে চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

কয়েক মাস ঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করার পর সত্যকার মুমুক্ষা জেগে ওঠে এই তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের অন্তরে। হঠাৎ একদিন ঠাকুরের কক্ষে এসে অশ্রুসজল চক্ষে চিরবিদায়ের অনুমতি চেয়ে বসেন গৌরী পণ্ডিত।

ঠাকুর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "সে কি পণ্ডিত, কোথায় যেতে চাচ্ছো তুমি?"

"চিরতরে সংসার ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি পরম বস্তু ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য। আপনি আমায় কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন। আমার অভীষ্ট যেন সিদ্ধ হয়।"

এর পর গৌরী পণ্ডিতকে কেউ আর কখনো সংসার-জীবনে দেখতে পায় নি। পরম প্রাপ্তির পথে কোথায় তিনি উধাও হয়ে চলে গিয়েছেন।

মাতৃভাবে ভাবিতা হয়ে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী প্রায় প্রত্যহ তাঁর বাল-গোপালরূপী তনয় রামকৃষ্ণকে খাওয়াতে আসতেন। তাঁর পরনে থাকতো নন্দরানী-যশোদার সাজ। ব্রজবাসিনীদের ভঙ্গীতে শাড়ী ও কাঁচুলি পরতেন, মাথায় থাক্‌তো বুটিদার রঙীন ওড়না। সঙ্গে এড়েদহ অঞ্চলের ভক্ত নারীবৃন্দ। তাদের প্রতি ঘর থেকে ক্ষীর ননী সর মেগে আনতেন ভৈরবী। পুলকাঞ্চিত দেহে,-ছলছল নয়নে, মাতৃহৃদয়ের স্নেহসুধাময় স্বরে আহ্বান করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে।

এই ভাবময়ী মাতৃমূর্তি দর্শনে ঠাকুরও হতেন আত্মবিস্মৃত, হারিয়ে ফেলতেন তাঁর বাহ্যজ্ঞান। ভৈরবীর কোলে এসে বসতেন, পরমানন্দে ভক্ষণ করতেন তাঁর জন্য আনীত খাদ্যসম্ভার।

হৃদয়কে সঙ্গে ক'রে ঠাকুরও এক একদিন ভৈরবীকে তাঁর আবাসে দেবমণ্ডলের ঘাটে গিয়ে দর্শন দিতেন। ভৈরবীর সেবিকা ও ভক্ত নারীদের মধ্যে আনন্দের বান ডেকে উঠতো।

ইতিমধ্যে তাঁর প্রিয় অধ্যাত্মতনয় রামকৃষ্ণের স্বরূপ কিছুটা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে তাঁর ভাবমূর্তিটি। পাগলাটে পূজারী ব্রাহ্মণ, ভাবুক কালী সাধক বলে যাঁরা এতদিন তাঁকে অবজ্ঞা করতেন, এখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তাঁকে সমীহ ক'রে চলতে শুরু করেছে।

মথুর এবং অন্যান্য যে গুটিকয়েক ভক্ত ঠাকুরের অনুরাগী হয়েও ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এতকাল তেমন বুঝে উঠতে পারেন নি, তাঁরাও এবার সোচ্চার হতে শুরু করেছেন।

ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীও যে সাধারণ সাধিকা নন, দীর্ঘদিনের সাধনা ও শাস্ত্র পারঙ্গমতার বলে উচ্চকোটির সাধক ও আচার্যদেরও যে তিনি পরাস্ত করতে পারেন, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির পরিমণ্ডলে এধারণাটি ক্রমে এবার বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে।

ক্ষেত্র প্রস্তুত। এবার ভৈরবী অবতীর্ণ হবেন তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্ম-শিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে। রামকৃষ্ণকে তন্ত্রক্রিয়ায় পারদর্শী ক'রে, তাঁর ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিরাট ভূমিকার সুদৃঢ় ভিত্তিটি গড়ে তুলতে তিনি এবার তৎপর হতে চান।

সেদিন পঞ্চবটীতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপবিষ্ট রয়েছেন, ধ্যান জপ সবে মাত্র শেষ হয়েছে। ভৈরবী তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন, গম্ভীর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "বাবা এবার সময় হয়েছে, তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় ক্রিয়াগুলো একে একে তোমায় আমি শেখাবো। দৈবাদেশে এজন্যই যে আমার এখানে আসা।"

ঠাকুর আগে থেকেই জানেন, মা জগদম্বারই ইচ্ছায় ভৈরবী দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সাক্ষাতের আগেই মা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এই সাধিকার কাছ থেকে সাধন সম্পর্কিত সাহায্য তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। এবার মা জগদম্বার কাছ থেকে আবার ঠাকুরকে জেনে নিতে হবে, তন্ত্রসাধনায় তিনি ব্রতী হবেন কিনা।

"মাকে আমি তোমার এ প্রস্তাবের কথা বলবো," প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন ঠাকুর।

"বলবে বই কি, বাবা। আমি জানি, মা এতে তোমায় অনুমতি দেবেন। জন্মান্তরের শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান নিয়ে তুমি জন্মেছ। এরই মধ্যে মায়ের কৃপায় হয়েছ বিপুল সাধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু বাবা, লোকগুরু হতে হলে তো শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সাধন চাই। শক্তি চাই। তান্ত্রিকী ক্রিয়ায় এবার তোমায় পারঙ্গম হতে হবে।"

মা জগদম্বার অনুমতি লাভে বিলম্ব হয় নি। এরপর দৈবপ্রেরিতা এই নূতন শিক্ষাগুরুর হস্তে কিছুকালের জন্য নিজেকে ঠাকুর সঁপে

দেন। তারপর তাঁর চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তীব্র একনিষ্ঠা ও দুর্বার গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে যান বীরাচারী সাধনার দুর্গম পথে।

বামাচারী ও দক্ষিণাচারী দুই রকমের তন্ত্রক্রিয়াতেই পারদর্শিনী ছিলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। অধ্যাত্মতনয় রামকৃষ্ণকে এবার সে সব তিনি শিক্ষা দেবেন, তাঁর সাধন ভিত্তিকে করবেন দৃঢ়ভাবে সংগঠিত। এখন থেকে এই শিক্ষাদানই হয়ে উঠলো তাঁর জীবনের ধ্যান জ্ঞান।

উত্তরকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বল্‌তে শোনা যেত, "বেদ পুরাণ কানে শুনতে হয়, আর তন্ত্রের সাধনগুলো কাজে করতে হয়, হাতে হাতে করতে হয়।"

অভিজ্ঞ সাধিকা ভৈরবীর উপদেশে এখন থেকে হাতে নাতে একের পর এক বিভিন্ন পর্যায়ের তন্ত্রোক্ত নিগূঢ় অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করতে থাকেন তিনি।

কর্মকুশলা ভৈরবীর এ সময়ে বিন্দুমাত্র অবসর নেই। ঠাকুরের কৌলক্রিয়ার কাজে মথুরের অর্থবল ও জনবল রয়েছে তাঁর ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। আরো রয়েছে তাঁর নিজস্ব প্রভাব ও কর্মদক্ষতা।

বীরাচারী সাধনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে কৌল সিদ্ধাসন। ভৈরবী যোগেশ্বরীর নির্দেশ ও তত্ত্বধানে, ক্ষিপ্রগতিতে, দুটি আসন নির্মাণ করা হলো। একটি দক্ষিণেশ্বর বাগানের উত্তর সীমার নিকটে বিল্ববৃক্ষের নিচে, অপরটি ঠাকুরের নিজের রচিত পঞ্চবটীতে।

যোগিনীতন্ত্রে (পঞ্চম পটল) কৌল সিদ্ধাসনের জন্য নর, মহিষ, মার্জার, শিবা, সর্প, সারমেয়, বৃষভ প্রভৃতির মুণ্ড প্রোথিত করার যে সব নির্দেশ আছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং নিষ্ঠা সহকারে পালন করা হলো।

এ প্রসঙ্গে সারদানন্দজী লিখেছেন, "সচরাচর পঞ্চমুণ্ড-সংযুক্ত একটি বেদিকা নির্মাণ করিয়া সাধকেরা তদ্‌আশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার দুইটি মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার

জীবের পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে ঠাকুর ঐ মুণ্ডসকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ পূর্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন।

"সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসনের প্রশস্ততার জন্য হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে একেবারে নির্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল অনুষ্ঠানের তথায় অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক, ঐরূপে দুইটি আসন নির্মিত হইয়াছিল। অথবা, বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাগ্নির জন্য তথায় সর্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধার জন্য দুইটি মুণ্ডাসন নির্মিত হইয়াছিল।"

পঞ্চমুণ্ডীর সংগ্রহকর্ম বড় সহজসাধ্য হয় নি। গঙ্গাহীন দূর অঞ্চল থেকে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে ভৈরবী এগুলো দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেছিলেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ, লতা ঔষধি ও রত্নাদির প্রয়োজন। এসবও রামকৃষ্ণের জন্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর শ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে। শুধু তাই নয়, ঠাকুরকে এসব দ্রব্যের প্রয়োগবিধি, হোমক্রিয়া এবং মন্ত্রচৈতন্যের কৌশল শিখিয়েছিলেন তিনি মাসের পর মাস পরম নিষ্ঠাভরে। উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ভৈরবী মাতার নির্দেশে অনুষ্ঠিত এ সব তন্ত্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।[১]

দিনের বেলায় দূর দূরান্ত থেকে প্রয়োজনীয় উপচারগুলো ভৈরবী সংগ্রহ করতেন। তারপর নিশাযোগে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে এসে ঠাকুরকে দিয়ে অনুষ্ঠান করাতেন মহাশক্তির আরাধনা, হোম ও নানা ধরনের নিগূঢ় তন্ত্রক্রিয়া। তারপর ঠাকুরকে নির্দেশ দিতেন পুরশ্চরণ অথবা নির্দিষ্ট জপ সাধন করার জন্য।

ঠাকুর বলেছেন, "কিন্তু জপ করা প্রায়ই আমার আর হয়ে উঠতো না। একবার মালা ফেরাতে না ফেরাতেই সমাধিতে ডুবে যেতুম, আর ঐ সব ক্রিয়ার ফল একের পর এক প্রত্যক্ষ করতুম।

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (সাধক ভাব)

এসময়ে সূক্ষ্মলোকের কত কিছু যে প্রত্যক্ষ করেছি, কত অপূর্ব অপূর্ব দর্শন যে হয়েছে, তা আর কি বলবো ?"

আরো তিনি বলেছেন, "প্রধান প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রে[২] যত কিছু সাধনের কথা আছে বামনী সবগুলো একে একে আমায় দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়েছিল। কঠিন কঠিন সব সাধন! যা করতে গিয়ে বেশীর ভাগ সাধক পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু মা'র কৃপায় সে সব পেরিয়ে গেছি।"

বামাচারী ক্রিয়াকলাপগুলি ভৈরবী পরম যত্নভরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিয়ে অনুষ্ঠান করান। পঞ্চ ম-কারের সমস্ত উপচারই ঠাকুরের সম্মুখে তিনি উপস্থিত করেছেন, কিন্তু স্বভাবত দিব্যভাবে সমারূঢ় ঠাকুর এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছেন কখনো আবিষ্টভাবে, কখনো বা নামমাত্র স্পর্শ বা আস্বাদনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, এর ফলে প্রতিটি অনুষ্ঠানের পরে তাঁর সারা সত্তায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে কৌল সাধনার বহু বিচিত্র ঐশ্বর্য ও ভাবতরঙ্গ।

ভৈরবী ঠাকুরের জিহ্বায় কারণবারি স্পর্শ করা মাত্র, ঠাকুর দিব্য চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। এক একদিন ভৈরব বেশে তাঁকে উত্তাল হয়ে উঠতে দেখা যেত। ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন তাঁর এসময়কার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন :

বিভীষিকা মন্ত্রব্রত শুনে ভয় পায়।
চিতাধূম-পানে কভু মত্ত প্রভুরায়॥
ছুটিতেন চারিদিকে ধূমের লাগিয়ে।
চিতাধূম লক্ষ্য করি মুখ ব্যাদানিয়ে॥
কখন ত্রিশূল হস্তে করিয়া ধারণ।
গঙ্গার কূলেতে হয় গম্ভীরে চলন॥

২ 'চৌষট্টিখানা তন্ত্র' একথাটি শুনতে স্বামী সারদানন্দ হয়তো ভুল করেছেন। কারণ, বিশিষ্ট তন্ত্রসাধক ও তন্ত্রগবেষকদের মতে, এ যুগে প্রচলিত রয়েছে শুধু ষোলটি তন্ত্র।

কখন কোমরে নারে ধরিতে বসন।
চাদর থাকিত মাত্র গাত্র আবরণ॥
বাহুহীন হইলে চাদর যায় প'ড়ে।
ব্রাহ্মণী যতনে দেয় শ্রীঅঙ্গেতে বেড়ে॥
অপর উদ্দেশ্য নহে গাত্র-আবরণ।
শ্রীঅঙ্গে বাহির হয় চাঁদের কিরণ॥
পাছে কেহ লোকে দেখে এই অনুমানি।
চাদরে ঢাকিয়া অঙ্গ রাখেন ব্রাহ্মণী॥

(শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি)

ভৈরবীর সহায়তায় তন্ত্রসাধনে ব্রতী হয়ে এসময়ে প্রচুর দর্শনাদি ঠাকুরের ঘটতে থাকে। উত্তরকালে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছে এর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

কখনো তিনি দর্শন করতেন, অসংখ্য কালীমূর্তি সারা বিশ্বে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, মহাকাশে বা সারা সৃষ্টিতে তাদের যেন আর স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

দ্বিভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা কত দেবীমূর্তিই না তাঁর নয়ন সমক্ষে ভাস্বর হয়ে উঠতো। এক একদিন মায়ের ষোড়শী ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তির দিব্য ঔজ্জ্বল্য নয়ন ধাঁধিয়ে দিত। আর আশেপাশে সদাই চোখে পড়তো ত্রিশূলপাণি রক্তচন্দনচর্চিত ভৈরবের দল।

কোনো কোনো দিন দর্শন হতো ত্রিকোণ-আকারা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মযোনির। জগৎকারণ আদ্যাশক্তি এই মা-ই হচ্ছেন সৃষ্টির জননী —পলে পলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তিনি প্রসব ক'রে চলেছেন। এ সৃষ্টি প্রবাহের আদি নেই, অন্ত নেই, বিরতি নেই।

কখনো বা অনাহত ধ্বনি, প্রণব ধ্বনিতে ওতপ্রোত মনে হতো জগৎ প্রপঞ্চ, ঠাকুরের সারা সত্তা নিমজ্জিত হয়ে যেতো এই ধ্বনির মহাগুঞ্জনে।

এসময়ে চক্রে চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি প্রত্যক্ষ করেন রামকৃষ্ণ, তাঁর অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে জেগে ওঠে মহাশক্তির দিব্য

আবির্ভাব। কুলাগারে মা জগদম্বার দিব্য অধিষ্ঠান দর্শন ক'রে ভৈরবীর বীরাচারী সাধক-শিষ্য হন কৃতকৃতার্থ।

বীরাচারী তন্ত্র সাধনার দুঃসাধ্য পর্যায়ে এবার রামকৃষ্ণকে ঠেলে দেন ভৈরবী যোগেশ্বরী। এ সময়ে কোনো নারীকে গ্রহণ করতে হয় শক্তিরূপে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শুদ্ধসত্ত্ব, অপাপবিদ্ধ সাধক। নারী মাত্রেই বিশ্ব-জননীর অংশ এই সংস্কারটি তাঁর সহজাত। তাই বীরাচারী সাধনার শক্তি-সমন্বিত নিগূঢ় অনুষ্ঠানসমূহের কঠোর পরীক্ষায় অনায়াসে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন।

এই পর্যায়ের সাধনার তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত জীবনীকার অক্ষয় সেন জানিয়েছেন যে, বীরাচারী তান্ত্রিকেরা 'শক্তি' গ্রহণ ক'রে মন্ত্রঃপুটিত অভিচার ও মৈথুনাদি যে সব ক্রিয়া ক'রে থাকেন ঠাকুরকে তা করতে হয় নি। ঠাকুরের কাছ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনে নিয়ে তিনি লিখেছেন,—
'ধরিলেন মাছ প্রভু না ছুঁইয়া জল।'

বামাচারী এবং বীরভাবের সাধনায় ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ব্রতী করালেও অভিজ্ঞা কৌল সাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরীর জানা ছিল—ঠাকুর আসলে অতিমাত্রায় সত্ত্বগুণী এবং দিব্যাচারী শক্তিসাধক। তাই এই সাধনার স্থূল অঙ্গগুলো তাঁকে দিয়ে অনুষ্ঠান না করিয়ে, সবগুলো শুধু ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নিয়ে গিয়েছেন তিনি।

সেদিন গভীর নিশায় বাগানের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ঠাকুর উপবিষ্ট রয়েছেন। এমন সময়ে ভৈরবী সেখানে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত। মেয়েটি সুন্দরী, সুলক্ষণা এবং পূর্ণ যৌবনা।

ঝুলি থেকে একরাশ পূজা-উপচার বার ক'রে বেদীর সম্মুখে ভৈরবী সাজিয়ে দিলেন। সঙ্গিনী যুবতীকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "বাবা, দেবী জ্ঞান ক'রে, তন্ত্রশাস্ত্রের বিধি অনুসারে, একে তুমি পূজো করো।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ঠাকুর ভক্তিভরে শুরু ক'রে দেন তাঁর অর্চনা। অর্চনা সমাপ্ত হলে ভৈরবী ঐ যুবতীর অঙ্গ থেকে বস্ত্র উন্মোচন ক'রে

ফেলেন, ঠাকুরকে বলেন, "বাবা, এবার এ উলঙ্গা নারীর কোলে বসে তোমায় জপ করতে হবে, সে জপে সিদ্ধ হতে হবে।"

ভীত সংকুচিত হয়ে পড়েন ঠাকুর। করুণ স্বরে বার বার ইষ্টদেবী জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানান, "মা, বিদ্যে বুদ্ধি সাধন ভজন কিছুই আমার নেই। একান্তভাবে তোর চরণে শরণ নিয়ে আছি। ভৈরবীর মুখ দিয়ে এ কী আদেশ আজ আমায় দিচ্ছিস? দুর্বল সন্তানকে নিয়ে এ কী কঠিন পরীক্ষা তোর?"

এ আকুল আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপুল শক্তির স্রোত নেমে এল ঠাকুরের দেহে মনে। ভৈরবীর নির্দেশমতো উঠে বসলেন ঐ উলঙ্গা নারীর অঙ্কে। তারপরই নিমজ্জিত হয়ে গেলেন প্রগাঢ় ধ্যানের গভীরে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, ভৈরবী তাঁর চোখে মুখে গঙ্গাবারি সিঞ্চন করছেন। পাখা দিয়ে ব্যজন ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুলছেন।

ভৈরবীর চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা। বললেন, "তোমার ক্রিয়া পূর্ণ হয়েছে, বাবা। অন্য সাধকেরা এ অবস্থায় অল্প কিছুকাল জপ ক'রেই ক্ষান্ত হয়। আর তুমি তো একেবারে দেহবোধশূন্য হয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলে।"

জগজ্জননীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অন্তর। সজলচক্ষে তাঁর চরণে প্রণতি জানাতে থাকেন বার বার।

আর একদিন শবের খর্পরে মৎস্য রান্না ক'রে নিয়ে এসেছেন ভৈরবী। প্রথমে পঞ্চবটীতে বসে ঐ মৎস্য-ব্যঞ্জন মা জগদম্বাকে তিনি নিবেদন করেন। তারপর ঠাকুরকে বলেন, "নাও বাবা, এবার মায়ের এ প্রসাদ তুমি গ্রহণ করো।"

মা-মা রবে পঞ্চবটী প্রকম্পিত ক'রে ঠাকুর অবলীলায় এ প্রসাদ মুখে দিলেন, তারপর বসে গেলেন সেদিনকার নির্দিষ্ট জপ ধ্যান ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানে।

আর একদিন ভৈরবী ঠাকুরের সামনে তুলে ধরলেন গলিত মনুষ্য-মাংসের পাত্র।

শেষটায় নরমাংস প্রসাদ ভোজন করতে হবে? অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েন রামকৃষ্ণ। সংস্কারজাত ঘৃণায় সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠেছে, তীব্র দুর্গন্ধে যে বমনের উদ্রেক হতে চায়!

"এ কি কখনো করা যায়।" ভীত, আড়ষ্ট স্বরে বলে ওঠেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ।

"এ মহামাংস গ্রহণও যে এ সাধনার এক বড় অঙ্গ। ঘৃণা করতে নেই, বাবা। তাছাড়া, এত কিছুই করলে, এটা আর বাকী থাকে কেন?" ব'লে ভৈরবী যোগেশ্বরী নিজে পথ দেখান ঠাকুরকে। পাত্র থেকে কিছুটা গলিত মনুষ্য মাংস তুলে স্বচ্ছন্দে নিজের মুখ বিবরে নিক্ষেপ করেন।

এ ঘোর সংকটে জগজ্জননীকে ডাকৃতে গিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছেন ঠাকুর। অকস্মাৎ দেখা যায় তাঁর অদ্ভুত রূপান্তর। চামুণ্ডা দেবীর ভয়ঙ্করী ভাবে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন তিনি। চোখে মুখে ফুটে ওঠে অপূর্ব দৃঢ়তা। মুখে মা-মা বজ্রগম্ভীর ধ্বনি। এই সময়ে ভৈরবী স্মিত হাস্যে অবশিষ্ট মাংস ঢুকিয়ে দেন ঠাকুরের মুখে, সমাপ্ত করেন সেদিনকার নির্দিষ্ট সাধন সূচী।

আর একদিন ভৈরবী তাঁর শিষ্য রামকৃষ্ণের জন্য একটি বিশেষ ধরনের ক্রিয়ার আয়োজন করেন। ভক্তপ্রবর অক্ষয়কুমার সেন তাঁর পুঁথিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন:

আর দিন আনি কোন প্রণয়ী-যুগলে।
একত্রে সঙ্গ যবে প্রভুদেবে বলে॥
দিব্যজ্ঞানে বাবা তুমি কর নিরীক্ষণ।
জপ কর চঞ্চল না হয় যেন মন॥
সম্ভোগে সুসংযতাবস্থা নরনারী দুয়ে।
পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব দিল দেখাইয়ে॥

শিবশক্তি মিলিত প্রধানা যার নাম।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির ধাম॥
বাহ্যহারা সমাধিস্থ প্রভু গুণমণি।
পরে বাহ্য প্রাপ্তে তাঁকে কহিল ব্রাহ্মণী॥—
বলিতে না পারি আজ কি আনন্দ মনে।
দেখিয়া তোমায় সিদ্ধ আনন্দ আসনে॥

মাতৃরূপিণী, গুরুরূপিণী ভৈরবী যোগেশ্বরীর আনন্দের আর অবধি নেই। দৈবাদিষ্ট কর্ম তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। তন্ত্রোক্ত সাধনায় তরুণ সাধক রামকৃষ্ণকে সিদ্ধি অর্জন করিয়ে দিয়ে তিনি এখন পরম পরিতৃপ্ত।

স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বললেন, "বাবা, আমার মনের সংকল্প এবার পূর্ণ হয়েছে। আনন্দাসনে তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছো। এ মতের এই শেষ সাধন।"

এ সাধনার একটি অবশ্যকরণীয় বহিরঙ্গ দিক আছে। সেটিও ঠাকুর রামকৃষ্ণ অল্প কিছুকাল পরে সুসম্পন্ন করেন। উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ ভক্তদের তিনি বলেছিলেন, "এবার অপর এক তন্ত্রসাধিকা ভৈরবীকে পাঁচ সিকে দক্ষিণা দিয়ে প্রসন্ন ক'রে, তাঁর সহায়ে তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী কুলাগার পূজো করেছিলেম। বীরভাব সাধনায় এটা শেষ পর্যায়। দেবীর এ পূজো করা হয়েছিল কালীঘরের নাটমন্দিরে, সকলের সামনে বসে।"

ঠাকুর এ-প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন, "এতদিন ধরে ভৈরবী আমায় তন্ত্রসাধনা করিয়েছিল, কিন্তু কোনো সময়েই মায়ের কৃপায় রমণীর প্রতি মাতৃভাব থেকে আমি টলে যাই নি। অনেক চেষ্টা করেও কারণবারি পান করতে পারি নি। কারণের নাম শুনলে বা গন্ধ পেলেই জগৎকারণের উপলব্ধি এসে যেতো, আত্মহারা হয়ে পড়তুম। তেমনি 'যোনি' শব্দ শোনামাত্র জগৎ-যোনির উদ্দীপনা হতো, সমাধিস্থ হয়ে পড়তাম[১]।"

১ লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ।

সাধন পথে ভৈরবী যোগেশ্বরী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংযোগ মণি-কাঞ্চন সংযোগ।

বিধির বিধান মেনে নিয়ে বিবাহ করলেও ঠাকুর ছিলেন আজন্ম ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ। তাছাড়া, জাগতিক অন্য কোনো সুখ সম্ভোগের জন্যও কোনোদিন ছিল না তাঁর বিন্দুমাত্র স্পৃহা। ত্যাগ বৈরাগ্য অনাসক্তির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি।

আর তাঁর তান্ত্রিক সাধনপথের গুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী ছিলেন বামাচারী ও দক্ষিণাচারী উভয় তন্ত্রে সুদক্ষা।[১] সর্বোপরি কথা, তরুণ সাধক রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের অধ্যাত্ম-তনয়-রূপে। তন্ত্রসাধনার প্রতিটি পদক্ষেপে ভৈরবী তাঁকে চালনা করেছেন অসামান্য নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে। এমন কর্মতৎপরা গুরু না পেলে আপন-ভোলা সাধক রামকৃষ্ণের পক্ষে অজস্র উপচার ও ক্রিয়া সমন্বিত তন্ত্র-সাধনা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

সত্ত্বগুণ-প্রধান সাধক হলেও ভবিষ্যৎ-লোকগুরু রামকৃষ্ণকে বামাচারী তন্ত্রসাধনা সংক্ষিপ্তভাবে এবং স্পর্শ বাঁচিয়ে উদ্‌যাপন করার প্রয়োজন ছিল। আবার শিক্ষাগুরু ভৈরবীকেও রামকৃষ্ণ গোড়া থেকেই তাঁর নিজের সাত্ত্বিক সংস্কার অনুযায়ী কিছুটা রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছিলেন।

এ-প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য মূল্যবান। তিনি লিখেছেন :

"ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষত, শ্রীমূর্তি সকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ অনুভব করিতে-ছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণীর বালক বলিয়া এককালে

---

১ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তন্ত্রসাধনার চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ক্রিয়া, শব সাধন ; এ ক্রিয়াটি ভৈরবী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিয়ে অনুষ্ঠান করান নি। ভৈরবী নিজে ইহা পরিজ্ঞাত ছিলেন কিনা, তারও কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই।

উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাঁহার হস্তে আহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়।

"হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে কখন কখন ব্রজ-গোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুর-রসাত্মক সঙ্গীত সকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, ঐভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং ঐভাব সংবরণপূর্বক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। উক্ত ঘটনা অবশ্য ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে বিন্দুমাত্র কোনোকালে ছিল না, একথা উহা হইতে বুঝিতে পারা যায়।"

তন্ত্রসাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরীর শিষ্য সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায় নি। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে আরো দুটি কৃতী শিষ্যকে যে তিনি তৈরি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন সে তথ্য তাঁর নিজের বিবৃতি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এই দুটি শিষ্যের নাম—চন্দ্র এবং গিরিজা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম দিনকার আলাপেই ভৈরবী বলেন, "বাবা, তিনজনকে সাধনায় সাহায্য করার জন্য দৈবাদেশ আমি পেয়েছিলাম। তাদের দুজনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ইতিমধ্যে হয়েছে। এবার তোমার দেখাও পেলাম।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের সময় ভৈরবী কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের কাছে চন্দ্র এবং গিরিজার সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলতেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা করিয়ে দেবেন, এ আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন।

ভৈরবীর আগ্রহে চন্দ্র এবং গিরিজা উভয়েই দক্ষিণেশ্বরে

এসে উপস্থিত হন। ঠাকুর ও এঁদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এঁদের সাধনার উৎকর্ষ সম্পর্কে ঠাকুরের মূল্যায়ন আমরা জানতে পারি স্বামী সারদানন্দের প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে। তিনি লিখেছেন, "ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দু'জনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।"

চন্দ্র স্বভাবত ছিলের ভাবুক ধরনের মানুষ। ঈশ্বর প্রেমের উচ্ছ্বাসে সদা ভরপুর থাকতেন। ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সাক্ষাৎ ও আনুকূল্য পেয়ে তন্ত্র ও দ্রব্যগুণের সিদ্ধাইয়ে তাঁকে সিদ্ধহস্ত হতে দেখা গিয়েছিল।

গুটিকা-সিদ্ধি নামক এক বিশেষ তান্ত্রিক শক্তি তিনি আহরণ করেন। মন্ত্রপুটিত এই গুটিকার অলৌকিকী ক্রিয়া ছিল অত্যাশ্চর্য। এটি অঙ্গে ধারণ ক'রে চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যেতেন এবং এই অবস্থায় যে কোনো দূর দুর্গম স্থানে উপনীত হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হতো না।

শক্তি লাভের ক্রমিক স্তরগুলো অতিক্রম ক'রে তান্ত্রিক সাধক শক্তির দিকে, আদ্যাশক্তি মহেশ্বরীর দিকে ধাবমান হন এবং শেষ পর্যায়ে সেই পরমা সত্তার ভেতর নির্বাণ লাভ করেন। কিন্তু এই সাধন-অভিযাত্রায় সিদ্ধাই বা শক্তিলাভের কালে, শক্তির অপচয় ও ব্যভিচারের ফলে, বহু দুর্ভাগার জীবন হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ভৈরবী-শিষ্য চন্দ্র ছিলেন এমনি এক দুর্ভাগা সাধক।

গুটিকাসিদ্ধি লাভের পর চন্দ্রের ভাবালু হৃদয় বিশেষ ক'রে দেহ-সুখের দিকে, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অল্পদিনের মধ্যে এক ধনী ব্যক্তির রূপসী কন্যার প্রতি তাঁকে আসক্ত হতে দেখা যায়। তান্ত্রিক সিদ্ধাইর সাহায্যে এই তরুণীর গৃহে বার বার তিনি যাতায়াত করতে থাকেন, ভোগ লালসা বেড়ে উঠতে থাকে দিনের পর দিন।

অবশেষে চন্দ্র তাঁর সাধনজাত সিদ্ধাই হারিয়ে ফেলেন এবং একদিনকার প্রণয় অভিসারের সময় হাতেনাতে তিনি ধরা পড়ে যান, নিগৃহীত হন অশেষভাবে।

ভৈরবীর আগ্রহে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে চন্দ্রের দেখা হয়, এবং অল্প কিছুদিন তাঁহার সান্নিধ্যে এসে তিনি বাসও করেন। এসময়ে ঠাকুর তাঁকে তাঁর সিদ্ধাইর অপব্যবহার সম্পর্কে এবং তার বিষময় কুফল সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু চন্দ্র তাতে কর্ণপাত করেছিলেন বলে মনে হয় না। তাঁর নিজের উগ্র অহংবোধ ও কামকাঞ্চনের উগ্র বাসনা অনিবার্যভাবে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে বিভ্রান্তি ও বিষময় পরিণতির দিকে।

উত্তরকালে সাধন-জীবনে ব্যর্থ ও ভগ্নমনোরথ চন্দ্র বেলুড়মঠে এসে রামকৃষ্ণ শিষ্যদের সান্নিধ্যে কিছুদিন বাস করেছিলেন। বিষাদ-খিন্ন, অনুতপ্ত হৃদয়ে খুঁজেছিলেন তিনি পরম শান্তির পথ। লীলা-প্রসঙ্গে এর বর্ণনা আমরা পাই :

"১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাধিক কাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্বদা মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইতে দেখিয়াছি।

"শুনিয়াছি তিনি স্বামীজীকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন,—আপনি কি এখানে কিছু টের পান?—অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রতসত্তা কিছু অনুভব করেন?—ইত্যাদি।

"তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কথাই সত্য ঘটিয়াছে। কেবল, মৃত্যুর পূর্বে, তাঁহাকে দর্শন দিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও বাকী আছে।"

"লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি

ভক্তির সহিত জপধ্যান করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুও পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইঁহাকে অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা একস্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক সময়ে একজন ইঁহাকে উপহাস ছলে জিজ্ঞাসা করেন—মহাশয়ের কি আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে? উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন—আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে ঐরূপ কথা বলিতেছেন?"

একদা তন্ত্রসিদ্ধাইযুক্ত, প্রতাপান্বিত সাধক চন্দ্রের জীবনে এসময়ে এসেছে অনুশোচনা, আত্মসমর্পণ ও অহংবোধ বর্জনের প্রস্তুতি। তাই বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও সহজ অনাড়ম্বর ত্যাগ তিতিক্ষাময় চলার পথটি একান্তভাবে তিনি বেছে নিয়েছেন।

এঁর সম্পর্কে আরো জানিয়েছেন সারদানন্দজী: "ঠাকুর ঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তিকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি এবং উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি পরিধেয় ধুতি, গামছা ও বোধহয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর ও সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'দেশের জমিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।' কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্র সম্ভবত তিনিই হইবেন।"

ভৈরবীর অপর শিষ্য গিরিজার নানা কাহিনী উত্তরকালে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে শোনা যেত।

গোড়ার দিকে নূতন শিষ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ভৈরবী গিরিজাকে দক্ষিণেশ্বরে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু গিরিজা তখন সেখানে এসেছিলেন তা মনে হয় না। এসেছিলেন তিনি ভৈরবীর ঠাকুরের সঙ্গ ত্যাগ করার পর।

ঠাকুরের অমায়িকতা, দিব্যোজ্জ্বল মূর্তি ও মন্দিরের পরিবেশ দেখে গিরিজা অত্যন্ত খুশী। কিছুদিন তাঁর কাছে এসময়ে তিনি অবস্থান করতে থাকেন।

গিরিজার তৎকালীন একটি অলৌকিক সিদ্ধাই প্রত্যক্ষ ক'রে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির অদূরেই ছিল কলকাতার সিঁদুরেপটির ধনী ব্যক্তি শম্ভু মল্লিকের বাগান। মল্লিক মশাই এবং তাঁর পত্নীকে সবাই জানতো ঠাকুরের পরম ভক্ত বলে। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কাছে বলতেন, 'শম্ভু মল্লিক ছিল আমার দ্বিতীয় রসদ্‌দার'। মথুর বিশ্বাসের মৃত্যুর পরবর্তীকালে এই ধনী ভক্তটি ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান দিতেন, তাঁর জন্য অর্থব্যয় করতেন।

মন্দির সংলগ্ন কিছুটা জমি খাজনায় বিলি ক'রে নিয়ে শম্ভু ঠাকুরের পত্নী সারদাদেবীর বসবাসের জন্য একটি ঘর তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন এবং সারদাদেবী সেখানে কিছুদিন বাসও করেছিলেন। শম্ভু মল্লিকের স্ত্রীও মা সারদামণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, প্রতি জয়মঙ্গল ব্রতের সময় দেবীজ্ঞানে মায়ের চরণ পূজা করতেন।

মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ভৈরবীর শিষ্য গিরিজাকে নিয়ে সেদিন বেড়াতে গিয়েছেন। শম্ভু মল্লিক তো মহা খুশী, সাদরে দু'জনকে নিজের বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। ঠাকুর যেখানেই যান সেখানেই ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নিয়ে দিব্য আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। সেদিনও তার ব্যতয় হলো না।

কথায় কথায় হাসি আনন্দে রাত গভীর হয়ে ওঠে। সঙ্গী

গিরিজাকে নিয়ে ঠাকুর রওনা হন কালী মন্দিরের হাতার দিকে।

একে জঙ্গলাবৃত পথ, তার ওপরে রাত্রির ঘন অন্ধকার। গিরিজার হাত ধরে সন্তর্পণে কিছুটা এগিয়ে আসার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণ খেদের সুরে বলেন, "তাই তো, এবার যে পথ চলা দায়। তাড়াহুড়ো ক'রে বেরোবার সময় একথা ভাবি নি। শম্ভুর কাছ থেকে একটা লণ্ঠন নিয়ে এলে ভালো হতো।"

গিরিজা বুঝলেন, অন্ধকারে ঠাকুরের বড় কষ্ট হচ্ছে। বললেন, "দাদা, একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়াও, এক্ষুনি আলো জ্বেলে আমি তোমায় পথ দেখাচ্ছি।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে গিরিজা প্রদর্শন করলেন এক অদ্ভুত সিদ্ধাই। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে কি একটা মন্ত্র তিনি আওড়ালেন, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে একটা জ্যোতির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, দুর্গম রাস্তাটি হয়ে উঠেছে আলোকিত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, "সে ছটায় কালীবাড়ীর ফটক অবধি সবটা জায়গা চমৎকারভাবে দেখা যাচ্ছিল। আমিও আলোয় আলোয় চলে এলাম আমার ঘরে।"

এ-প্রসঙ্গে ঠাকুর সহাস্যে তাঁর তরুণ ভক্তদের এ কথাটিও জানিয়ে দেন, "গিরিজা আর চন্দ্রের ঐ অদ্ভুত সিদ্ধাইর ক্ষমতা কিন্তু আর বেশীদিন রইলো না।"

তারপর নিজের দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তিনি বলেন, "এখানকার সাথে কিছুদিন ওরা বাস করেছিল, তাই ওসব সিদ্ধাই চলে গেল।"

তরুণ ভক্ত শ্রোতারা সবাই নীরবে বসে ঠাকুরের এ কাহিনী শুনছেন। এ সম্পর্কে নানা কথা তাঁদের মনে উদয় হচ্ছে।

জিজ্ঞাসু হয়ে একজন বলে ওঠেন, "এটা কেন হলো, তাতো বুঝে উঠতে পারছিনে।"

প্রশান্ত কণ্ঠে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উত্তর দেন, "মা এ খোলটার ভেতরে

(তাঁর নিজ দেহের) তাদের কল্যাণের জন্য ওসব সিদ্ধাই আকর্ষণ ক'রে নিলেন। আর এটা ঘটবার পর, তাদের মন আবার ওসব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।"

প্রথম দুটি শিষ্য, চন্দ্র ও গিরিজার সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মিলন ঘটানোর জন্য গোড়া থেকেই ভৈরবী ব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি কি জানতেন যে, তাঁরা তাঁদের তন্ত্র সিদ্ধাইর অপব্যবহার করবেন? সেজন্যই কি শুদ্ধসত্ত্ব, দিব্যভাবসম্পন্ন মহাসাধক রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে থাকার জন্য তিনি তাঁদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রয়াস পেয়েছিলেন উন্নততর সাধনস্তরে তাঁদের স্থাপন করতে?

ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর শিষ্যদের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর দৃষ্টিতে সর্বোত্তম। সৎ-সংস্কারযুক্ত ও শুদ্ধসত্ত্ব সাধকরূপে রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, আর ভবিষ্যৎ লোকগুরুর ভূমিকা গ্রহণের জন্যও তিনি ঈশ্বর কর্তৃক চিহ্নিত—এ প্রত্যয় ভৈরবীর ছিল। তাই সারা মনপ্রাণ দিয়ে, সর্বশক্তি দিয়ে, এই তরুণ শিষ্যের আধ্যাত্মিক জীবনকে তিনি দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল এই অধ্যাত্মতনয়ের সান্নিধ্যে তিনি বাস করেছেন, তাঁর দিকে সতত নিবদ্ধ রেখেছেন নিজের কল্যাণময় দৃষ্টি। স্বামী সারদানন্দের লেখায় একাধারে গুরুরূপিণী, মাতৃরূপিণী, এই ভৈরবীর প্রশস্তি আমরা দেখতে পাই :

"ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃজ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে তাঁর হৃদয়নিহিত কোমল কঠোর মাতৃস্নেহকে সর্বদা উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিত এবং ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র সুখী করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, ও সাধনায় সহায়তা করিতে তাঁহাকে সর্বদা নিয়োজিত করিত, একথা বলা বাহুল্য।"

"বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপবিষ্ট হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃ উদয় হয়।

আধ্যাত্মিক জগতে, বর্তমানকালে ঠাকুরের ন্যায় উত্তম অধিকারী যে জন্মিতে পারে, ব্রাহ্মণী একথা পূর্বে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম পুত্রবাৎসল্য। অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্যার সমগ্র ফল স্বল্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছু নাই।"

তন্ত্রসাধনার শেষে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনে জেগে ওঠে অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার কথা। তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের যে অভীষ্ট পূরণের ব্যবস্থা আগে থেকেই জগজ্জননী ক'রে রাখেন, এবারও তার ব্যতয় হলো না।

জটাধারী নামে এক রামাইৎ সাধু এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। তাঁর কাছে রয়েছেন বাল-শ্রীরামের এক নয়নমন-লোভন শ্রীবিগ্রহ। এই বিগ্রহটিকে সাধু আদর ক'রে ডাকেন রামলালা বলে, প্রায় সব সময়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন, অপার নিষ্ঠা নিয়ে করেন তাঁর সেবাপূজা।

এই রামলালা যেমনি জাগ্রত, তেমনি লীলাচঞ্চল। ধাতু বিগ্রহের এই ভাবময় সূক্ষ্ম মূর্তিটি ঠাকুরের দিব্য দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গিয়েছে। দেখছেন, জটাধরী প্রেমভরে তাঁর প্রিয় শ্রীবিগ্রহকে কত রসালো ফল মিষ্টি নিবেদন করছে, আর দিব্যদেহী রামলালা তাঁর সঙ্গে শুরু ক'রে দিয়েছে কত রকমের বায়না আদর আর রসরঙ্গ।

রামলালার এই সেবাপূজা ও দিব্যলীলা দর্শন করতে থাকেন ঠাকুর দিনের পর দিন। তারপর হঠাৎ একদিন দেখেন, রামলালা তাঁরই প্রেমে মশগুল হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের পিছে পিছে সে ঘুরে বেড়ায়, স্নানের সময় দৌড়ঝাঁপ ফষ্টিনাষ্টি করে, আবার ভোজনের সময় শুরু হয় তার অসংখ্য উপদ্রব।

ঠাকুরের ইচ্ছে জাগে, জটাধারীর কাছ থেকে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কিছুদিন বালশ্রীরামের আরাধনা করবেন। এই নূতন সাধন বিষয়ে মা ভবতারিণীর নির্দেশ অচিরেই পেয়ে গেলেন। শিক্ষাগুরু ভৈরবীর সম্মতি পেতেও বিলম্ব হলো না। তিনি বললেন, "বাবা, তোমার কুলদেবতা হচ্ছেন শ্রীশ্রীরঘুবীর। তাঁর শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা সম্পন্ন করার জন্য ছোটবেলাতেই তো তুমি রামমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছো। এবার জটাধারীর কাছে নূতন ক'রে দীক্ষা নিয়ে বালশ্রীরামের লীলারস সম্ভোগ করো, এতো খুব ভালো কথা। লোকগুরু হতে হলে সব রস, সব ভাবের সঙ্গেই তো পরিচয় থাকা দরকার।"

বাৎসল্য রসের এই সাধনায় অচিরে ডুবে গেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ধাতুবিগ্রহের আধার থেকে বেরিয়ে এসে রামলালা এখন দিব্য দেহ নিয়ে সদাই তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। আদর আবদার, মান অভিমানের ভেতর দিয়ে অবিরল ধারায় বয়ে চলে নানা রঙ্গ আর স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহ।

পদ্মপলাশের মতো ডাগর দুটি চোখ মেলে রামলালা ঠাকুরের দিকে তাকায় আর হেসে কুটিপাটি হয়। আবার শাসন করলে, চড়-চাপড় খেলে রক্তিম ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে অভিমান করে।

একদিন রামলালা খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছে, তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে রামকৃষ্ণ তাকে ভোলাবার জন্য ধানযুক্ত খইয়ের কয়েকটা দানা তাঁর মুখে পুরে দেন। চিবুতে গিয়ে ধানের তীক্ষ্ণ তুষ লাগে তার নরম জিবে, সঙ্গে সঙ্গে তা চিরে যায়। তখন বালক রামলালার কি কান্না!

বাৎসল্য রসে রসায়িত ঠাকুরের মনেও জেগে উঠলো নিদারুণ দুঃখ। দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে, আর বার বার তিনি খেদোক্তি করছেন,—হায়রে, মা কৌশল্যা যাকে নয়নের মণি বলে জ্ঞান করতেন, সযত্নে কোলে ক'রে যাকে ক্ষীর, ননী, সর খাওয়াতেন অতি সন্তর্পণে তার মুখে এই তুষযুক্ত খই পুরে দিতে আমার একটুও বাধলো না। কি নিষ্ঠুর, কি হতভাগা আমি।

এই দিনকার দুঃখময় স্মৃতি উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে কখনো জেগে উঠলে দেখা যেতো, ঠাকুর কেঁদে আকুল হতেন, আর ভক্তেরা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে।

ঠাকুর ও রামলালার প্রেমরঙ্গ ক্রমে আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে, শ্রীবিগ্রহের জ্যোতিঃঘন মূর্তি আর যেন ঠাকুরকে ছেড়ে যেতেই চায় না।

শেষটায় সাধু জটাধারী একদিন এসে অশ্রু ছলছল চোখে বলেন, "রামলালা বড় কৃপাময়, আজ আমার প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে জ্যোতির্ময় দর্শন দিয়েছেন। আরো বলেছেন, এখন থেকে তোমার এখানেই থাক্‌বেন, কিছুতেই তোমার কাছছাড়া হতে চান না। রামলালার আনন্দেই আমার আনন্দ। বেশ তো, তাঁর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক, যেখানে থেকে সুখী হবেন, সেখানেই থাকুন। এজন্য আজ কিন্তু মনে এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না।"

রামলালার এই ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছেই রয়ে গেলেন, সাধু জটাধারী অতঃপর বেরিয়ে পড়লেন তাঁর পরিব্রাজনের পথে। নরদেহে ঠাকুরের সঙ্গে আর তাঁর সাক্ষাৎ হয় নি।

অতঃপর মধুরভাব সাধনের ইচ্ছা খুব বলবতী হয়ে ওঠে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনে। যখন যে সাধনায় ব্রতী হবার উদ্দীপনা জাগতো, ছুটে যেতেন মা-ভবতারিণীর কাছে, তাঁর আশ্বাসবাণী পেয়ে উঠে পড়ে লেগে যেতেন সিদ্ধি অর্জনের জন্য। এখনকার এ সংকল্প সাধনেও মায়ের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হলেন তিনি।

এসময়ে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীও ঠাকুরের অন্যতমা অভিভাবিকা। যে কোনো আধ্যাত্মিক কর্মে ঠাকুর তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ভৈরবী প্রায় রোজই আসতেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে, কখনো বা হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর নিজেই তাঁর কাছে চলে যেতেন।

মধুরভাব সাধনে ঠাকুর রামকৃষ্ণের এ সংকল্পের কথা শুনে ভৈরবী উল্লসিত হয়ে ওঠেন। বলেন, এতো খুবই আনন্দের কথা, বাবা।

এসাধনায় সিদ্ধ হবার যোগ্যতা যে তোমার সবার চাইতে বেশী। ত্যাগ বৈরাগ্য ও অনাসক্তি তোমার রয়েছে, কাম বাসনার চিহ্নও তোমার ভেতরে নেই। গোপীপ্রেম, রাধাপ্রেম সাধনার তুমি যে শ্রেষ্ঠ আধার।"

শুধু উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে একথা বলেন নি ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী। আপন সাধনজীবনের সংকট ও সমস্যার কথা, নানা পরীক্ষার কথা, রামকৃষ্ণ যে বালকের মতো সরলভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে বলেছেন। তাছাড়া, ভৈরবী নিজেও বামাচারী তন্ত্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে রামকৃষ্ণের কামজয়ী সত্তার পরিচয় কম পান নি।

রানী রাসমণি মহাভাগ্যবতী। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুদয় এবং লীলানাট্যের রঙ্গমঞ্চটি তিনি রচনা করেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, "রানী ছিলেন জগজ্জননীর অষ্ট নায়িকাদের একজন। তাইতো দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন ক'রে মায়ের ষোড়শোপচার পূজা আর সাধুসন্তদের থাকা-খাওয়ার এমন সুব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

মন্দিরের পূজারী ছোট ভট্‌চাজ ঠাকুর রামকৃষ্ণের ওপর রানীর সুনজর প্রথম থেকেই পড়তে দেরি হয় নি। দিনের পর দিন এ ব্রাহ্মণ-তনয়ের ভাবতন্ময়তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাছাড়া, নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন—ঠাকুর ইষ্টদর্শনে সফলকাম ; কালীসিদ্ধ শক্তিমান্ এক মহাপুরুষরূপে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তিনি আবির্ভূত।

কিন্তু সাধনার গোড়ার দিকে ঠাকুরের দিব্যোন্মত্ততা দর্শনে রানী রাসমণি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তবে কি অটুট ব্রহ্মচর্য ধারণ করতে গিয়ে, স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপন না করতে পেরে, ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হলো ?

রানীর ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠাকুরকে প্রলোভিত করার জন্য এক রাত্রে হাবভাবময়ী দুটি রূপসী বারাঙ্গনাকে পাঠানো হয় তাঁর শয়নকক্ষে।

ঐ মোহিনী রমণীদ্বয় তাঁর অঙ্গস্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে 'মা মা' বলে

চিৎকার ক'রে ওঠেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। তারপরই হারিয়ে ফেলেন বাহ্যজ্ঞান।

ঠাকুরের অপাপবিদ্ধ অঙ্গের স্পর্শে বারাঙ্গনা দুটিও হতচকিত হয়ে মেজের ওপর বসে পড়ে। তীব্র অনুতাপের আগুন তখন জ্বলছে তাদের অন্তরে। ঠাকুর বাহ্যজ্ঞান লাভ করলে বার বার তাঁর কাছে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বিদায় নেয় তাঁর কাছ থেকে।

মথুরও ঠাকুরকে একবার ফেলেছিলেন কঠিন পরীক্ষায়। নিজের ব্যবহারিক জীবনে, মথুর বার বার ঠাকুরের শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর কৃপায় উদ্ধার পেয়েছেন নানা ধরনের সঙ্কট থেকে। ভক্তিভরে ঠাকুরকে তিনি বাবা বলে ডাকেন, তাঁকেই জ্ঞান করেন নিজের শ্রেষ্ঠ সহায়রূপে। সেই বাবা যদি দিনরাত ইষ্টচিন্তার ফলে, অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য ধারণের ফলে উন্মাদ হয়ে যান তবে মথুরকে কে দেখবে, কে যোগাবে সাহস ও শক্তি ?

তাছাড়া, মথুর ঠাকুরের নিজমুখ থেকে শুনেছেন,—নারীমাত্রেই তাঁর মাতৃভাব, যে কোনো নারীকে দর্শন করেন তিনি জগজ্জননীর অংশরূপে। তাই ভাবলেন, বেশতো, এবার একটা বড় পরীক্ষা ঠাকুরের হয়ে যাক্ না।

মথুর রানীর জামাতা। শহরের ধনী ও রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাজে তাঁর নিত্য আনাগোনা। নিজেও কম আমোদপ্রিয় নন। তখনকার দিনে লছ্‌মীবাঈ নর্তকীদের সেরা, যেমন তার রূপ যৌবন আর মোহিনী মায়া, তেমনি ছিল নৃত্য ও গীতের আকর্ষণ।

এই নর্তকীর সঙ্গে গোপনে ফন্দী আঁটলেন মথুর, ঠাকুর সত্যিই কামজিৎ কিনা তা একবার পরখ ক'রে দেখতে হবে। বলে দিলেন লছ্‌মীবাঈকে, "শুধু তুমি একাই থাক্‌বে না, আরো একদল নর্তকীকে এনে রাখবে তোমার জলসাঘরে। ঠাকুরকে টলাতেই হবে, এজন্য মিলবে প্রচুর পুরস্কার।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন কয়েকদিনের জন্য জানবাজার রাজবাড়িতে

এসেছেন। একদিন বিকেলে মথুর বললেন, "চল বাবা, ফিটন গাড়ী ক'রে বাইরে কিছুটা হাওয়া খেয়ে আসি।"

সোৎসাহে সম্মতি দেন ঠাকুর। ময়দানের চারপাশে বেড়িয়ে, সন্ধ্যার পর মথুরের ফিটন এসে থামে লছ্মীবাঈর ভবনে। জলসাঘরে হাস্যলাস্যময়ী নর্তকীদের সম্মুখে ঠাকুরকে এগিয়ে দিয়ে মথুর সেখান থেকে সরে পড়েন।

ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় ঝলমল করছে নৃত্যশালা। এ যেন এক ইন্দ্রপুরী! রূপসী, হাস্যলাস্যময়ী একদল সঙ্গিনী নিয়ে ঠাকুরকে ঘিরে ধরে লছ্মীবাঈ।

"এ কোন্ রূপে, কোন্ সাজে আজ আমার সামনে এসে দাঁড়ালি মা-আমার," বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন রামকৃষ্ণ। আর সঙ্গে সঙ্গে দিব্য ভাবের তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়ে তাঁর সারা দেহে মনে, আনন্দ-স্ফুরিত আননে গেয়ে ওঠেন ইষ্টদেবী শ্যামা মায়ের আবাহন সংগীত।

ক্রমে এসে যায় অর্ধবাহ্য অবস্থা, দিব্য ভাবতন্ময়তা। কটিদেশ হতে বস্ত্রখানি কখন স্খলিত হয়ে পড়েছে, হুঁশ নেই। একেবারে দিগম্বর, উদ্‌ভ্রান্ত!

এ অপূর্ব দৃশ্যের এক মনোরম চিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার:

সুগায়িকা বেশ্যাগণ স্তব্ধ গীত শুনি।
বেদের বাঁশীর স্বরে যেমন নাগিনী॥
এ দিকে কি চিত্র দেখ ভরিয়ে নয়ন।
নবীন নবীন বয়ঃ প্রারম্ভ যৌবন॥
কাঞ্চন বরণ অঙ্গে কান্তি সমুজ্জ্বল।
লাবণ্য সৌন্দর্যমাখা শ্রীমুখমণ্ডল॥
ঈষৎ বঙ্কিম আঁখি বাল্যভাবে ভরা।
নিরুপম আঁখি-রাজ্যে আঁখির চেহারা॥
তুলির না হয় শক্তি আঁকিতে সে ঠাম।
ভাণ্ডারে অভাব বর্ণ নিজে বিধি বাম॥

ঈষৎ রক্তিমাধর অতি সুশোভিত।
তাম্বুলের রাগে যেন স্বতঃই রঞ্জিত॥
আছে কিবা তুলনা দিতে গঠন গ্রীবার।
বেণু বীণা পিক জিনি স্বরের দুয়ার॥
সুবিশাল বক্ষঃস্থল জানু মনোহর।
কূর্মাঙ্গের ন্যায় লিঙ্গ দেহের ভিতর॥
কোমলত্বে পরাজিত কমলের দল।
প্রভুর চরণ পদ্ম এতই কোমল॥
উঠে দিব্য পরিমল পরশ যেথানে।
বিভোর যাহাতে এবে যত বেশ্যাগণে॥
দিব্যভাবে বেশ্যাগণ জাতিবুদ্ধিহারা।
আঁকিতে নারিনু আজি চিত্রের চেহারা॥

লছ্‌মীবাঈ ও অন্যান্য নর্তকীরা ততক্ষণে ভুলে গিয়েছে, কোন্ কার্য সাধনের জন্য আজ তারা সবাই নিয়োজিত। যোগীর যোগ যারা ভেঙে দেয়, সাধারণ সংসারী মানুষকে যারা মেষ বানিয়ে রাখে, সেই মোহিনী রূপ-উপজীবিনীরা আজ যেন তাদের সকল কিছু শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে বসেছে।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে মেজেতে বসে পড়েন রামকৃষ্ণ। পুলকাশ্রু পুরিত নয়নে, গদ্‌গদ কণ্ঠে, আবার শুরু করেন তাঁর প্রিয় শ্যামা সংগীত। নর্তকীরা এবার এই দেবমানবের মাহাত্ম্য কিছুটা বুঝতে পেরেছে, সসম্ভ্রমে যুক্তকরে তারা দাঁড়িয়ে আছে সম্মুখে। কেউ বা আপন তনয় জ্ঞানে পরম স্নেহে ঠাকুরকে ব্যজন করা শুরু করেছে।

এমন সময়ে মথুর ফিরে আসেন লছ্‌মীবাঈর ভবনে। কক্ষের দৃশ্য দেখে মুহূর্তে বুঝতে পারেন, কামজয়ী মহাপুরুষকে, তাঁর বাবাকে, টলানোর সাধ্য এই রূপসী বারনারীদের হয় নি। বাবার মাহাত্ম্যে মোহিনীরা পরিণত হয়েছে বাৎসল্যময়ী মাতা রূপে।

"চল বাবা, আর নয়, আজ আমার খুব শিক্ষা হয়েছে," বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে নিয়ে এবার নিজগৃহে ফিরে আসেন মথুর।

এই সব অগ্নিপরীক্ষার কথা, অটুট ব্রহ্মচর্য সাধনের কথা, চরম কৃচ্ছ্র ও বৈরাগ্যের কথা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তন্ত্রগুরু ভৈরবীর কাছে বলেছেন রামকৃষ্ণ। ভৈরবী তার জিতেন্দ্রিয় সত্তার স্বরূপ সবার চাইতে বেশী জানেন। তাছাড়া, তাঁর পরিচালনাধীনে থেকে ঠাকুর আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়েছেন কি সহজ ভাবে, তাও তাঁর জানা আছে। তাই তো মধুর সাধনায় ঠাকুরের মন ঝুঁকেছে জেনে তৎক্ষণাৎ তাতে সায় দেন, বলে ওঠেন, "বাবা, তোমার মতো শুদ্ধসত্ত্ব আধারই যে ধারণ করতে পারে গোপীপ্রেমের রাধাপ্রেমের পরম রস।"

মধুর রসের, প্রেমরসের, সাধনায় এ সময়ে কিছুকাল ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ডুবে থাকতে দেখা যায়। সারা দেহে অষ্টসাত্ত্বিক প্রেম-বিকার প্রকটিত হতে থাকে। সাধন শেষে মহাভাবময়ী শ্রীরাধা ও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভে তিনি সকলকাম হন।

মধুর ভাবের এই সাধনকালেও ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী তাঁকে কম সাহায্য প্রদান করেন নি।

স্বামী সারদানন্দের লেখায় আমরা এর ইঙ্গিত পাই। তিনি লিখেছেন ঃ

"ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনেও ব্রাহ্মণী বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধনের কালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি? ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকট স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্যভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শনপূর্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরম উপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া

ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্তত নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়[১] ।"

পরবর্তী পর্যায়ে শিষ্য রামকৃষ্ণ ভৈরবীর কাছে তোলেন আর এক নূতন সাধনার কথা। বলেন, "মন্দিরের বাগানে এক বেদান্তী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। নাম—তোতা পুরী মহারাজ। আমায় নিজে যেচে বলেছেন, 'বেটা, তুমি বেদান্তের উত্তম অধিকারী। আমার কাছ থেকে অদ্বৈত বেদান্তের সাধন নেবে?'

ভৈরবী চমকে ওঠেন এ প্রস্তাব শুনে। ব্যস্ত হয়ে বলেন, "সে কি বাবা, ওযে শুক্‌নো জ্ঞান সাধনার পথ। ও পথে গেলে তোমার ভাবরস সব শুকিয়ে যাবে।"

এদিকে যে জগন্মাতার নির্দেশ পেয়ে গেছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। নিজেও তিনি বুঝে নিয়েছেন, নির্বিকল্প সমাধির স্তরে না পৌঁছুলে, অদ্বৈত সিদ্ধি করায়ত্ত না হলে, সাধনা তাঁর পূর্ণাঙ্গ হবে না।

বিচিত্র ভাব ও সাধনধারা অবলম্বন ক'রে, একটির পর একটি সাধন পর্যায় শেষ ক'রে, ভৈরবীর কৃতী শিষ্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবার এসে দাঁড়িয়েছেন অদ্বৈতসিদ্ধির মহাপারাবারের তীরে।

নূতনতম সাধন সম্পর্কে ঠাকুরের এই ধরনের তীব্র অনুরাগ সঞ্চারিত হবার কারণ কি, উত্তরকালে ভক্তেরা এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, "ছাখ্, সমুদ্রের তীরে যে সব সময়ে বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে রত্নাকরের গর্ভে কত কি রত্ন আছে তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়েও মার কাছে সব সময়ে থেকেও আমার মনে হতো, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে

১ লীলাপ্রসঙ্গের অপর এক স্থানে সারদানন্দজী আরো স্পষ্টতর ক'রে ঠাকুরের বৈষ্ণবীয় সাধনায় ভৈরবীর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, "ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমত সম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন।"

—লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ।

নানাভাবে ও নানারূপে দেখবো। তাই তাঁকে যখন যে ভাবে দেখতে ইচ্ছে হতো, সেই ভাবে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ধরতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁর ঐভাব দেখতে বা উপলব্ধি করতে যা কিছু প্রয়োজন তা নিজেই যুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা হয়েছিল।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এবারকার সাধন - জগজ্জননী পরাশক্তির অরূপ সাধনা, অদ্বৈত সিদ্ধির মহাসাধনা।

মা-ভবতারিণীর নির্দেশ এ ব্যাপারে ঠাকুর পেয়ে গিয়েছেন, তাই ভৈরবীর সতর্কবাণী কানে না তুলে আত্মসমর্পণ করলেন মহাবেদান্তী তোতাপুরীজীর কাছে, নূতন গুরুরূপে বরণ করলেন তাঁকে।

পুরী মহারাজ বলেছেন, এই অদ্বৈতব্রহ্ম সাধনায় এগোতে হলে ঠাকুরকে সন্ন্যাস নিতে হবে, মস্তক মুণ্ডন ক'রে, শিখা সূত্র ত্যাগ ক'রে উদ্‌যাপন করতে হবে বিরজা হোম।

নিজের গর্ভধারিণী আর তন্ত্রগুরু ভৈরবীকে না জানিয়ে গোপনে একটি নির্জন কক্ষে বসে বেদান্ত সাধনায় ব্রতী হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। পরম শুদ্ধ আধারে বেদান্তের সাধন দেওয়া মাত্র বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলেন তোতাপুরী মহারাজ।

বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধির স্তরে গিয়ে পৌঁছান, আর এই স্তরে অবস্থান করেন তিন দিন তিন রাত্রি। তারপর বেদান্তী গুরু তাঁকে বুত্থিত করান এই সমাধির থেকে।

"এ ক্যা দৈবী মায়া ?" সবিস্ময়ে বলে ওঠেন আত্মজ্ঞানী মহা-সাধক তোতাপুরীজী। যে নির্বিকল্প সমাধি অর্জনের জন্য চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনা তাঁকে করতে হয়েছে, এই তরুণ শিষ্য স্বল্পমাত্র আয়াসে এমনি ক'রে তা আয়ত্ত ক'রে নিলে ?

সাধারণত তিনদিনের বেশী এক জায়গায় কখনো বাস করতেন না তোতাপুরী মহারাজ। গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের পবিত্রভূমিতে আসার পর ঘটতে দেখা গেল ব্যতিক্রম। এগারমাস কাল তিনি অবস্থান

করলেন প্রিয় শিষ্য রামকৃষ্ণের সন্নিধানে, বেদান্তের জ্ঞান সাধনায়, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সাধনায় পারঙ্গম ক'রে তুললেন তাঁকে।

তন্ত্রগুরু ভৈরবী রামকৃষ্ণের বেদান্ত সাধন পছন্দ করেন নি। কিন্তু ঠাকুরের এই নতুন সাধনা ও নূতন গুরু তোতাপুরীকে মেনে নিয়েছিলেন তিনি। বুঝেছিলেন, রামকৃষ্ণ জগজ্জননীর নির্দেশ এস্থলে পেয়ে গিয়েছেন। তাছাড়া, অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে যুগাচার্যের ভূমিকা। লোকগুরু হবেন তিনি। তাই জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে বেদান্তের অদ্বৈতভূমিতে পৌঁছনোর প্রয়োজন আছে তাঁর।

ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবীর সাধনা ও সিদ্ধির প্রকৃত মূল্যায়ন আজ আর সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলায় এসে যে তিনটি অধিকারী পুরুষকে তিনি সাধন দিয়েছিলেন, সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, চন্দ্র ও গিরিজার জীবনতথ্য থেকে এই মহিয়সী নারীর সাধন-উৎকর্ষের একটি রূপরেখা অবশ্যই অঙ্কিত করা যায়।

ভৈরবী তন্ত্রসিদ্ধা সাধিকা—এ নিয়ে কারুর মতদ্বৈধ হবার উপায় নেই। বিশেষ ক'রে বীরাচারী ও বামাচারী নিগূঢ় তন্ত্রক্রিয়ায় ও বৈষ্ণবীয় তন্ত্রের সাধনায় তিনি নিপুণ ছিলেন। যোগৈশ্বর্যও তাঁর কম ছিল বলে মনে হয় না। কারণ, নিজের শক্তিবলেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, বাংলার তিনটি সাধককে তাঁকে সহায়তা দিতে হবে। এঁদের ভেতর ঠাকুর রামকৃষ্ণই যে ঈশ্বরের চিহ্নিত পুরুষ, অদূর ভবিষ্যতের যুগাচার্য, এ তত্ত্বও অভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর মনশ্চক্ষে। আর এতত্ত্বটি এমন সময়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন, যখন ঠাকুর ছিলেন কালীবাড়ির একজন দীন ভক্তিমান্ পূজারী ব্রাহ্মণ মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের মানুষ যখন তাঁকে জানতো পাগলা ছোট ভট্‌চাজ্ বলে, সেই সময়ে ভৈরবীর দৃঢ় ও কুণ্ঠাহীন কণ্ঠের ঘোষণা রামকৃষ্ণকে দাঁড়ো করিয়ে দিয়েছিল এক ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ রূপে।

তাছাড়া, আরও মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও সাধনকুশলতার পরিচয়

দিয়েছিলেন ভৈরবী। হাতে-নাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দিয়ে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়েছিলেন তিনি। আর এর ফলে, ঠাকুরের ভাবোচ্ছ্বাসময় জীবনের মূলদেশে নির্মিত হতে পেরেছিল সুদৃঢ় ও সুসংহত একটি তন্ত্রধৃত সাধনভিত্তি। শুধু তাই নয়, ভৈরবীর উপদিষ্ট এবং অনুষ্ঠিত তন্ত্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ফলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে এসে গিয়েছিল অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি। দিব্য রূপের ছটায়, বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, এসময়ে ঝলমল ক'রে উঠেছিল তাঁর দেহ, চোখে মুখে দেখা দিয়েছিল সিদ্ধ জীবনের দীপ্ত ভঙ্গিমা। চিহ্নিত দেবমানব রূপে সর্বস্তরের নরনারীর শ্রদ্ধা প্রেম সহজ এবং স্বাভাবিক-রূপে আকর্ষণ করেছিলেন তিনি।

তন্ত্রসিদ্ধির বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্ঞাত হয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ঈশ্বরনির্দিষ্ট মহান্ ভূমিকাটির কথা। স্বামী সারদানন্দের লেখায় এর সমর্থন মিলে—"তন্ত্রসাধন প্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পরে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মশক্তি লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুক্ত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'বেশ তো বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব'।"

ঠাকুরের মধুরভাব সাধনায়ও ভৈরবীর সহায়তার মূল্য কম নয়। এই মধুরভাব-সাধনজাত মহাপ্রেম উত্তরকালে আকৃষ্ট করেছিলো তাঁর অজস্র সংখ্যক ভক্তদের, আর তাঁর চিহ্নিত পার্ষদদের।

সিদ্ধ সাধক-সাধিকাদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় সিদ্ধপুরুষদের সমর্থন ও আলোকসম্পাতে। ভৈরবী যোগেশ্বরীর প্রকৃত স্বরূপ এবং মাহাত্ম্যও আমরা জানতে পারি ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিজের কথা থেকে। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছিলেন,—সাধিকা হিসাবে ভৈরবী যোগেশ্বরী ছিলেন যোগমায়ার অংশ সম্ভূতা।[১]

১ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, ঠাকুরের তন্ত্রসাধন

রামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধন ও সিদ্ধিদানের পরও এড়েদার দেবমণ্ডল ঘাটের নিজস্ব আবাসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন ভৈরবী। এ সময়ে নিজ কুটিরে বসে ধ্যানজপ করা, দক্ষিণেশ্বরে 'গিয়ে অধ্যাত্মতনয় রামকৃষ্ণকে দর্শন করা, আর ক্ষীর ননী সর খাওয়ানো, এই ছিল তাঁর নিত্যকার কর্ম। সাকুল্যে প্রায় ছয় বৎসর পরে খণ্ডিত হতে দেখা যায় এই জীবনধারাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের তোতাপুরীজীর কৃপা লাভ ও বেদান্ত সিদ্ধির পর থেকেই ভৈরবী বুঝে নিয়েছিলেন তাঁর এবং ঠাকুরের সাধনজীবন এবার থেকে পৃথক্ ধারায় প্রবাহিত। উভয়ের বিচ্ছেদের আর বেশী দেরি নেই।

এসময়ে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঠাকুর ও হৃদয়ের সঙ্গে ভৈরবী কামারপুকুরে এসেছেন। কিশোরী সারদামণিও এসেছেন পতি সন্দর্শনে। স্থানীয় ভক্ত নরনারীরা দিনের পর দিন এসে জুটছে ঠাকুরের সন্নিধানে। তাঁর উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এবং আনন্দরঙ্গ দর্শন ক'রে তারা মহা পরিতুষ্ট। কিন্তু এ আনন্দের পরিবেশে ভৈরবী যেন নিজেকে আর খাপ খাওয়াতে পারছেন না, সাধনজীবনের কি এক অতৃপ্তি, যেন বার বার পীড়িত করছে তাঁর অন্তরকে।

এসময়ে একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে ঘটতে দেখা যায় চিরবিচ্ছেদের সূচনা। অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে শ্রীনিবাস শাঁখারীও ঠাকুরকে সেদিন দর্শন করতে এসেছেন। ঠাকুরের আগ্রহে শ্রীনিবাস গৃহদেবতা রঘুবীরজীর প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

শ্রীনিবাসকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী খুবই প্রসন্ন। প্রসাদান্ন ভোজন শেষ হলে এই ভক্তটি নিজের এঁটো পাত সরাতে যাবেন, এমন সময়ে ভৈরবী বললেন, "বাবা, এ তোমায় নিকোতে হবে না, আমিই করবো'খন।"

একথা শুনে ঠাকুরের ভাগ্নে ও সেবক-ভক্ত হৃদয়রাম গর্জে ওঠেন। বলেন ভৈরবীকে, "পাড়াগাঁয়ের সামাজিক আচার বিচারের কি জানো তুমি? ব্রাহ্মণী হয়ে চিনু শাঁখারীর উচ্ছিষ্টে তুমি হাত দিলে গাঁয়ে

তুমুল গোলযোগ শুরু হবে, আর তার সব কিছু ঝঞ্চাট পোহাতে হবে আমাদের সবাইকে। ঐ এঁটো পাতা ছুঁলে তোমায় আর আমি ঘরে ঢুকতে দেবো না।"

বিতর্কের পর এসে পড়ে কলহের বিস্ফোরণ। ভৈরবী বুঝলেন, এবার শুরু হতে যাচ্ছে চিরবিচ্ছেদের পালা। মা জগজ্জননীর ইচ্ছে নয়, আর এখানে এভাবে তিনি অধ্যাত্মতনয় রামকৃষ্ণকে নিয়ে পড়ে থাকেন। শিকল সোনার হলেও তা শিকল তো বটে! এ মায়িক বন্ধন ছিঁড়ে এবার তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হবে পরমা মুক্তির সন্ধানে। বামাচারী সাধনা ও মধুরভাব সাধনা নিয়ে এতকাল কেটেছে, ঋদ্ধি-সিদ্ধিও জীবনে অনেক এসেছে। কিন্তু কই, এখনো তো তাঁর জীবন-তপস্যা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি? দিব্যাচারী সাধনা ও সিদ্ধির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আজো তো লাভ করতে পারেন নি চির-আরাধ্যা মহাশক্তিকে, ব্রহ্মময়ীকে!

সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেলেন ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবী। সাশ্রুনয়নে রামকৃষ্ণের বাৎসল্য বন্ধনকে খণ্ডিত করেন নির্দ্বিধায়।

কয়েকদিন পরে এসে যায় তাঁর সঙ্কল্পিত বিদায়ের লগ্ন। আশে-পাশের বাগান থেকে রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ ক'রে আনেন ভৈরবী। ভাবরসে মত্ত হয়ে, ভক্তি সংগীত গাইতে গাইতে, প্রস্তুত করেন রঙ-বেরঙের সুগন্ধী পুষ্পের মালা। সযতনে তাঁর গোপালরূপী রামকৃষ্ণের কণ্ঠে পরিয়ে দেন এই পুষ্পমালা, চন্দনে চর্চিত করেন তাঁর সুগৌর তনু, তারপর ধ্যানতন্ময় হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন স্নেহপুত্তলীর মনোহর মূর্তির দিকে।

এবার সাশ্রুনয়নে, ভাবকম্পিত দেহে নিজের ত্রিশূল আর গৈরিক বস্ত্রের ঝুলিটি নিয়ে চিরতরে হন দেশান্তরী।

পরবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরে বা বাংলার আর কোথাও যোগেশ্বরী ভৈরবীর কোনো সন্ধান কেউ পায় নি।

শোনা যায়, 'রম্‌তা সাধু বহ্‌তা নীর'-এর মতো ভৈরবী অসঙ্গ হয়ে সারা ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজন ক'রে বেড়িয়েছেন।

তারপর দুর্গম গহন বনে আশ্রয় নিয়ে দিব্যাচারী তন্ত্রসাধনার পরম উপলব্ধির জন্য উপবিষ্ট হয়েছেন সুতীব্র সাধনায়। জনজীবনে আর তাঁর ফিরে আসা সম্ভব হয় নি।

রামকৃষ্ণের তন্ত্রগুরু, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্মজীবনের অন্যতম ধারয়িত্রী, কবে কোথায় প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর অভীষ্ট পরমবস্তু, আজো তা নিহিত রয়ে গিয়েছে অতলান্ত রহস্যের গর্ভে।

সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ

শীতকাল, মাঘ মাসের শেষ। সারাদিন আকাশ ছিল মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যের পর থেকেই শুরু হয়েছে প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। ঘনকৃষ্ণ আকাশের বুক চিরে, কড়্‌কড়াৎ শব্দে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বার বার।

এসময়টায় তুষার ঝঞ্ঝার তাণ্ডব চলছিল হিমালয়ে। তারই ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে বৃন্দাবনে আর সারা ব্রজমণ্ডলে। একে তীব্র শীতের রাত, তার ওপর ঝড়ের কনকনে হাওয়া আর অবিরল বর্ষণ, হাড়ে যেন কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে।

ধীর-সমীরের ধারেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবগুরু দামোদরদাস বাবাজীর শ্রীশ্রীনটবর-কুঞ্জ। কুঞ্জ মানে একটি আখ্‌ড়া, আয়তনে তেমন বড়ও নয়। তিনটি কামরার একটিতে নটবরজী ও রাধারানীর সেবা-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আর দুটিতে বাবাজী তাঁর দুটি চেলা নিয়ে বাস করেন। আঙিনাটি সুবিস্তৃত, তার একপাশে পাকা ছাউনির একটি বড় গোয়ালঘর। গোটা তিনেক গরুর আস্তানা সেখানে। বিগ্রহের মতো এরাও বাবাজীর নমস্য, তাদের পরিচর্যায় কোনো দিক দিয়ে এতটুকু ত্রুটি হবার যো নেই।

ঝড়ের দাপটে ঘরের প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে, কক্ষের এক কোণে রাখা বৃহৎ মৃৎভাণ্ডের জ্বলন্ত অঙ্গারেও তেমন তেজ নেই। শীতের কাঁপুনিতে বাবাজী কখন তাঁর খাটিয়ায় উঠে বসেছেন, ভজনের মালাখানি হাতে নিয়ে বার বার করছেন উস্‌খুস।

এবার দেয়ালে মালাটি টাঙিয়ে রেখে দীপ জ্বালেন, নিভন্ত অঙ্গার কিছুটা উস্কে দেন। তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে জোরগলায় চেলাদের ডাকতে থাকেন, "ওরে নন্দদাস, ওরে ও মিঠুলাল, তোরা উঠে পড়তো বাবা, শিগ্‌গীর এদিকে আয়।"

বড় চেলা নন্দদাস হচ্ছে বাঙালী, আর ছোটটি, মিঠুলাল, ব্রজবাসী

গোপতনয়। ওরা দু'জনে সারাদিন বড় পরিশ্রম করেছে। আজ মথুরার হাটবার। কুঞ্জের কাজকর্ম সেরে সেখানে তারা পায়ে হেঁটে গিয়েছে, কুঞ্জের বিগ্রহ পূজার নানা উপকরণ কিনেছে মণ্ডীতে ঘুরে ঘুরে। তারপর চুনোভূষি খড় বিচালী ভরা একগাড়ি গরুর খাদ্য নিয়ে কুঞ্জে যখন ফিরে এসেছে তখন অনেক রাত।

শীতে আর ঝড়জলে দু'জনেরই দেহ অবসন্ন প্রায়। এই তো কিছুক্ষণ আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে, ঘরের একপাশে গাছের কুঁদো জ্বালিয়ে দিয়ে, আরামে গা ঢেলে দিয়েছে খাটিয়ায়। দু'জনেই এসময়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

বাবাজীর ঘন ঘন ডাক আর হুঙ্কারে জেগে না উঠে উপায় কি?

খাটিয়ায় শায়িত থেকেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথোপকথন চলে দুই গুরু-ভাইয়ের। এবার একটা ছলছুতো ক'রে বাবাজী শয্যা থেকে তাদের ওঠাবেন, তারপর বসিয়ে দেবেন ভজন ও জপে।

দামোদরদাস বাবাজী আবার ডাকেন বিরক্তির সুরে, "ওরে তোরা ওঠ্। শুনছিস্ না একটা গরু হাম্বা হাম্বা ক'রে ডাকছে। নিশ্চয় কেউ খড় বিচালী চুরি করছে।"

মিঠ্ঠলাল ব্রজবাসী কিশোর। বাবাজী বড় স্নেহ করেন তাকে, আর সেও দুষ্টুমি ক'রে বেশ কিছুটা সুযোগ নেয়। আবদার করে, প্রয়োজন হলে বৃদ্ধ বাবাজীকে দু'কথা শুনিয়েও দেয়।

মিঠ্ঠলাল উত্তরে হিন্দী বাংলায় মিশিয়ে যা বলে তার মর্ম: "বাবা, এই ঝড় বাদ্‌লায় আর শীতে কোনো চোরই চুরি করতে বেরুচ্ছে না। ঘরে বসে আগুন পোহাচ্ছে বা ঘুমুচ্ছে, আপনার চিল্লানোর ঠেলায় আমরা তো উঠে বসেইছি, ঠাকুর নটবরজীর নিদ্‌ও টুটে গেছে।"

"তুই চুপ কর্ তো বাঁদর ছোঁড়া। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, কুঞ্জে বসে বসে শুধু দই চিঁড়ে খাবার যম। বেশ তো, চোর যদিই বা না এসে থাকে, গরুর গলায় দড়ি জড়িয়ে ফাঁসও তো লাগতে পারে? শুনছিস তো, কি রকম হাম্বা হাম্বা করছে! ও নন্দদাস, মিঠ্ঠলালকে নিয়ে একটু দেখে আয়। গোমাতার জন্য একটু ভিজলিই বা।"

ছাতা আর লণ্ঠন নিয়ে দুই চেলা এবার ঢুকে পড়ে গোয়াল ঘরে। গরুগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দু'জনে বিস্ময়ে হতবাক্। সামনেই লম্বা হয়ে ভূমিতলে পড়ে আছে একটি মনুষ্যদেহ। একটা পশমী চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দেওয়া। একি মৃত না জীবিত?

মুখের দিককার চাদর একটু সরাতেই নন্দদাস দেখে—এ এক নারীমূর্তি। গৌরবর্ণা, অপূর্ব সুন্দর তার মুখশ্রী। আয়ত নয়ন দুটি নিমীলিত, মনে হচ্ছে বাহ্যজ্ঞান নেই।

তাড়াতাড়ি নাকের কাছে দু'জনেই আঙুল নিয়ে দেখে। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস এখনো বইছে। তাহলে, মরে নি মেয়েটি। হয়তো অচেতন হয়ে পড়েছে তীব্র শীতে, আর ঝড়-জলে ভিজে।

গোয়াল থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে মিঠুলাল ঢুকে পড়ে বাবাজী মহারাজের ঘরে। ব্যগ্র স্বরে বলে ওঠে, "চৌর নহি বাবা, এক বহৎ সুন্দরী মায়ী। মালুম পড়তা, রাধারানীজী হোগা।"

মালাটি হাতে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার জপে বসেছিলেন দামোদরদাসজী। মিঠুলালের কথা শুনে কৃত্রিম কোপের সুরে বলেন, "চুপ কর বুদ্ধু কোথাকার। রাধারানীজীর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই ঢুকবেন তোদের গোয়াল ঘরে। তাছাড়া তুই চিনিস নাকি রাধারানীজীকে? দেখেছিস কখনো?"

"রাধারানীজী না হোবে তো, এ-মায়ী কমসে কম্ ললিতা বিশাখাজী তো হোবেই।" চট্‌পট উত্তর দেয় মিঠুলাল।

কিশোর চেলার এ সরল ও চপল উক্তি শুনে হেসে ফেলেন বৃদ্ধ দামোদরদাস বাবাজী। মন্তব্য করেন, "যেন ললিতা বিশাখাজীকেও তুই কত জানিস্। হ্যাঁ, শোন্ এবার, কাজের কাজ কর্। নন্দদাস আর তুই, দু'জনে ধরাধরি ক'রে মেয়েটাকে এ ঘরে নিয়ে আয়। তোদের ওখান থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি এনে পাশে রেখে দে। বড় কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। শীতে আর বাদ্‌লায় মরে যে যায় নি এটাই ভাগ্যি।"

চেলারা বাবাজীর নির্দেশ মতো এ কাজ সম্পন্ন করে। ঘণ্টা দুই

পরে, আগুনের তাপে কিছুটা সুস্থ হয়ে চোখ মেলে তাকায় মেয়েটি, ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলতে চায়।

"ওর মুখে একটু গরম দুধ ঢেলে দে তোরা। মূর্ছা ভেঙেছে। এবার ঘুমিয়ে পড়বে।" কথা কয়টি নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলে আবার হাতের মালা ঘোরাতে থাকেন দামোদরদাস বাবাজী।

পরের দিন সকালবেলা যমুনায় স্নান সমাপন ক'রে নটবরজী ও কিশোরীজীর পূজা এবং বাল্যভোগদান সেরে বাবাজী বারান্দায় এসে বসেছেন। চেলাদের ডেকে বললেন, "ওটাকে এবার নিয়ে আয়। প্রসাদী ফলমূল কিছু খাইয়ে, এবার আপদ বিদেয় ক'রে দে।"

'ওটা' মানে নবাগতা অতিথিটি। নন্দদাস চমকে ওঠে। বিষণ্ণ কণ্ঠে আবেদন জানায়, "বাবা, এটা কি ঠিক হবে? মনে হচ্ছে, কয়দিন ওর কোনো খাওয়া-দাওয়া হয় নি। অবসন্নতায় যেন ভেঙে পড়েছে।"

"অমন চাঁদপানা মুখটি দেখে তোর বুঝি মাথা ঘুরে গেছে! কিন্তু ওটাকে এখানে রাখবি কোথায়? খাওয়াবি কি? তা ভেবেছিস্?"

"সে পরের কথা, বাবা। কিন্তু এখনি, এ অবস্থায় ওকে—"

"তুই থাম্ তো। ঝড়ে-পড়া একটা কাক হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকে পড়েছে। তা নিয়ে বেশী মাতামাতি করার দরকার নেই।"

পরক্ষণেই নন্দদাসের হুঁশ হয়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে বাবাজীর মাহাত্ম্য, তাঁর অলৌকিক শক্তি ও প্রেম সে কিছুটা উপলব্ধি করেছে বৈকি। যত কঠোর বাক্যই তিনি বলুন তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজ করছে স্বর্গীয় স্নেহ প্রেমের অতল সায়র।

তাঁর খিট্‌খিটে মেজাজ আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের জ্বালায় চেলাদের সদাই অস্থির থাকৃতে হয় বটে, কিন্তু তাঁর মতো অগাধ অসীম ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রাখতে পারে ক'জনা? এখানে বাবাজীর আশ্রয় নেবার পর থেকে নন্দদাস ভুলে গিয়েছে তাঁর ঘর সংসার পিতামাতার কথা, ভুলেছে নিজের সুখ দুঃখের কথা। বাবাজী আর কুঞ্জবিগ্রহ ছাড়া আর যেন তার কোনো অস্তিত্ব নেই।

এই তো তাঁর কিশোর চেলা মিঠ্ঠুলাল। দিনরাত 'বাঁদর ছোঁড়া' বলে বাবাজী করছেন তাকে গালিগালাজ। আবার কি অপার স্নেহ মমতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাকে। কতবার নন্দদাসের কাছে গোপনে বলেছেন বাবাজী,—"দ্যাখ্, ওর দিকে সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখবি, ঠাকুরের পায়ে দেবার ফুলটির মতো ও একদিন ফুটে উঠবে। জানিস, ওদের তিন পুরুষের ওপর রাধারানীর কৃপা রয়েছে!"

খানিক বাদে মেয়েটিকে সন্তর্পণে ধরে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়, বসিয়ে দেওয়া হয় বাবাজীর সামনে।

প্রণাম ক'রে স্থির নেত্রে বাবাজীর দিকে তাকাতেই ডুকরে কেঁদে ওঠে মেয়েটি, "বাবা, তাহলে, আপনিই! হ্যাঁ, আপনিই যে সেদিন গিয়েছিলেন কলকাতায়। আপনারই হাতছানি আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে এই বৃন্দাবনে, আশ্রয় দিতে চেয়েছে আমায়!"

"ওসব ছেঁদো কথা রাখো। বিপদে পড়লে সবাই অমন সব কথা বলে। বৃন্দাবনধাম আর ব্রজমণ্ডল ছেড়ে চল্লিশ বছর কোথাও আমি পা বাড়াই নি।" আপন মনে গম্ভীরভাবে মালা টপকাতে থাকেন দামোদরদাসজী।

"হ্যাঁ, বাবা। ইষ্টদেবের নামে শপথ ক'রে বলছি, ঠিক এমনিভাবে, কলকাতায় দিনের বেলায় জলজ্যান্ত মানুষ রূপে আপনি আমায় দর্শন দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই ভঙ্গীতে বসা, এইভাবে মালার ঝুলিতে হাত রাখা। হুবহু এই মূর্তি! শুধু তাই নয়, বাবা। মথুরায় পৌঁছেও আপনাকে দেখেছি আমি।"

"মথুরায় তো বাবাজী যাচ্ছেন না অনেকদিন। ব্যাপারটা সব খুলে বলুন তো।" বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে নন্দদাস। ইতিমধ্যে সে বুঝে ফেলেছে, এ হচ্ছে বাবাজীর এক নূতন কৃপালীলা।

উল্লসিত হয়ে মিঠ্ঠুলাল মন্তব্য করে, "বড়ি তাজ্জব কি কাণ্ড্।"

শান্ত স্বরে মেয়েটি বলতে থাকে, "হ্যাঁ বাবা! মথুরায় পৌঁছে কোনো ভিক্ষা মিলে নি। শরীর মন অবশ। এদিকে সন্ধ্যের পর বৃষ্টি শুরু হলো। হাটের প্রান্তে একটা পড়ো চালা ঘরে আশ্রয়

নিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, আপনি জপের মালাটি হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বলছেন, 'ঐ তো পাশেই রয়েছে খড় বিচালী ভরা গরুর গাড়িটা, এখনি বৃন্দাবনে রওনা হচ্ছে। এক্ষুনি ওর পেছনে জায়গা ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়্। তারপর আমার কাছে ঠিক পৌঁছে যাবি।' আপনার সেই নির্দেশমতোই আমি এসেছি, বাবা।"

"এলেই হলো?" ক্রুদ্ধ স্বরে খেঁকিয়ে ওঠেন বাবাজী। "এখানে নূতন লোকের থাক্‌বার জায়গা কোথায়? খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা? কোন্ রাজা মহারাজা আমার চেলা যে রোজ এখানে ভাণ্ডারা হবে? আর দেরি না ক'রে চট্‌পট্ বিদেয় হও।"

যুক্তকরে, অশ্রুসজল নয়নে মেয়েটি উত্তর দেয়, "বাবা, দু'-দু'বার আপনার অলৌকিক দর্শন আমি পেয়েছি। ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ দর্শনও পেলাম। আপনার চরণ ছেড়ে, এই কুঞ্জ ছেড়ে, আর কোথাও আমি যাচ্ছিনে। তাছাড়া, যাবার কোনো জায়গাও আমার নেই।"

নন্দদাস আর মিঠুলাল বিষণ্ণ হৃদয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে বাবাজী মহারাজকে আর কিছু বলতে তাদের সাহস হচ্ছে না। মনে মনে ভাবছে, মেয়েটি সত্যিই নিরাশ্রয়, অলৌকিক দর্শন দিয়ে বাবাজী কিছুটা কৃপা একে করেছেন, এখন এমন নিষ্করুণভাবে কুঞ্জ থেকে বার ক'রে দেওয়া,—এটা কি ঠিক হচ্ছে?

"তোরা কি ভাবছিস্ তা আমি জানি," চেলাদের উদ্দেশ ক'রে রুষ্ট স্বরে বলে ওঠেন বাবাজী। "কিন্তু, একে আমি ঠাঁই দিই কি ক'রে? লোকে বলবে, বুড়ো দামোদরদাসজী বড় চতুর। ফন্দী এঁটেছে, কুঞ্জে একটা কুন্‌কী হাতি এনে রেখেছে?"

"কুন্‌কী? উহ্ কোন্‌সা চীজ, বাবাজী?" কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে সদা হাস্যময় কিশোর চেলা মিঠুলাল।

"তা জানিস্‌নে? ব্যাটা অপদার্থ! পূর্ব জন্মের সুকৃতি বলে ব্রজের গোয়ালা হয়ে জন্মেছিস্ বটে, কিন্তু দুধ আর দই খেয়ে শুধু পেট মোটাই করছিস্, আর কিছু তোদের হলো না।"

"বাবাজী, ব্রজ্‌কা দুধ অওর দহিকা নিন্দা মৎ কিজিয়ে। আপকা কিষণজীকো শরীর ওহিসে বানিয়েছে, তাগদ্‌ হইয়েছে। তব্‌ তো হুয়া কংস বধ।"

"আকাট মুখ্যু, ব্রজ গোয়ালা! ঐ অহমিকাই তো তোদের কাল হলো। কিষণজী যে কী পরম বস্তু, তা আর তোদের বোধে এলো না। জানিস্‌ তো, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের অহংবোধ হয়েছিল—এতো শত্রু তাঁকেই মারতে হবে! কিষণজী দেখিয়ে দিলেন, আগে থেকেই সবাইকে তিনি বধ ক'রে রেখেছেন, অর্জুন নিমিত্তমাত্র। আবার কিষণজীর দেহত্যাগের পর আহীর দস্যুরা যখন দ্বারকায় হানা দিল, অর্জুন ছুটে এলেন গাণ্ডীব নিয়ে। ভাবলেন, মেয়েদের তিনি রক্ষা করবেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রজয়ী মহাবীর অর্জুন হেরে গেলেন দস্যুদের কাছে, গাণ্ডীব তুলতেই পারলেন না। কিষণজী দেখিয়ে দিলেন, তিনি না থাক্‌লে অর্জুনের বীরত্ব অতি তুচ্ছ।"

এবার নন্দদাস বলে ওঠে, "কুন্‌কী হাতির কথা বলছিলেন, বাবা? সেটা কি? তা তো বুঝিয়ে বললেন না।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্‌। তবে শোন্‌। আসামের জঙ্গলে যারা খেদায় হাতি ধরে, তারা কুন্‌কী পোষে। এটা হচ্ছে মাদী যুবতী-হাতি। এই কুন্‌কী বাইরে গিয়ে বুনো মদ্দা হাতিগুলোকে ভুলিয়ে খেদার ভেতরে নিয়ে আসে। তারপর সেগুলো আটকে পড়ে। তাই বলছিলাম, এই মেয়েটাকে এখানে রাখলে, বৃন্দাবনের লোকেরা বলবে, "বুড়ো দামোদরদাস খুব ফন্দী বার করেছে। একটা সুন্দরী মেয়েকে কুঞ্জে রেখেছে, তাকে দেখিয়ে শাঁসালো সব চেলা টেনে আন্‌বে বলে। বড় বড় শেঠ আর রাজারা এবার আসতে থাক্‌বে।"

করুণ কণ্ঠে মেয়েটি বলে, "বাবা, আমার সৌন্দর্যই যদি এখানে থাকার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এ সৌন্দর্য আমি এই মুহূর্তে নষ্ট ক'রে ফেল্‌ছি। ঐ জ্বলন্ত কাঠের অঙ্গারে এ মুখ পুড়িয়ে ফেলছি, তা হলে তো কেউ আর ফিরে তাকাবে না।"

"তা তো হয় না মায়ী", বাবাজীর মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির রেখা। "তুই কি নিজে তোকে গড়েছিস? প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গড়েছেন তোকে। এ সৌন্দর্যও তাঁরই দেওয়া। তা নষ্ট করার অধিকার তো তোর নেই।"

"তা হলে, বাবা?" অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে মেয়েটি।

"উপায় আছে, মায়ী। খুব সহজ। আর তা তোরই হাতে। এ দেহ, এ সৌন্দর্য, সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ ক'রে দে, নিজের বলে কিচ্ছু রাখতে পারবিনে। কি, রাজী আছিস্ তো?"

অকূলে কূল পেয়ে যায় মেয়েটি। সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ ক'রে দামোদরদাসজীর চরণে। দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারে ঝরে পড়ে আনন্দাশ্রু।

"অনেক কষ্ট পেয়েছিস, মা। যা, এবার এসে গিয়েছিস্ প্রভু নটবরজীর আশ্রয়ে। এখন থেকে আর ভয় নেই, নেই কোনো ভাবনা। কয়েকটা বছর সারা দেহমনপ্রাণ দিয়ে ঠাকুরজীর সেবা কর্ এখানে থেকে। তারপর শুরু করাবো তোর আসল তপস্যা। হ্যাঁ মা, তুই ঠিকই বলেছিস, নটবরজীর কৃপা তোর ওপর ছিল। তাই আমি নিজে গিয়ে তোকে আহ্বান ক'রে এনেছি এখানে।"

মেয়েটির নাম মালতী দাসী, জাতিতে কায়স্থ। বাবাজী মহারাজের চরণতলে বসে নিজ জীবনের কাহিনী এবার সে বর্ণনা করে। এ কাহিনী বড় দুঃখময় ও মর্মান্তিক।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মালতীর জন্ম। বিধবা মায়ের সে ছিল এক মাত্র সন্তান। গায়ের রঙ ছিল কনক চাঁপার মতো, তাছাড়া, অসামান্য সুন্দরী ও লাবণ্যবতী ছিল সে। কিশোর বয়সে বিয়ে হলো কলকাতার এক খ্যাতনামা বিত্তবান পরিবারে। শ্বশুর বিদেশী সওদাগরী হাউসের বেনিয়ান, দুই পুরুষের বিরাট ব্যবসা। বিপুল ধনৈশ্বর্য, রাজার মতো অট্টালিকা, প্রচুর সংখ্যক দাসদাসী, কোনো কিছুর অভাব ছিল না তাঁর। মালতীর স্বামী ছিল পিতার এক মাত্র পুত্র, রূপে গুণে অনন্য। কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি পুত্র সন্তানও

জন্মগ্রহণ করলো। সংসারে হাসি আনন্দ, খ্যাতি, ঐশ্বর্য যেন তখন উপচে পড়ছে।

কিন্তু বৎসর দুই বাদেই প্লেগ রোগের আক্রমণে মালতীর শ্বশুর ও স্বামী দু'জনেই একমাসের ব্যবধানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাসি আনন্দের দীপশিখা নিভে যায় নিয়তির একটি ফুৎকারে। শিশু পুত্রটিকে নিয়ে প্রতিকূল সংসারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুঝতে থাকে মালতী, আর প্রতিপদে হতে থাকে ক্ষত বিক্ষত।

পাশের বড় বাড়িটিতে থাকেন মালতীর ভাশুর, তার স্বামীর জেঠতুত দাদা। প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি এই ভাশুরেরও ছিল, কিন্তু কলকাতার ধনী সমাজের নানা ধরনের পাপাচার প্রবেশ করেছিল তাঁর জীবনে। বিলাস ব্যসনে তিনি গা ঢেলে দিয়েছিলেন, সুরা আর বাঈজীদের পেছনে অর্থ ঢালতেন অকাতরে।

এর বিষময় ফল ফলতে দেরি হয় নি। শরীরের ওপর অতি মাত্রায় অত্যাচারের ফলে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলেন ভাশুর। ব্যবসায়েও বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন দেখা দিল। তারপর দেনার দায়ে হলেন সর্বস্বান্ত।

এবার সদ্যবিধবা মালতীর বিপুল বিত্ত বিষয়ের দিকে পড়ে তাঁর শ্যেনদৃষ্টি। তাছাড়া, মালতীর রূপ যৌবনও অতিমাত্রায় লুব্ধ ক'রে তুলেছিল তাঁকে।

ভাশুর ভেবে দেখলেন, তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে বড় বাধা মালতীর ঐ ফুটফুটে ছোট্ট শিশুটি। কোনোমতে এটিকে অপসারণ করতে পারলে তিনি নিজেই হবেন তার বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তারপর ধীরে ধীরে তরুণী বিধবা মালতীকে পুরে ফেলতে পারবেন তাঁর মুঠোর ভিতর।

পাপ চক্রান্ত শুরু হয়ে যায় অচিরে। ও বাড়ির পুরোনো ঝি মানদা'র এ বাড়িতে যাওয়া আসাটা হঠাৎ কেন যেন বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, মালতীর ছোট ছেলেটির জন্য তার আদর আর দরদের অবধি নেই। পাড়ায় মানদা ঝির সুনাম নেই, এ বাড়ির কর্মচারী

দাসদাসীরা তো কেউ তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কি কুমতলব নিয়ে সে আনাগোনা করছে কেউ ভেবে পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে যা ঘটবার তা ঘটে গেল।

সেদিন রাত্রের খাওয়া খাইয়ে খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল—ঘুম তার ভেঙে গিয়েছে, শয্যায় উঠে বসে ছট্‌ফট করছে পাগলের মতো। অল্প ক্ষণের ভেতরই দেহ হয়ে গেল নীলবর্ণ। শহরের বড় বড় ডাক্তারে, সাহেব ডাক্তারে, ঘর ভরে গেল। কিন্তু মালতীর নয়নের মণিকে তাঁরা রক্ষা করতে পারলেন না। সবার মায়া কাটিয়ে একমাত্র শিশু সন্তান চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। ডাক্তারেরা বললেন, মৃত্যু ঘটেছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে।

খোকার হিমশীতল দেহটি বুকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে মালতী। সৎকার ক'রে যখন সবাই ঘরে ফিরে আসে তখন সে তার ঘরে পড়ে আছে সংজ্ঞাহীন হয়ে।

বাড়িতে শ্রীবিগ্রহ রাধামাধবের সেবা পূজা নিত্য অনুষ্ঠিত হয়। মূর্ছা ভঙ্গের পর ঝড়ের মতো ঠাকুরঘরে গিয়ে উপস্থিত হয় মালতী। আর্তনাদ ক'রে বলতে থাকে, "কি পাপ আমি করেছি ঠাকুর, যে একের পর এক সবগুলো অবলম্বন আমার এমনি কেড়ে নিচ্ছো ?"

পাথরের ঠাকুর কোনো উত্তরই যে দেন না। সায়ক বিদ্ধা পক্ষিণীর মতো ছটফট করতে থাকে মালতী। তারপর আর্তি ও শোকের বন্যায় কোথায় সে যেন তলিয়ে যায়।

ম্যানেজার ও আমলারা একবাক্যে বলছে, খোকার অকালমৃত্যুর মূলে রয়েছে নৃশংস চক্রান্ত। ও বাড়ির কর্তার প্ররোচনায় মানদা ঝি বিষ মিশিয়েছে তার খাদ্যে। অভিযোগের পর পুলিস এসে তদন্তও ক'রে গেল। কিন্তু বিষ মেশানোর সময় অপরাধীকে কেউ দেখেছে, এমন কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বা প্রমাণ নেই। তদন্ত আর তাই অগ্রসর হতে পারে নি।

কয়েক মাস পরের কথা। পুত্রশোকের ঝড় তাণ্ডব শেষ হয়ে গিয়েছে। মালতী এবার স্তব্ধ। অন্তরে শুধু চলছে অব্যক্ত বেদনার

জ্বালা আর শূন্যতা বোধ। উষর মরুভূমির মতো হয়ে গেছে তার এই জীবন।

শুধু শ্রীবিগ্রহ রাধামাধবের সেবার দিকে চেয়ে, আর তার ওপর নির্ভরশীল আত্মপরিজন, আমলা ও দাসদাসীদের দিকে চেয়ে কলের পুতুলের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মালতী।

কিন্তু দুর্দৈব যখন আসে, আসতে থাকে একের পর এক ঢেউএর মতো। এক্ষেত্রেও তাই হতে দেখা গেল। দুর্নীতিপরায়ণ ভাশুর এবার আরো বৃহত্তর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেন। রূপসী যুবতী মালতীকে তাঁর চাই, চাই তার ঘরবাড়ি আর সমস্ত কিছু ধনসম্পদ। এ জাল ছড়াতে কোনো দিক দিয়েই তিনি ত্রুটি রাখেন নি, নিকটতম কয়েক জন আত্মীয়স্বজন এবং আমলাকেও উৎকোচ দিয়ে বশ ক'রে ফেললেন অচিরে।

বার বার তাঁর প্রলোভন আর প্রস্তাব আসতে থাকে মালতীর কাছে: "নিজের যৌবন, সৌন্দর্য, বিত্ত বিষয় কেন এভাবে নিষ্ফল হতে দিচ্ছো, ব্যর্থ হতে দিচ্ছো? সব সঁপে দাও আমার কাছে। সুন্দর জীবনকে আবার ফিরে পাবে, উপভোগ করবে আশ মিটিয়ে।"

রোষে, ঘৃণায়, আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে মালতী। আত্মরক্ষার মতো মনের বল তার আছে, সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও সে পারে। কিন্তু কতদিন যুঝতে পারবে সে? আমলাদের বিশ্বস্ততায় ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে, বিশ্বাসঘাতকের ছুরি নিয়ে কে কোথায় আঘাত হানবে তার কোনো ঠিক নেই। তাছাড়া, এখন এমন একটা শক্তিক্ষয়ী সংঘর্ষে কেনই বা লিপ্ত হবে মালতী। তাতে জিতলেই বা তার লাভ কি? কার জন্যে জিতবে? কাকে নিয়ে ভোগ করবে তার এ বিপুল ঐশ্বর্য, আর তার এই জীবন?

সেদিন পূজোর ঘরে গিয়ে রাধামাধবের চরণতলে বসে কেঁদে ভাসিয়েছে, মিনতি জানিয়েছে বার বার, "ঠাকুর, এবার দুঃখিনীর এ দুঃসহ জীবনের ইতি ক'রে দাও, কৃপা করো, ঠাঁই দাও তোমার চরণতলে।"

কাঁদতে কাঁদতে দেহ মন হয়েছে অবসন্ন, কখন যেন সে এলিয়ে পড়েছে কক্ষতলে, গভীর ঘুমে হয়েছে অভিভূত।

এসময়ে এক স্বপ্ন দর্শন করে মালতী। জ্যোতির্ময় মূর্তিতে কক্ষ উজ্জ্বল ক'রে রাধামাধব এসে দাঁড়িয়েছেন তার সম্মুখে। স্নেহপূর্ণ স্বরে বলছেন, "এরকম শুধু কেঁদে কেঁদে মরছিস্ কেন? আর এখানে রয়েছিসই বা কেন? আমার ধামে, বৃন্দাবনে, চলে আয়। সেখানে তোর জন্য স্থান ক'রে রেখেছি। এবার সব ভাবনা আমায় দিয়ে দে, দেখবি—কোনো কিছুই তোর হারায় নি, সবই রয়েছে আমার কাছে সঞ্চিত। আমায় যে পায়, সে সব পায়।"

ঘুম ভেঙে যায়, উচ্চকিত হয়ে ওঠে মালতী। কিন্তু কই ঠাকুরের সেই জ্যোতিঃঘন প্রকাশ? পাথরের ঠাকুরের ভেতর কোনো ভাব-বৈলক্ষণ্যই নেই, নিষ্পলক নেত্রে, নীরবে নিস্পন্দভাবে পূর্ববৎ তাকিয়ে রয়েছেন।

নানা চিন্তার অভিঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে মালতী। স্বপ্ন কি সব সময়ে সত্য হয়? না—এ তার নিজের মানসিকতা, নিজের চিন্তাতরঙ্গেরই প্রতিফলন? কে করে দেবে তার এ সমস্যার সমাধান, কে দেবে সত্যকার পথসন্ধান?

ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। সেদিন গভীর রাত্রে তার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে মালতী। হঠাৎ জানালার ওপর থেকে একটা ঢিল এসে পড়ে তার গায়ের ওপর, ঘুম তৎক্ষণাৎ ভেঙে যায়। ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসে, বিজলি বাতি জ্বালিয়ে দেখে, পাশে পড়ে রয়েছে একটা বড় মাটির ঢেলা।

মুহূর্তে একবার ভেবে নিল মালতী, পাশের ঘর থেকে দাসীদের ডেকে তুলবে কিনা? চারদিকে তাকিয়ে দেখে, দরজা জানালা সব ঠিক মতোই আছে, ভয়ের কিছু নেই। ঢিলটা এসেছে জানালার গরাদ গলিয়ে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় মালতী। তার ঘরের পাশেই একটা নিচু ছাদ, তার আলসের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন জটাজূট সমন্বিত এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ

বৈষ্ণবমূর্তি। অন্ধকার রাত, কিন্তু এই মূর্তি-নিঃসৃত মৃদু জ্যোতির ছটায় আশেপাশের স্থান হয়ে উঠেছে উদ্‌ভাসিত। সাধুর এক হাতে কমণ্ডলু, আর এক হাতে জপমালার থলি। প্রসন্ন দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে স্বর্গীয় আনন্দের ধারা। মালতীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "মায়ী, স্বপ্নে সেদিন যা দেখেছিস্‌, যা শুনেছিস, সবই ঠিক। ঠাকুরের কৃপা রয়েছে তোর ওপর। তবে আর এতো ভাবনা কেন? মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছেড়ে, সব গুটিয়ে ফেল্‌, চলে আয় বৃন্দাবনের লীলাধামে। আর বৃথা সময় ক্ষেপণ করিসনে।"

মালতী সারা দেহ রোমাঞ্চিত। অন্তরে অজানা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ঢেউ। অবাক হয়ে এই দিব্যমূর্তির দিকে নির্নিমেষে সে তাকিয়ে আছে।

সাধুমূর্তি আবার হেসে বললেন, "মায়ী, তোর ঘুমন্ত শরীরে যা স্পর্শ করেছে, তা নগণ্য মাটির ঢেলা নয়। পবিত্র ব্রজরজের পিণ্ড। এর স্পর্শগুণে, আর প্রভু শ্রীনটবরজীর কৃপায় তোর দেহশুদ্ধি হয়ে গেল। এখন থেকে ঠাকুরকে চিন্তন ক'রে, এই পবিত্র রজ দিয়ে রসকলি কাট্‌বি। মহা ভাগ্যবতী তুই, ঠাকুর নিজে তোর জন্য স্থান ক'রে রেখেছেন। এখানে বসে দুর্ভাগিনীর জীবন আর যাপন করিসনে। বেরিয়ে পড় শিগগীর।"

এই অলৌকিক দর্শনের পর আর অযথা কালক্ষেপণ করে নি মালতী। পরদিন ভোরেই বাড়ির পুরোনো এটর্নী মিঃ চৌধুরীকে ডেকে পাঠায়। তাঁর পরামর্শমতো ট্রাস্ট-দলিল সম্পাদন ক'রে সকল কিছু সম্পত্তি লিখে দেয় ঠাকুর শ্রীরাধামাধবের নামে।

এবাড়ির নববধূ হয়ে ঢোকবার পর লক্ষাধিক টাকার সোনা ও হীরে মুক্তার অলংকার সে পেয়েছিল। তাও দিয়ে দেয় জহুরীপাড়ায় বিক্রি করতে।

এবার বাধা দিয়ে ওঠেন এটর্নী চৌধুরী সাহেব, "মা, কোনো সম্পত্তিই তো রাখলেন না। অন্তত এ স্ত্রীধনটুকু আপনার কাছে থাক্‌। নিজের অসুখ বিসুখে বা আর কোনো সংকটেও তো কাজে লাগতে পারে।"

"যাঁর আশ্রয়ে আমি যাচ্ছি, তার মতো ঐশ্বর্য যে কারুরই নেই," হেসে বলে মালতী।

"কোনো ধনী মঠের মোহান্ত বুঝি তিনি ?"

"তিনি নারায়ণ। লক্ষ্মী ঠাকরুণ যে তাঁর বামেই বসে থাকেন রত্ন সিংহাসনে। সেখানে কোন্ লজ্জায় নিজের এই ছেঁদো অলংকার নিয়ে যাবো, বলুন তো ? না এসবে আর আমার কোনো দরকার নেই। বিক্রির টাকাটা দেবত্র তহবিলে জমা ক'রে দিন।" দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দেয় মালতী।

সাত দিনের ভেতর বিলিব্যবস্থা সব সমাপ্ত হয়ে যায়। তারপর শ্রীরাধামাধব জীউ ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন ক'রে, চিরতরে কলকাতা থেকে সে বিদায় নেয়। লক্ষ্যস্থল বৃন্দাবনধাম।

পশ্চিমে তখন প্রচণ্ড শীত চলছে। তাই সে সবার অনুরোধে পরিহিত থান কাপড়ের ওপর একখানা পশমী চাদর জড়িয়ে নেয়। তারপর হাওড়া থেকে উঠে পড়ে পশ্চিমগামী রেলগাড়িতে। মথুরায় এসে যখন পৌঁছায় তখন একটি কপর্দকও তার কাছে নেই। তারপর থেকেই তো মালতীর ভার নিয়েছেন বাবাজী দামোদরদাস আর তাঁর শ্রীবিগ্রহ নটবরজী। কলকাতাতেই ঠাকুর তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তার জন্য স্থান সংরক্ষণ করা আছে বৃন্দাবনধামে। আক্ষরিকভাবে তা সত্য হয়ে উঠেছে। সত্য সত্যই পরম আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে মালতী।

সবিস্তারে নিজের কাহিনী বর্ণনা করার পর বাবাজী দামোদরদাসের দিকে তাকিয়ে করুণ নয়নে প্রশ্ন করে মালতী, "বাবা, এবার আমি কি করবো, আদেশ দিন।"

"যেজন্য ঠাকুর তোকে এনেছেন এখানে, মায়ী, তুই সেই কাজেই ব্রতী হয়ে পড়্।" শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দেন দামোদরদাস।

"বুঝিয়ে বলুন, কি আপনার নির্দেশ।"

"জীবনের যত কিছু সুখ দুঃখের কথা, মায়িক সম্বন্ধের কথা ধীরে

ধীরে তোকে ভুলে যেতে হবে, মায়ী। আর তা আসবে ঠাকুরের সেবাপূজার মধ্য দিয়ে, আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে, ঠাকুর নিজেই তা শিখিয়ে নেবেন। তবে খুব সাবধান, নটবরজী খুব জাগ্রত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যেমনি রসিক চূড়ামণি, রঙ্‌দার, তেমনি পাষাণের মতো কঠিন। জানিস তো, ব্রজের গোপিনীদের নিয়ে রাস যেমন করেছিল, তেমনি কি কাঁদনই না কাঁদিয়েছিল। পাণ্ডবকুল, যত্নকুল শেষটায় কি দুর্ভোগই না ভুগেছে।"

শ্রীবিগ্রহ নটবরজীর সেবা পূজার সমস্ত কিছু ভার বাবাজী এবার অর্পণ করেন মালতীর ওপর। বৈষ্ণবীয় মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাকে ভেক ধারণ করান,—তার নব নামকরণ হয় কুঞ্জদাসী। এই নবীনা বৈষ্ণবী কুঞ্জদাসীই উত্তরকালের ব্রজমণ্ডলের বিহারবনস্থিতা প্রখ্যাত সাধিকা, সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ।

কঠোর নিয়মে বাবাজী বেঁধে দেন কুঞ্জদাসীর দিনচর্যার প্রতিটি কর্ম। বিগ্রহ পূজার খুঁটিনাটি তথ্য সব কিছু তাকে জানিয়ে দেন, আর সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দেন ঠাকুরের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ ও অনুধ্যানের নিগূঢ় পদ্ধতি।

যমুনার জল ছাড়া শ্রীবিগ্রহের কোনো কাজ করার উপায় নেই। শেষরাত্রে, আকাশের গায়ে যখন অন্ধকার থাকে জড়ানো, তারাদল জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে, কুঞ্জদাসীকে তখন একটা বৃহৎ ভাণ্ড ক'রে বার বার পবিত্র যমুনাবারি বহন ক'রে আনতে হয়।

পূজা অর্চনার উপচার সংগ্রহ, আর ভোগরাগ প্রস্তুত করার সমস্ত কিছু দায়িত্বও থাকে তারই ওপর।

বাবাজীর কুঞ্জে আহার সম্পর্কিত কৃচ্ছ্র ছিল অত্যধিক। কুঞ্জে দুগ্ধবতী গাভী ছিল, তা থেকে কিছুটা দুধ পাওয়া যেত, ভক্ত গৃহস্থেরাও ভাঁড়ে ভাঁড়ে ভেট দিতেন দুধ। তা' দিয়ে প্রতিদিন ঠাকুরের জন্য ক্ষীর, ননী সর প্রস্তুত করা হতো। কিন্তু এই সব ভোগের দ্রব্যে কুঞ্জের কারো অধিকার ছিল না। এগুলি পাঠানো হতো নিকটস্থ সাধুদের আখড়ায়।

বিশেষ বিশেষ পূজা পার্বণে বাইরের দু'একজন ধনী ভক্ত প্রচুর ভোগের আয়োজন করতেন। সে-সময়ে দুগ্ধ, দধি, মিষ্টান্ন বাবাজী, চেলাদ্বয় এবং নূতন চেলী কুঞ্জদাসী তার কিছুটা অংশ পেতেন। আবার এই সব বিশেষ ভোগের সূত্রধরেই বাবাজীর গঞ্জনা সইতে হতো শিষ্য নন্দদাস ও মিঠুলালকে। কঠোর ভাষায় বর্ষিত হতে থাকত তাঁর ভর্ৎসনা, "তোরা তো দুধ দই ক্ষীর খাবার লোভেই কুঞ্জে পড়ে আছিস্, বসে বসে পেট মোটা করছিস, এবার তোদের এখান থেকে বিদেয় ক'রে দিয়ে তবে ছাড়বো আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস।"

বাবাজী মহারাজের কথা শুনে চেলারা হেসে ফেলে। বলে, "বাবা, আপনার সম্পত্তির মধ্যে দেখছি চারটে গরু। আবার তাদের দুটোই বুড়ো। ওগুলোর খড় বিচালীর যোগান দিতে গিয়ে আমাদের প্রাণান্ত। রাজরাজড়া, ধনী শেঠদের আপনি কুঞ্জের ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না। আপনার দু'একজন চিহ্নিত ধনী ভক্ত কিছু কিছু ভেট দিয়ে যায় নটবরজীকে, তার ফলে মাঝে মাঝে মণ্ডা মেঠাইর দর্শন পাই। আমাদের নিত্যকার প্রয়োজনের জন্য দুধ দই মাখনের ব্যবস্থা এখানে কই? আর এসবে আমাদের দরকারও নেই। আপনার কৃপার জন্য এখানে পড়ে আছি, দেখবেন সেটি যেন পাই।"

বাবাজী মুখ ঘুরিয়ে চলে যান, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করতে থাকেন, "যত সব বাঁদর এসে জুটেছে, এ কুঞ্জে। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—কেবল জানে কথার ফুলঝুরি ওড়াতে।"

বাবাজী দামোদরদাসের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজায় প্রাণমন ঢেলে দেয় কুঞ্জদাসী। তার এই কৃচ্ছ্রময়, ত্যাগ বৈরাগ্যময়, বৈষ্ণবীয় সাধনা চলতে থাকে দিনের পর দিন। এভাবে অতিক্রান্ত হয় প্রায় পাঁচ বৎসর।

এবার সাধনজীবনের চক্রবালে দেখা দেয় কৃষ্ণকৃপার জ্যোতিঃছটা। কৃষ্ণভাবনা আর সাত্ত্বিক প্রেমবিকার কুঞ্জদাসীর দেহমনপ্রাণ ধীরে ধীরে অধিকার ক'রে বসতে থাকে।

গুরু দামোদরদাস বাবাজী সেদিন শিষ্যাকে ডেকে বলেন, "মা, তোর সাধনার ভিত্তি এবার দৃঢ় হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণকৃপার উন্মেষও দেখা দিয়েছে। নটবরজীর কুঞ্জে আর তোর থাক্‌বার দরকার নেই। এবার চলে যেতে হবে ব্রজমণ্ডলের কোনো পবিত্র অরণ্যে। যাবার আগে আমি তোকে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা দেবো। আর একটা নূতন স্তরের সাধনজীবন শুরু হবে তোর।"

বাবাজী একাধারে কুঞ্জদাসীর আশ্রয়দাতা, পিতা, স্নেহময় গুরু। তাঁকে এবার ছেড়ে যেতে হবে শুনে তার শিরে যেন অতর্কিতে নেমে আসে বজ্রাঘাত। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় চোখ দুটি অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। যুক্তকরে নিবেদন করে, "বাবা, অকূল পাথারে যখন ভেসে যাচ্ছিলাম, কৃপা ক'রে তখন তুমি আমায় বাঁচিয়েছো, আশ্রয় দিয়েছো। এবার সেই কাঙালিনীকে আর কেন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছো, বনবাসে যেতে বলছো? তোমার পায়ে মিনতি জানাই, প্রভু নটবরজী আর কিশোরীজীর সেবা পূজায় আমায় রত থাক্‌তে দাও। তোমার চরণ নিত্যদর্শনের সৌভাগ্য দাও।"

"তা হয় না, মায়ী,"--নিজের অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্তের কথাটি জানিয়ে দেন দামোদরদাস বাবাজী। "কৃষ্ণ-ভাবনায় তুই যে একেবারে ডুবে গিয়েছিস্। শুভ সংস্কার ছিল, তাই তো এমনভাবে ডুবতে পেরেছিস্। এবার রাধাকৃষ্ণের লীলাময় সম্ভোগের পর্ব। এ পর্ব বড় কঠিন রে মায়ী। এজন্য আরো তীব্র বৈরাগ্য, আরো সাধন চাই। বেশ কিছুদিন একান্তে অরণ্যবাস চাই। এক বিন্দু আসক্তি, কাম বা ভোগেচ্ছা থাক্‌লে এ দিব্য রসসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যে সম্ভব নয়। তোকে এবার জনমানবহীন কোনো অরণ্যে গিয়ে তপস্যা করতে হবে। ঠাকুর নটবরজীর নির্দেশ আমি পেয়েছি, তাই এর আর নড়চড় হবার যো নেই, মায়ী। তবে যাবার আগে আমি তোকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেবো। কোথায় কোন্ অরণ্যে গিয়ে ঝুপড়ি বেঁধে বসবি, সিদ্ধি লাভ করবি, তাও যে ঠাকুরজী আগে থেকেই নির্ধারিত ক'রে রেখেছেন।"

নবীন শিষ্যাকে বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস দিলেন দামোদরদাস। এবার তার নামকরণ হলো, পরমেশ্বরী দাসী। প্রসন্নতায় গুরুর মনপ্রাণ ভরে উঠেছে। স্থির করলেন, এ উপলক্ষে একটা ছোটখাটো ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করাবেন।

বাবাজীর এ মনোভাব অবগত হয়ে মথুরার কয়েকটি ভক্ত শেঠ সানন্দে সেদিন এগিয়ে আসেন, প্রেরণ করেন প্রচুর পরিমাণ আটা, ঘি, চিনি। বৃন্দাবনের বিভিন্ন কুঞ্জের প্রাচীন সাধু বৈষ্ণবদের আমন্ত্রণ ক'রে এনে সন্তোষ সহকারে ভোজন করানো হয়।

বিদায়ের কালে তপস্যার স্থানটিও নির্দেশ ক'রে দেন বাবাজী। বলেন, "মায়ী, তুই এবার বিহার বনে ঝুপড়ি বেঁধে বসে পড়্। প্রাচীন যুগে এ বন ছিল রাধাকৃষ্ণের বিহারের পুণ্যস্থলী। বৃন্দাবন আর গোবর্ধনের মাঝ রাস্তায় পড়ে এই দুর্গম বন। প্রয়োজন হলে বছরে দু'একবার আমি ওখানে গিয়ে তোকে দেখে আসতে পারবো। ও বন ছেড়ে, নিজের তপস্যা ছেড়ে, তুই অপর কোথাও যেন যাসনে।

"কিন্তু দিদির মাধুকরী কি ক'রে চলবে?" পাশে থেকে প্রশ্ন করে চেলা নন্দদাস।

"সে নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, সে ব্যবস্থা কৃপালু ঠাকুর নটবরজী যে আগে থেকেই ক'রে রেখেছেন," উত্তর দেন দামোদরদাস। তারপর শিষ্যা পরমেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দেন, "শোন্ মা, কোনো ভাবনা নেই তোর। বিহারবনের কিছুটা দূরে রয়েছে রাস-গাঁও। বেশ সঙ্গতিপন্ন গাঁও। ওখানে আমার কিছু ভক্ত ও সজ্জন রয়েছে, তারা তোকে দেখবে।"

বিহার বনের অভ্যন্তরে, এক তমাল গাছের নিচে, শুক্নো লতা-পাতা দিয়ে এক ঝুপড়ি বাঁধেন পরমেশ্বরী দাসী। এই ঝুপড়িটিই হয় একাধারে তাঁর ভজনকুটির ও শয়নের স্থান। এবার গুরুর নির্দেশ মতো শুরু করেন এক নূতনতর কৃচ্ছ্রময় জীবন এবং ধ্যান ভজনের তীব্র তপস্যা।

সারা দিন রাতের অধিকাংশ সময়ই পরমেশ্বরী ধ্যান জপ ও ভজনে কাটাতেন। আহার ছিল দিনান্তে শুধু একবার। ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করার পর শরীর রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ তিনি গ্রহণ করতেন। মাধুকরীর জন্য পরমেশ্বরী বনের বাইরে যাবেন না, জনমানবহীন গহন বনে আটা ময়দা নুন জোটানোও সম্ভব নয়, তাই কিছুদিন ফলমূল সংগ্রহ করেই ঠাকুরের ভোগ দিতে থাকলেন।

সমস্যা দেখা দিল নিত্যকার স্নানের ব্যাপারে। বিহার বনে কোনো জলাশয় নেই, রয়েছে শুধু একটি পুরাতন কূয়ো। এ কূয়োর জল অতিশয় লোনা। স্নান হয়তো কোনোমতে সারা যায়, কিন্তু পানীয় হিসাবে তা ব্যবহার করা অসম্ভব। গুরুর কৃপায় এ সমস্যার সমাধানও অচিরে হয়ে গেল।

সেদিন গভীর বনের ভেতর ঘুরে ঘুরে পরমেশ্বরী ঠাকুরের ভোগের জন্য ফলমূল ও কন্দ সংগ্রহ করছেন, এমন সময়ে এক কাঠুরের সঙ্গে তাঁর দেখা। নাম তার ভিখনলাল।

প্রতিদিন বনের গহন অঞ্চল থেকে রাশি রাশি কাঠ কেটে নিয়ে সে বাজারে যায়, এগুলো বিক্রি করে যা উপার্জন হয়, তাই দিয়ে তার সংসার চলে। দূর থেকে গৈরিক বসন-পরা অপরূপ রূপসী পরমেশ্বরী দাসীকে দর্শন ক'রে ভিখনলাল থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকে, 'এ মায়ী কি কোনো বনদেবী? এমন সৌন্দর্য, এমন দিব্য ভাব তো সচরাচর মানুষের চক্ষে পড়ে না।'

সামনে এগিয়ে এসে ভিখনলাল ভক্তিভরে নিবেদন করে তার দণ্ডবৎ প্রণাম।

আশীর্বাদ জানিয়ে এই সরলস্বভাব কাঠুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-সালাপ করেন পরমেশ্বরী। কথা প্রসঙ্গে ভিখনলাল তাঁকে প্রশ্ন করে, "মায়ী, এই গভীর বনে বাস ক'রে তুমি ভগবানকে ডাক্‌ছো, ভাল কথা। খাবার ব্যবস্থা হয়তো ফলমূল থেকেই হয়ে যায়। কিন্তু তুমি জল পাও কোথায়? এখানে কোনো তালাও নেই, আছে শুধু

একটা লোনা জলের কূয়ো। তার জল তো কেউ খেতে পারে না। এভাবে এখানে বাঁচবে কি ক'রে?"

"বেটা, মানুষের সমাজ ছেড়ে, এখানে কিষণজীর চরণ আশ্রয় ক'রে আছি। তিনি তো অন্ধ নন, কালাও নন। ব্যবস্থা একটা কিছু করবেনই।" সহাস্যে উত্তর দেন পরমেশ্বরী।

ভিখনলাল নিজ থেকেই বলে ওঠে, "কুছ পরোয়া নেই, মায়ী। আমি তো হর্ রোজ এ বনে কাঠ কাট্‌তে আসি। বরং এখন থেকে গাঁও থেকে বেরুবার সময় মাথায় ক'রে তোমার জন্যে এক কলসী তালাওর মিঠা জল নিয়ে আসবো। এতে মায়ী তুমি আপত্তি ক'রো না। আমি তোমার লেড়কা তো বটে।"

পরমেশ্বরীকে রাজী হতে হয় এ প্রস্তাবে। এখন থেকে এই দরিদ্র কাঠুরে ভিখনলাল পরিণত হয় তাঁর এক ভক্তরূপে।

ইতিমধ্যে গুরু দামোদরদাস বাবাজী রাস-গাঁয়ে, তাঁর ভক্ত ও পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে, পরমেশ্বরীর সংবাদ পাঠিয়েছেন। এবার তারাও মাঝে মাঝে আসতে থাকে তার তপস্যার স্থানে, ভক্তিভরে ঝুপড়িতে রেখে আসে দু'এক সের আটা নুন। এর ফলে ঠাকুরের ভোগ আর পরমেশ্বরী দাসীর আহার তৈরির সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে আসে।

গুরু মাঝে মাঝে বিহারবনে নবীনা সন্ন্যাসিনীর ঝুপড়িতে এসে উপস্থিত হন। কখনো আসেন তিনি শিষ্যার নিজ প্রয়োজনে, তার তপস্যার আগুনকে উস্‌কে দিতে। কখনো বা আসেন নূতনতর নিগূঢ় সাধন সেবার জন্য। বৎসরে কয়েকবার পবিত্র গোবর্ধন পর্বত তিনি পরিক্রমা করেন, সে সময়েও কৃপা ক'রে একান্তে ভজনরত পরমেশ্বরী দাসীকে দর্শন দিয়ে যান। গুরুর দর্শন ও কৃপা লাভে শিষ্যার মনপ্রাণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

পরমেশ্বরী দাসীর অরণ্য-জীবনের এই কঠোর বৈষ্ণবীয় তপস্যার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলে দশ বৎসরেরও অধিক কাল।

অতঃপর গুরু দামোদরদাস বাবাজী একদিন কয়েকজন ভক্ত ও চেলা সঙ্গে নিয়ে বিহারবনে পরমেশ্বরী দাসীর ঝুপড়ির সম্মুখে এসে উপস্থিত হন। চোখ-মুখ তাঁর দিব্য আনন্দের বিভায় ঝলমল করছে। গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই শিষ্যাকে প্রশ্ন করেন তিনি, "কি গো মায়ী, কুশলে আছিস তো? এবার তোর তপস্যার কথা আমায় বল্ দেখি।"

যুক্তকরে পরমেশ্বরী নিবেদন করে, "বাবা, আপনি অন্তর্যামী সবই তো জানেন। আপনার কৃপায় ভালই আছি। পরম আনন্দে রয়েছি বৈকি।" আপ্তকামা বৈষ্ণবীর দেহ রোমাঞ্চিত, কপোল বেয়ে ঝরে পড়ছে পুলকের অশ্রু।

"আমি জানি, মায়ী, প্রেমসিদ্ধা হয়েছিস তুই। রাধাকৃষ্ণের চিন্ময় লীলারস ভুঞ্জনের বিরল সৌভাগ্য তোর হয়েছে। এবার থেকে শ্রীশ্রীনন্দলাল আর কিশোরীজীর নিত্যলীলার আরো অন্তরঙ্গ, আরো নিগূঢ় স্তরগুলি একে একে ফুটে উঠতে থাকবে তোর মানসলোকে। তারপর লীলাময় করবেন তোকে আত্মসাৎ।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলেন বাবাজী, "এবার আমায়ও তুই বিদায় দে, মা। গিরিগোবর্ধনের দিকে যাচ্ছি, এবার আমার শেষ পরিক্রমা। তারপর বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে শ্রীনটবরজীর সামনে এ দেহের খোলাটাকে ফেলে দেবো।"

আসন্ন গুরু বিচ্ছেদের শোক-উচ্ছ্বাস উত্তাল হয়ে ওঠে পরমেশ্বরী দাসীর দেহে মনে। ডুকরে কেঁদে ওঠেন তিনি, আছাড় খেয়ে পড়ে যান তাঁর চরণতলে।

খানিক বাদে শিষ্যা কিছুটা শান্ত হয়ে এলে, বাবাজী ধীর কণ্ঠে বলেন, "মায়ী, এই নির্জন অরণ্যে, তপস্যার অগ্নিদাহের মধ্যে আমি তোকে এতকাল রক্ষা ক'রে এসেছি। এখন থেকে আর তার কোনো প্রয়োজন নেই। কঠোর সাধনার ফলে সিদ্ধি তোর করায়ত্ত হয়েছে, প্রভুজীর নিত্যলীলা স্ফুরিত হয়ে উঠেছে তোর ভেতরে। এখন থেকে তুই নিজেই নিজেকে রক্ষা করবি, শুধু তাই নয়, যে সব

ভক্ত ও আশ্রিতেরা তোর কাছে শরণ নেবে, তাদেরও রক্ষা করবি। মায়ী, সিদ্ধি পেলে, সিদ্ধিজাত কল্যাণধারা সমাজের মানুষকেও কিছু দিতে হয়।"

এবার বিদায় নিয়ে সদলবলে দামোদরবাবাজী রওনা হলেন গিরিগোবর্ধনের পথে। বিষাদখিন্ন হৃদয়ে, অপসৃয়মান গুরুর দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন শিষ্যা পরমেশ্বরী।

গত দশ বৎসরেই এই একান্তবাসিনী বৈষ্ণবী তপস্বিনীর তপস্যার মৃদু আলোকচ্ছটা চারদিকের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব সাধু-সন্তেরা তাঁকে মেনে নিয়েছেন উচ্চকোটির সাধিকারূপে। ব্রজ-বাসীদের অনেকেই তাঁকে দেখতে শুরু করেছে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে। তারা বুঝতে পেরেছে—ইনি শক্তিমতী সাধিকা, এঁর কাছে শরণ নিলে কল্যাণ হয়। এবার বহুলখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা দামোদরদাস বাবাজী এই মায়ীকে সিদ্ধা বলে ঘোষণা করার পর কারুর মনে তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রইলো না।

অতঃপর বিহারবনে, তাঁর কাছে এখন থেকে আর্ত ও মুমুক্ষুদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ বলে আশেপাশের গ্রামগুলোতে তিনি অভিহিত হতে থাকেন।

কোনো কিছু সংকট বা সমস্যা উপস্থিত হলেই ভক্তেরা, গ্রাম্য নরনারীরা এই সিদ্ধা বাঈ'র কাছে ছুটে আসে। তাঁর আশীর্বাদ বা পরামর্শ গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়। সিদ্ধা বাঈ বাস করেন একটি লতাপাতার ঝুপড়িতে, এই অপরিসর স্থানে আগন্তুক ও অভ্যাগতদের কষ্ট হয়। তাই রাসগ্রামের কয়েকটি ভক্ত গৃহস্থ মিলে তাঁর জন্য বনের মধ্যে একটি কুটির নির্মাণ ক'রে দিতে আগ্রহী হন। কিন্তু ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ সিদ্ধা বাঈকে এ প্রস্তাবে রাজী করানো কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে সবার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি সম্মতি দেন, ঝুপড়ির পাশে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটির নির্মিত হয়।

অসামান্য প্রেমভক্তি এবং বৈষ্ণবীর সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন সিদ্ধা

তিনি। পরমেশ্বরী বাঈ, কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিরল সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। কন্তু তবুও তাঁর সাধন জীবনের নিত্যকার কৃচ্ছ্র, ধ্যান-ভজন ও জপতপ কোনোদিন তিনি ব্যাহত হতে দেন নি।

তাঁর নিত্যকার নিয়ম ছিল লৌহ নিগড়ে বাঁধা, কোনোদিক দিয়ে তার এতটুকু নড়চড় হবার উপায় ছিল না। গুরু দামোদর বাবাজীর নির্দেশ ছিল, বিহারবনে অবস্থান ক'রে কঠোর তপস্যায় তিনি ব্রতী হবেন। এ নির্দেশ সিদ্ধা বাঈ নিষ্ঠা সহকারে পালন করেছিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে এই শ্বাপদসঙ্কুল প্রাচীন গহন অরণ্যে তিনি বসবাস করতে আসেন, এবং এখানে অতিবাহিত করেন পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল। অথচ এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই অরণ্য অঞ্চলের বাইরে কোথাও তিনি যান নি।

শুধু তাই নয়, এই তপস্বিনী তাঁর আরণ্যক জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভজন কুটিরের বাইরে গিয়ে কোনোদিন মাধুকরীও করেন নি। গুরুর আজ্ঞায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আকাশবৃত্তির। এই বৃত্তিকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন তিনি শেষের দিন অবধি।

সিদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত হবার পর থেকে রাস, গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু ভক্ত ও তীর্থযাত্রী সিদ্ধা বাঈকে দর্শন করতে আসতেন। নিকট প্রতিবেশী গ্রামের যে সব ভক্ত ও সজ্জন তাঁর কাছে আসা যাওয়া করতেন, তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু তাঁরা সবাই সিদ্ধা বাঈর কাছে আসতেন দিনের বেলায়। সন্ধ্যের পর তাঁর ভজন কুটিরের সান্নিধ্যে কারো আসার অনুমতি ছিল না। ভজন কুটিরের চতুর্দিকে নিজ হাতে একটি মন্ত্রপূত গণ্ডী কেটে দিয়েছিলেন সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা জানতেন, ঐ বেষ্টনরেখার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শুধু অনভিপ্রেত নয়, একেবারে নিষিদ্ধ।

একটি কৌতূহলী ভক্ত একবার সিদ্ধা বাঈকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, মায়ী, যদি কেউ তোমার নিষেধ না মেনে তোমার ঐ গণ্ডী পেরোতে চেষ্টা করে, তবে তার ফল কি হবে?"

সংক্ষেপে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেন, "বেটা, ফলাফলের কথা অবান্তর। তবে এটা ঠিক, এ গণ্ডী ডিঙোবে, এমন সাধ্য কোনো মানুষের নেই, সে যত দুষ্টই হোক, বা যত বড় তপস্বীই হোক্।"

সিদ্ধা বাঈর ভজন নিষ্ঠা ও অলৌকিক শক্তির কাহিনী ক্রমে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সরল প্রকৃতির জাঠ কৃষকেরা, গোপ-গোপিনীরা অতঃপর দলে দলে তাঁকে দর্শন করতে আসতো। প্রণাম নিবেদন করার আগেই তাদের মনের কথা, সমস্যার কথা, অনুধাবন করতেন সিদ্ধা বাঈ। কল্যাণময়ী জননীর মতো আশ্রয় দিতেন তাদের, যথাসম্ভব করতেন সঙ্কট মোচন। বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলেরই এসময়ে ধারণা জন্মে গিয়েছিল, সিদ্ধা বাঈর কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ালে, তাঁর শরণ নিলে, সুরাহা একটা কিছু হবেই।

এ সময়ে বৃন্দাবনের এবং সারা ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সাধু-সন্তদের স্বীকৃতিও পরমেশ্বরী বাঈ লাভ করেন। বিশেষ ক'রে গোবর্ধন পরিক্রমাকারী সাধুদের অনেকে দলে দলে বিহারবনে এসে এই ত্যাগ তিতিক্ষাময়ী সাধিকাকে দর্শন ক'রে যেতেন।

ব্যবহারিক জীবনে সিদ্ধা বাঈ সকল কিছু চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে ছিলেন। ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভজন কুটির দ্বারে প্রচুর ভেট নিবেদিত হতে থাকে। এসব বস্তু দর্শনার্থী ও দুস্থ নরনারীদের তৎক্ষণাৎ বিতরণ করা হতো। এই বিতরণের ভার ছিল সিদ্ধাবাঈর প্রিয় ভক্ত ভিখনলালের ওপর। ভিখনের ওপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, কোনো বস্তুই তা যত মহার্ঘই হোক, সঞ্চয় করা হবে না এবং ভজন কুটিরেও সে সব কখনো রাখা যাবে না। কোনো দিনই এ কঠোর নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নি।

একবার পবিত্র গোবর্ধন গিরি পরিক্রমা ক'রে শতাধিক দরিদ্র তীর্থযাত্রী সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈকে দর্শন করতে আসে। দর্শনার্থীরা রোদে দীর্ঘপথ তেতে পুড়ে এসেছে, দেহ মন তাদের একেবারে অবসন্ন।

সিদ্ধা বাঈর কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত তখন সেখানে উপস্থিত। সমাগত গরীব দর্শনার্থীরা বহু দূর হতে এসেছে, সবাই পথশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত, তাই এদের জন্য আহার্য যোগাড়ের জন্য ঐ ভক্তেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ বললেন, "মায়ীর ভজন কুটিরে একমুঠো আটা বা ফলমূল সঞ্চিত নেই। তা হলে এতগুলো মানুষ কি এমনি ক'রে খিদেয় কষ্ট পাবে? বরং এদের সবাইকে রাসগাঁয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্। সেখানকার গৃহস্থদের অনেকে মায়ীকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। যা হোক একটা ব্যবস্থা তারা করবে।"

পরমেশ্বরী বাঈর কানে কথাটা গেল। তিনি বললেন, "তোমরা বাপু, ব্যস্ত হয়ো না। ওদের সবাইকে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বলো। ঠাকুর শ্রীনটবরজী কৃপা ক'রে কিছু খাবার এখনি পাঠাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"

খানিক বাদেই কিন্তু তাঁর একথার সত্যতা উপলব্ধি করা গেল। মথুরার এক শেঠ সেদিন গোবর্ধন দর্শনে এসেছিলেন। তিনি ঠাকুরজীর প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, 'সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ আমার অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাঁকে দর্শন ক'রে নয়ন মন সার্থক কর্, আর বাঈর ওখানে একটা ভাণ্ডারা দে।' এই আদেশ অনুযায়ী দু'গাড়ী বোঝাই ক'রে পুরি, লাড্ডু, প্যাঁড়া তিনি নিয়ে এসেছেন। এই ভাণ্ডারাকে উপলক্ষ ক'রে সেদিন বিহারবনে এক আনন্দের হাট বসে গেল। এতগুলো দর্শনার্থীকে কি দিয়ে ভোজন করানো যাবে, একথা ভেবে যে ভক্তেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

বর্ষীয়ান্ এবং ত্যাগ তিতিক্ষাবান্ সাধু, প্রখ্যাত অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ এক সময়ে সিদ্ধা বাঈর পবিত্র ভজন কুটিরে বসে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। তাঁর মুখে বাঈর সাধন ঐশ্বর্যের নানা কাহিনী ব্রজমণ্ডলের তীর্থযাত্রীরা অনেক সময় শুনতে পেতেন। মনীষী লেখক ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অনন্তদাসজীর কাছ থেকে শোনা একটি আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন[১]:

১ সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ, উজ্জীবন, বৈশাখ, ১৩৭৫

"একবার একজন ব্রজবাসী দেখা করিতে আসিয়া যতবার উঠিতে যান, ততবারই বাঈ তাঁহাকে আরও দেরীতে যাইবার জন্য অনুরোধ জানান। শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি জানাইল যে, তাহার খুব দরকারী কাজ আছে, সে আর দেরী করিতে পারিবে না, সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

"কিন্তু কিছুটা পথ যাইতে না যাইতেই সে সর্পদংশনে কাতর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। লোকে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাঈ-এর নিকট লইয়া আসিল। তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম যে, লোকটি কোন গুরুতর দুর্ঘটনায় বিপন্ন হবে, তাই তাকে বার বার যেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু দৈবের গতি প্রবল, তা রোধ করা দুষ্কর।'

"লোকটির সঙ্গীরা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় বাঈ তাঁহার ধুনুচির ভস্ম হাতে লইয়া তাহার গায়ে ঘষিয়া দিলেন। সে অনতিবিলম্বে সুস্থ হইয়া উঠিল।"

সুদাম চৌধুরী রাস গ্রামের একজন বড় জোতদার। ধনসম্পত্তি প্রচুর, কিন্তু তবুও তার এবং তার স্ত্রীর মনে কোনো সুখ নেই। স্ত্রীর বয়স পঞ্চান্ন পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এযাবৎ কোনো সন্তানাদি হয় নি।

চৌধুরী অনেক সাধু-সন্তের কাছে ধর্না দিয়েছে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার স্ত্রীও ব্রত উপবাস এযাবৎ কম করে নি। কিন্তু দম্পতি এখনো অপুত্রক।

সিদ্ধা বাঈর কৃপায় স্থানীয় অঞ্চলের বহু নরনারী নানা সংকট থেকে ত্রাণ পেয়েছে। বাক্‌সিদ্ধা সাধিকা রূপে, রাধাকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত উচ্চকোটির তপস্বিনী রূপে, এ সময়ে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। অনন্যোপায় হয়ে চৌধুরী ও তার স্ত্রী একদিন তাঁর ভজনকুটিরে এসে উপস্থিত।

প্রণাম ক'রে, দৈন্যভরে চৌধুরী খেদ জানায়, "মায়ী, তোমার কৃপায় কত লোক দুঃখ বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের মতো দুঃখীদের ওপর তোমার কোনো নজর নেই। সারা জীবন কষ্ট ক'রে এত বিষয় আশয় করেছি, কিন্তু তা কে ভোগ করবে? তাছাড়া,

বয়স হয়েছে, মৃত্যুর পর কেউ পিণ্ডদান ক'রে উদ্ধার করবে, এমন একটা ছেলেও নেই। তুমি আমার স্ত্রীকে আশীর্বাদ করো, একটি পুত্র সন্তান তার হোক।"

প্রশ্ন ক'রে সিদ্ধাবাঈ জানলেন, চৌধুরীর স্ত্রীর বয়স পঞ্চান্ন বছর পেরিয়ে গেছে। বললেন, "তাই তো, মায়ীর বয়স বেশী হয়ে গিয়েছে। এ বয়সে তো সন্তান হবার কোনো আশা দেখ্‌ছিনে।"

কাতর কণ্ঠে চৌধুরী মিনতি জানায়, "মায়ী, আমরা তোমার কৃপার জন্য এসেছি, তোমার চরণে আশ্রয় নিচ্ছি। এর যা হোক্ কিছু একটা বিহিত তুমি করো, আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

এবার কঠোর স্বরে বলে ওঠেন সিদ্ধাবাঈ, "কত পাপ এযাবৎ তুই করেছিস, তার হিসেব রাখিস্? ছলে বলে কৌশলে লোকের জোত জমি, বাড়ি ঘর দখল ক'রে পয়সা জমিয়েছিস। তার ওপর চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে গরীবের রক্ত শুষে নিচ্ছিস। কিষণজী আর রাধারানীজী তোর ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন?"

চৌধুরী আর তার পত্নী হুমড়ি খেয়ে সিদ্ধাবাঈর চরণতলে পতিত হয়, বার বার করতে থাকে তাঁর করুণা ভিক্ষা।

সিদ্ধা বাঈ কোমল হয়ে ওঠেন, বলেন, "শোন চৌধুরী, তোমার স্ত্রী তোমার মতো দুষ্ট নয়, সে ভক্তিমতী। সদাচার ও পূজা অর্চনায় তার মন আছে। তার দিকে তাকিয়ে, আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছি। বেশ, আমি বলছি, তোমার একটি পুত্রলাভ হবে। কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে, আর তুমি গরীবের ওপর জুলুম করবে না, পাপাচারের দিকে ঝুঁকবে না।"

চৌধুরী যুক্তকরে জানায়, কোনো মতেই আর সে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করবে না। মায়ী যেন তাঁর প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি রাখেন।

ধুনুচি থেকে কিছুটা ভস্ম তুলে নিয়ে চৌধুরী পত্নীকে খেতে দিলেন সিদ্ধা বাঈ। তারপর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, "শোন, কিষণজীর কৃপায় একটি পুত্র তোমরা লাভ করবে। সে হবে সাত্ত্বিক স্বভাবের কিন্তু তোমায় বাবা সাবধান ক'রে দিচ্ছি,

আবার তুমি পাপে লিপ্ত হলে, এ ছেলে কিন্তু বাঁচবে না। পাপীর ঘরে মোটা শ্বাস হয়, সেখানে সাত্ত্বিকী ছেলে সহজে দম নিতে পারে না, একটা অসুখ-বিসুখ উপলক্ষ ক'রে দেহের খোলস ছেড়ে দেয়।"

ভক্তিভরে পরমেশ্বরী বাঈর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে চৌধুরী ও তার স্ত্রী রাসগাঁয়ে প্রত্যাবর্তন করে। সানন্দে সবাইকে জানাতে থাকে মায়ের আশীর্বাদের কথা।

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসে, বলে, "এ বয়সে কি আর মেয়েদের সন্তান হয়? যাহোক্, চৌধুরীর স্ত্রীটা ভালো মানুষ। একটা আশা নিয়ে কিছুদিনের জন্য তো মনের আনন্দে থাক্‌তে পারবে।"

কিন্তু দেখা যায়, বৎসরখানেক বাদে চৌধুরী-পত্নীর অঙ্কে এসে উপস্থিত হয় একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান।

উইলিয়াম ফক্‌নার নামে এক সাহেব সেবার মথুরায় বেড়াতে এসেছেন। অতিথি হয়েছেন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে। সাহেবটি বয়সে তরুণ। স্থাপত্য ও কারুকলা দেখে বেড়ানোর শখ আছে। তাছাড়া, পাখি শিকারের নেশাও তাঁর যথেষ্ট। মথুরার পুরাকীর্তিগুলো ঘুরে দেখার পর বেড়াতে চলেছেন গোবর্ধন পাহাড়ের দিকে। আশেপাশে কয়েকটা বিস্তৃত জঙ্গল রয়েছে। সেখানে পাখি শিকার করার ইচ্ছে আছে সাহেবের।

কুলীরা আগেভাগে তাঁবু এবং রসুইখানার জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হয়ে এসেছে। তাঁবু খাটিয়েছে রাসগাঁয়ের সীমান্তে। পরদিন দু'জন শিকারে উৎসাহী ভারতীয় সঙ্গী নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত।

কাছেই বিহারবনের গভীর জঙ্গল। সকালে প্রাতরাশ সেরেই ফক্‌নার রাইফেল হস্তে সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন শিকারের সন্ধানে। রাসগাঁয়ের একদল মানুষ কৌতূহলী হয়ে চলেন তাঁদের পিছে পিছে।

বনের গহন অঞ্চলে ঢোকবার সময়ই সম্মুখে দেখা যায় সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ'র ভজনকুটির।

স্থানীয় লোকদের ভেতর ইতিমধ্যে একটা প্রথা গড়ে উঠেছে, যখনি তাদের কেউ সিদ্ধা বাঈর ঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, সোল্লাসে তারা ধ্বনি দেয়—পরমেশ্বরী বাঈ কি জয়। তাঁদের বিশ্বাস, সিদ্ধা বাঈর কানে এ জয়ধ্বনি একবার প্রবেশ করলে বনের সাপ বাঘ তাদের আক্রমণ করবে না, যে কোনো আপদ বিপদের হাত থেকে তারা উদ্ধার পাবে।

স্থানীয় লোকদের এই ধ্বনি কানে যেতেই শিকারী উইলিয়াম ফক্‌নার উচ্চকিত হয়ে ওঠেন। কৌতূহলভরে এ সম্বন্ধে গ্রাম্য লোকদের করেন জিজ্ঞাসাবাদ।

তারা উত্তরে বলে, "সাহেব, আমাদের সিদ্ধা মাতাজী এখানে ভগবানের ভজন করেন, ভগবানের নেশায় সদাই থাকেন মশগুল। নানা অলৌকিক শক্তি আছে এঁর। এখানকার গাঁয়ের লোকেরা সবাই তা জানে। এর জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা নির্ভয়ে জঙ্গলে ঢুকি।"

এ কথায় ফক্‌নারের ওষ্ঠাধরে ফুটে ওঠে বিদ্রূপের হাসি। বলেন, "তা তোমাদের এই মেয়ে সাধুটি কোথায়? মাথায় জটা আছে? খুব বুড়্‌ঢা নাকি?"

বলতে বলতেই ভজনকুটিরের ঝাঁপ খুলে আঙিনায় এসে দাঁড়ান সিদ্ধা বাঈ।

গ্রামের লোকেরা ভক্তিভরে করজোড়ে তাঁকে নমস্কার করছে। উইলিয়াম ফক্‌নার অবাক্‌ বিস্ময়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। তপস্বিনী বৃদ্ধা নন, তরুণী। শুধু তরুণী নন, রূপসী। কাঁচা সোনার মতো বর্ণ তাঁর। গৈরিক বসনে জড়িত দেহের লাবণ্যধারা যেন উপ্‌চে পড়ছে। চোখ মুখ আনন্দের আভায় করছে ঝলমল। আলুলায়িত কেশরাশির মধ্যবর্তী শ্রীমণ্ডিত ঐ মুখখানি থেকে নয়ন ফেরানো যায় না।

প্রাঙ্গণ থেকে কিছুটা এগিয়ে আসেন সিদ্ধা বাঈ, শান্ত মধুর কণ্ঠে

গ্রামের লোকদের প্রশ্ন করেন, "বেটা, তোমরা এত সোর্‌গোল ক'রে বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যাচ্ছো ?"

"মায়ী, এ সাহেব আর তাঁর সঙ্গীরা মথুরা থেকে এসেছেন। বিহারবনে পাখি শিকার করবেন। ঐ যে হাতে বন্দুক দেখছেন না।" উৎসাহ ভরে উত্তর দেয় এক পরিচিত ব্যক্তি।

"তা বেটা, শুধু শুধু নির্দোষ পাখিগুলোকে ওরা মারবে কেন বলতে পারো ? না, না, এখানে ওসব খুন জখম করা ঠিক নয়।" নিরুত্তাপভাবে কথা কয়টি বলে সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ প্রবেশ করলেন তাঁর ভজন কুটিরে।

বাঈর রূপ-লাবণ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গিয়েছেন উইলিয়াম ফক্‌নার। সে বিস্ময়ের ঘোর তার তখনো কাটে নি। সিদ্ধা বাঈর সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের যেসব কথাবার্তা হলো, তার এক বর্ণও সাহেবের কানে পোঁছায় নি।

এবার সঙ্গীদের মুখে বাঈর কথার মর্ম শুনে সাহেব হেসে ওঠেন হো-হো ক'রে। বলেন, "চলে এসো তোমরা আমার সঙ্গে ; বাজে কথায় আর সময় নষ্ট কর়ো না।" তারপর সবাইকে নিয়ে শিকারের উৎসাহে ঢুকে পড়েন গভীর জঙ্গলে।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বহুক্ষণ ছুটাছুটি ক'রে সবাই গলদ্‌ঘর্ম হলেন বটে, কিন্তু একটা পাখিও শিকার করা গেল না। গ্রামের লোকেরা জানালো, পাখির কাকলীতে এ বন তো সর্বদাই মুখরিত হয়ে থাকে, অথচ আজ আশেপাশে কোনো পাখিই দেখা যাচ্ছে না। শিকারীদের ভ্যাবাচ্যাকা লাগাবার জন্যই যেন তারা জোটবদ্ধ হয়ে সারা বন থেকে সরে পড়েছে।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বন থেকে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধা বাঈর পর্ণকুটিরের পাশ দিয়ে যাবার কালে গ্রামের লোকেরা পূর্ববৎ তাঁর জয়ধ্বনি দিত থাকে। বাঈ আঙিনায় এসে দাঁড়ান, কৌতুকের সুরে বলেন, "কিরে তোদের শিকার কিছু মিললো আজ ?"

"না মায়ী। শিকার কোথায় ? সব চিড়িয়া পালিয়ে গেছে।"

"তা তো হবেই। এখানে প্রেমের রাজত্ব, খুন জখম তো চলবে না। তাছাড়া, সব চিড়িয়াদের যে আমি আগে খবর দিয়ে দিয়েছি।" মন্তব্য করেন পরমেশ্বরী বাঈ।

বিকেলবেলায় আবার সদলবলে এসে সাহেব উপস্থিত হন পাখি মারার জন্য। কিন্তু এবারও তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়, পাখিদের কোনো সন্ধানই নেই, সবাই যেন একযোগে ধর্মঘট করেছে, বন পরিত্যাগ ক'রে কোথায় চলে গেছে।

অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রাসগাঁয়ে তাঁর নিজের ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন উইলিয়াম ফক্‌নার। একান্তে ক্যাম্পের এক কোণে বসে মনে মনে কি যেন ভাবছেন। পাখি শিকার করা গেল না বটে, কিন্তু আর একটি শিকারের লোভ দুর্নিবার হয়ে উঠেছে তাঁর মনে। বনের একান্তবাসিনী সিদ্ধা বাঈর রূপ উন্মত্ত ক'রে তুলেছে তাঁকে। হ্যাঁ, এ শিকারটি গেঁথে তুলতেই হবে তাঁকে।

রাতের ডিনার সেরে সাহেব গাঁয়ের প্রধানকে ডেকে আনেন তাঁর ক্যাম্পে। ফিস্‌ফিস্ ক'রে চলে তাঁর গোপন পরামর্শ। বনবাসিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর চাই।

"আজই রাত্রে ঐ আওরৎকে ক্যাম্পে নিয়ে এসো। কিছু টাকা দিয়ে দাও! আর যদি তার কোনো মরদ থাকে, তাকেও টাকা দিয়ে বশ ক'রে নাও।"

বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে উঠে যায় গ্রাম-প্রধানের। বলে, "সাহেব আবোল-তাবোল এসব কী আপনি বলছেন? সিদ্ধা বাঈ একজন খানদানী তপস্বিনী। সন্ন্যাসিনী তিনি, টাকা পয়সা ও জীবনের সুখ সম্ভোগ সব কিছু তার কাছে তুচ্ছ।"

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ফক্‌নার, চোখ পাকিয়ে বলেন, "তুমি কি বলতে চাও, এই মেয়েটা পরমা সুন্দরী যুবতী, তায় একা গভীর বনের ভেতর থাকে, আর তার কোনো মরদ প্রেমিক নেই।"

"সাহেব, ভুল বুঝেছেন আপনি। তিনি সত্যিকারের সন্ন্যাসিনী। ভগবান লাভের জন্য বৈরাগ্য আর জপতপ নিয়ে পড়ে আছেন।"

"ড্যাম ননসেন্স্! যত সব ফাঁকি মারছো। দাঁড়াও আমি নিজেই যাচ্ছি ওর জংলী কুঠিতে। ওকে আমার চাই-ই।" উত্তেজিত হয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকেন উইলিয়াম ফক্‌নার। টেবিল থেকে নিজের রাইফেলটি নিয়ে উঠে দাঁড়ান।

গ্রাম-প্রধান সতর্ক ক'রে দেয়, "সাহেব, আপনি যাচ্ছেন, যান। কিন্তু সন্ধ্যের পর সিদ্ধা বাঈর ভজন কুটিরের গণ্ডী পেরিয়ে কারুর যাবার উপায় নেই। মন্ত্রপূত সে গণ্ডী। শুনেছি, মানুষ বা জানোয়ার দূরের কথা একটা মশাও তা পেরিয়ে যেতে পারে না।"

এসব বাজে কথায় কর্ণপাত করার পাত্র সাহেব নন। এক হাতে রাইফেল আর এক হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে গট্ গট্ ক'রে এগিয়ে যান তিনি বিহারবনের দিকে। মনে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অপরূপ সুন্দরী ঐ মেয়েটিকে তাঁর চাই-ই।

অন্ধকার জঙ্গলাকীর্ণ পথ চলতে চলতে উইলিয়াম ফক্‌নার সিদ্ধা বাঈর কুটিরের কাছাকাছি এসে দাঁড়ান, যৌন-উত্তেজনায় ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্ম, সকল কিছুর বিচারবুদ্ধি কোথায় তলিয়ে গিয়েছে।

বীরদর্পে বাঈর আঙিনার দিকে যেই পা বাড়াতে যাবেন, অমনি সেখানে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। একটা দুর্বার, অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁর বক্ষে হেনে বসলো প্রচণ্ড আঘাত, এই আকস্মিক আঘাতের ফলে হাতের লণ্ঠন আর রাইফেল খসে পড়লো হাত থেকে। অনেকটা দূরে ছিটকে পড়লেন তিনি।

এভাবে বিপর্যস্ত হয়েও সাহেব দমিত বা নিরস্ত হন নি, উঠে দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে যেতে থাকেন তাঁর লক্ষ্যস্থল ঐ পর্ণকুটিরটির দিকে।

এবার কয়েক পদ অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বোধ হলো, একটা ভীমকায় মহাশক্তিমান্ পুরুষ কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে অবলীলায় তাঁকে চ্যাংদোলা করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, তড়িৎ-বেগে দূরে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন তিনি।

গভীর রাতে দুশ্চিন্তা ও চাঞ্চল্য জেগে ওঠে উইলিয়াম ফক্‌নারের রামগাঁয়ের ক্যাম্পে। মথুরার বন্ধুরা বলাবলি করেন, যাবার সময় ফক্‌নার বলে গেছেন, দু'তিন ঘণ্টার ভেতর তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু মধ্য রাত পেরিয়ে গেল তাঁর কোনো পাত্তাই নেই। বনে কি পথ হারিয়ে ফেললেন? অথবা কোনো বিষাক্ত সাপ মাড়িয়ে হলেন বিপদগ্রস্ত? লণ্ঠন ও লোকজন নিয়ে বন্ধুরা বেরিয়ে পড়েন তাঁর সন্ধানে।

বিহারবনের কিছুটা এগিয়ে যেতেই উইলিয়াম ফক্‌নারকে পাওয়া গেল। একটা বটগাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে মরার মতো তিনি পড়ে আছেন। চোখ মুখ বিবর্ণ, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, একেবারে চেতনাহীন।

সবাই ধরাধরি ক'রে ফক্‌নারকে তাঁর ক্যাম্পে তুলে নিয়ে আসেন। শুশ্রূষা করে এবং গরম দুধ ও ওষুধপত্র খাইয়ে তাঁকে অনেকটা সুস্থ ক'রে তোলা হয়।

পরের দিন প্রাতরাশের পর উইলিয়াম ফক্‌নার গ্রাম-প্রধানকে ডেকে পাঠান। সে এসে উপস্থিত হলে, তার পিঠ চাপড়ে বলেন, "গুড্ ম্যান্, তুমি ঠিকই বলেছিলে। বাঈ খুব পাওয়ারফুল আছে,—ও মাদার-মেরি আছে। আমার সঙ্গে তুমি চলো, আমি ওর কাছে গিয়ে সম্মান জানাবো, মাপ চেয়ে আসবো।"

রাত্রির সব ঘটনা ফক্‌নারের মুখে শুনে গ্রাম-প্রধান বলে, "সাহেব আপনার বাপ-মায়ের পুণ্যের খুব জোর আছে, আর আছে আপনার অদৃষ্টের জোর। তাই এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। আমরা সবাই যে জানি, রাত্রিকালে মাতাজী সিদ্ধা বাঈর মন্ত্রপূত গণ্ডী পেরিয়ে কেউ কক্ষনো যেতে পারে নি।

সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ভজনকুটির থেকে বেরিয়ে আসেন। সাহেবও মাথা থেকে টুপী তুলে ধরে তাঁকে অভিবাদন জানান। এ সময়ে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে দু'জনের যে কথোপকথন হয়, তার মর্ম এই :

উইলিয়াম ফক্‌নার বলেন, "মাতাজী, আমি আমার আচরণের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত। আপনি দয়া ক'রে আমায় মার্জনা করুন।"

সিদ্ধাবাঈ উত্তর দেন, "তোমায় তো আগে থেকেই আমি মার্জনা ক'রে বসে আছি, বাবা। নইলে রাতের বেলায় এখানকার মন্ত্রপূত গণ্ডী ভেদ করতে গিয়ে তুমি বেঁচে থাকো কি ক'রে? সংসারী মানুষেরা স্বভাবতই নানা ধরনের ভুল করে বৈকি। আমরা যাঁরা অরণ্যে তপস্যা করি, তাদের কাজ হচ্ছে সে ভুল সংশোধন করা।"

"আপনি আমায় শুধ্‌রে দিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ।"

"সাহেব, আমি সব মানুষের জন্য যেমন কল্যাণ কামনা করি, তেমনি তোমার জন্যও করি। আর তোমায় একটা কথা বলে দিই, বাবা। তুমি বিদেশে এসেছো, এখানকার অনেক কিছুরই খবর তেমন রাখো না। এদেশে পথে ঘাটে বনে প্রান্তরে অজস্র সাধু-সন্ত দেখা যায়, তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো। কিন্তু তাদের মধ্যে যাঁরা সিদ্ধ বা সিদ্ধা, তাদের কখনো ঘাঁটাতে যেও না, বিপদে পড়বে।"

টুপী খুলে আবার পরমেশ্বরী বাঈকে সম্মান জানিয়ে সাহেব বিদায় গ্রহণ করেন।

একদিন দুপুরবেলায় সিদ্ধা বাঈ ঠাকুরের ভোগপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে বিশ্রাম করছেন, এমন সময়ে দু'জন বলিষ্ঠ চেহারার লোক প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়, সজোরে ধ্বনি দিতে থাকে, "সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈ কি জয়।"

ভজনকুটির থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধা বাঈ শান্ত স্বরে বলেন, "কি রে, এ অসময়ে এসে তোরা ডাক হাঁক করছিস কেন বল্‌তো? তোদের হাতে এসব কি?"

হাতের ধারালো টাঙ্গী ও গাঁইতি উঁচু ক'রে তুলে ধরে আগন্তুকদের একজন বলে, "মায়ী, তোমার এখানে আজ আমরা ডাকাতি করতে এসেছি।"

"তা এই ভর দুপুরে কেন এসেছিস্ ? চুরি-ডাকাতি তো লোকে রাত্তিরে করে।"

"রাতের বেলায় তোমার এখানে আসবে এমন সাহস কার আছে, মায়ী ? তোমার মন্ত্র-পড়া গণ্ডী ডিঙোতে এসে সেদিনকার ঐ শিকারী সাহেবটার কি হাল হলো, তা তো আমরা জানি। তাই দুপুর বেলাতেই এলাম।"

"কিন্তু আমি যে কাঙালিনী বৈষ্ণবী। আমার এখানে এলি কোন্ বুদ্ধিতে ? কি পাবি এখানে ?"

"কিছু পাবো বলেই তো এলাম, মায়ী। আমরা তোমায় কোনো কষ্ট দেব না, মারধোরও করবো না। শুধু তোমার ঘরটি খুঁজে দেখবো। টাঙ্গী আর গাঁইতি দিয়ে মাটির ভিৎ-টাও খুঁড়ে দেখবো। মায়ী, এতো বড় বড় শেঠ আর গেরস্তরা তোমার কাছে আসে, তোমায় কত টাকাকড়ি, কত কাপড়-চোপড় মিঠাই মণ্ডা ভেট দেয়। তোমার ঘরে বা মেঝের নিচে কিছু লুকোনো নেই, এটা তো হতে পারে না ? আমরা সে সব নিতে এসেছি। তাছাড়া, মায়ী, আমরা বড় গরীব, তাই তো চুরি-ডাকাতির পাপ-পথে আমাদের পা বাড়াতে হয়েছে।"

এবার গর্জে ওঠেন সিদ্ধা বাঈ, "তোরা কি জানিস্‌নে, এখানে যা কিছু ভেট আসে, সঙ্গে সঙ্গে গরীবদের আমি বিলিয়ে দিই ? তবে কেন শুধু শুধু আমায় জ্বালাতন করতে এসেছিস ? এর ফল কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাবি।"

ডাকাতেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে রাজী নয়, স্পষ্ট ভাষায় বলে, "মায়ী, তুমি যা-ই বল না কেন, আমরা তোমার ঘরে ঢুকবোই, আর মেঝেটা একবার খুঁড়ে দেখবোই।"

"আবার বলছি, এখানে গুণ্ডামী বা ডাকাতি করতে গেলে, তোরা ভয়ানক বিপদে পড়বি।"

ডাকাতেরা ভজনকুটিরের দিকে এগিয়ে যেতেই, সিদ্ধা বাঈ দ্রুত-পদে তাঁর আসনে গিয়ে বসে পড়েন, সম্মুখস্থ ধুনির থেকে কিছুটা

ভস্ম তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করেন তাদের চোখ-মুখ লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় ভয়ার্ত চীৎকার।

ডাকাতেরা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকে, "মায়ী, এ কী করলে তুমি আমাদের। চোখ দুটো যে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। কিচ্ছু যে দেখতে পাচ্ছিনে। অন্ধ হয়ে গেলাম আমরা। তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের রক্ষা করো।"

শান্ত স্বরে উত্তর দেন সিদ্ধা বাঈ, "বেশ, তাহলে আমার এই ধুনির সামনে বসে প্রতিজ্ঞা কর্, এ অঞ্চলের কোনো সাধুসন্ত বা সৎ গৃহস্থকে তোরা পীড়ন করবিনে, তাদের বাড়িতে কখনো চুরি ডাকাতি করবিনে।"

"হাঁ মায়ী, আমরা তোমায় কথা দিলাম। দোহাই তোমার, তুমি আমাদের এবারকার মতো বাঁচাও",—বলে সিদ্ধা বাঈর চরণ তলে অসহায়ের মতো তারা লুটিয়ে পড়ে, চোখের তীব্র বেদনায় ছট্ফট্ করতে থাকে।

পুনরায় কিছুটা ধুনি ভস্ম তুলে নিয়ে ডাকাতদের মাথায় চোখে মুখে ছড়িয়ে দেন সিদ্ধা বাঈ। প্রসন্ন হয়ে বলেন, "যা, এবার তোরা ভালো হয়ে গিয়েছিস্। কিন্তু খবরদার, যে কথা দিয়েছিস্, তা যেন সব সময়ে স্মরণে থাকে।"

অচিরে চোখের জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটে, ডাকাতেরা সিদ্ধা বাঈর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ক'রে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

রাসগাঁয়ের অধিবাসীরা বলেন, ঐ ঘটনার পর থেকে ঐ দাগী অপরাধী দু'জন নিজেদের অনেকটা সংশোধন ক'রে নেয় এবং যত্রতত্র যে ভাবে উপদ্রব ক'রে বেড়াতো, তাও হ্রাস হয়ে আসে।

বাঈ তপস্যার জন্য বিহারবনে এসে উপস্থিত হবার পর প্রায় দশ বৎসরের ব্যবধানে তাঁর গুরু দামোদরদাস বাবাজী মরজীবনে চিরতরে ছেদ টেনে দেন। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে কয়েকবার তিনি বৃন্দাবন থেকে গোবর্ধনে এসেছেন এবং পরিক্রমার পথে প্রিয় শিষ্যা

পরমেশ্বরী বাঈকে দিয়েছেন দর্শন, বৈষ্ণবীয় রসসাধনার নিগূঢ় পদ্ধতি-সমূহ একের পর এক তাঁকে আয়ত্ত করিয়েছেন।

গুরুর অন্তর্ধানের দিন গভীর রাত্রে পরমেশ্বরী বাঈ লাভ করেন তাঁর অপরূপ দিব্য দর্শন। সূক্ষ্ম জ্যোতিঃঘন দেহে দামোদরদাস বাবাজী আবির্ভূত হন তাঁর নয়ন সমক্ষে। স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলেন, "মায়ী, এ দেহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই এটিকে পরিত্যাগ ক'রে আমি দিব্যধামে চলে যাচ্ছি। প্রভু শ্রীশ্রীনটবরজীর নির্দেশে তোকে আমি টেনে এনেছিলাম, স্থাপন করেছিলাম তোর নির্দিষ্ট তপস্যার স্থলে। বৈষ্ণবীয় অন্তরঙ্গ সাধনার সিদ্ধি, আর লীলা দর্শন তোর সাধন-সত্তায় এসে গিয়েছে। এবার সেই লীলা সমুদ্রের আরো গভীরে তুই ডুবে যা—জীবন সাধনা তোর সার্থক হয়ে উঠুক।"

গুরু অপ্রকট হবার পরে আরো বিশ বৎসর—একাদিক্রমে সাকুল্যে ত্রিশ বৎসর বিহারবনের ভজনকুটিরটিতে একান্তে বাস করেছিলেন সিদ্ধা বাঈ। রাধাকৃষ্ণের অমৃতময় লীলার গভীরতর স্তরগুলি ক্রমিক পর্যায়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল তাঁর জীবনে।

ত্রিশ বৎসর একটানা সাধনা ও লীলাধ্যানের পর এই মহা-সাধিকার জীবনে আসে সাধনা ও সিদ্ধি বিতরণের পর্ব। ব্রজমণ্ডলের প্রাচীন তাপসদের মুখে শোনা যায়, এ সময়ে গুটিকয়েক বৈষ্ণব সাধক সিদ্ধা বাঈর কাছ থেকে নিগূঢ় সাধন প্রাপ্ত হন, ধন্য হন অন্তরঙ্গ লীলা আস্বাদনের অধিকার লাভে।

অতঃপর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর মরজীবনে আসে চিরবিরতির পালা। অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবকেরা আগে থেকে তাঁর মুখে নির্দিষ্ট প্রয়াণ-লগ্নটির কথা জেনে চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাসগাঁও ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে দলে দলে এসে জমায়েত হয় অগণিত নরনারী। সারা বিহারবন 'রাধে শ্যাম' ধ্বনি আর 'সিদ্ধা মায়ী কি জয়' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। গুরুপ্রদত্ত আসনে বসে, গুরুপ্রদত্ত নামজপ করতে করতে, এই মহিয়সী সাধিকা প্রবিষ্ট হন তাঁর চিরঅভীষ্ট পরমধামে।

সেদিনকার বিহারবনের দুর্গমতা, নির্জনতা ও তপস্যার অনুকূল পরিবেশ আজ আর নেই। কিন্তু সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর ভজনকুটিরের পবিত্র স্থানটি আজো সে অঞ্চলের জনমানসে অসামান্য সম্ভ্রমের স্থান অধিকার ক'রে আছে। বিহারবনের পাশ দিয়ে যাতায়াত করার কালে আজো জনসাধারণ 'সিদ্ধা বাঈ কি জয়' ধ্বনি দিয়ে সেই বৈষ্ণব তাপসীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। গোবর্ধন অঞ্চলের তপস্যাপরায়ণ প্রাচীন সাধকেরাও সিদ্ধা বাঈর পুণ্যময় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, শ্রদ্ধাভরে কীর্তন করেন তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির মাহাত্ম্য।[১]

---

১ শোনা যায়, গোবর্ধনের প্রসিদ্ধ সাধক মনোহরদাস বাবাজীর শিষ্য অনন্তদাস বাবাজী দীর্ঘকাল সিদ্ধা পরমেশ্বরী বাঈর সাধনপূত পর্ণকুটিরে বসে সাধন করেছিলেন। এ সময়ে স্থানীয় সাধুসন্ত ও ভক্তেরা তাঁকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন,—সিদ্ধাবাঈর সাধনস্থান অতি পবিত্র, সেখানে কামিনী ও কাঞ্চনের আসক্তি বর্জন না ক'রে তপস্যা করতে বসলে হিতে বিপরীত হবার আশঙ্কা আছে। অনন্তদাসজী সাহস ভরে এ-স্থানে বসেছিলেন এবং তাঁর দুরূহ তপস্যা সম্পন্ন করেছিলেন।

গোপালের মা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরপ্রেরিত এক অসামান্য অধ্যাত্মশিল্পী। তাই দেখতে পাই, নিজের স্বল্পায়তন জীবনের মধ্যে বহুতর সাত্ত্বিক আধারকে দিনের পর দিন তিনি কাছে টেনে এনেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন ঈশ্বরচেতনায়, তারপর নিজের শক্তিপাতের মাধ্যমে ঘটিয়েছেন তাদের বিস্ময়কর রূপান্তর। এই রূপান্তরিত সাধক ও সাধিকাদের অন্যতম ছিলেন গোপালের মা, কামারহাটির অঘোরমণি দেবী।

আনুমানিক ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরমণি কামারহাটির বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। নিয়তির নির্বন্ধে বালিকা বয়সেই তিনি বিধবা হন, এবং তারপর থেকেই দীর্ঘদিন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে বাস করতে থাকেন। নীলমাধব ছিলেন গ্রামের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি। পটলডাঙার গোবিন্দ দত্ত এবং অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৌরোহিত্য ক'রে তিনি একজন সৎ এবং সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

কামারহাটিতে গোবিন্দ দত্তের একটি বাগান ছিল। এই বাগানে দত্ত মহাশয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলবিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন এবং বিগ্রহ পূজার যথোচিত ব্যবস্থাদিও করেছিলেন। একটি সওদাগরি অফিসে মুৎসুদ্দিরূপে কাজ করতেন গোবিন্দ দত্ত। এ কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রচুর বিত্তসম্পত্তির তিনি অধিকারী হন। পরিণত বয়সে দত্ত মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হন এবং শেষটায় নিজেও পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এভাবে জীবন সায়াহ্নে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে দত্ত মহাশয় সংসারের অনিত্যতা ও নিজের অসহায়তা হৃদয়ঙ্গম করেন। ভক্তিভরে শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজায় তিনি ব্রতী হন এবং পূজা পার্বণের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে থাকেন।

গোবিন্দ দত্তের স্ত্রীও ছিলেন অতি ধর্মপরায়ণা। স্বামীর জীবিত কালে এবং তাঁর মৃত্যুর পর, কামারহাটি বাগানের বিগ্রহ সেবায় তিনি প্রাণমন ঢেলে দেন। এই উপলক্ষেই পুরোহিত বংশের বিধবা কন্যা অঘোরমণির সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক।

মালপাড়ার গোঁসাইরা দত্ত মহাশয়দের গুরু বংশ। মনে হয়, এই সূত্রে, বিশেষ ক'রে দত্তগিন্নির সঙ্গ ও সাহচর্যে থেকে, অঘোরমণি বৈষ্ণব সাধনার দিকে আকৃষ্ট হন এবং ঐ গোঁসাই বংশের এক আচার্যের কাছ থেকে গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেন।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বংশে অঘোরমণির জন্ম। তদুপরি নিজে ছিলেন অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারিণী ও ভক্তিমতী। মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর থেকে অশেষভাবে কৃচ্ছ্র সাধন ক'রে, অপার নিষ্ঠা নিয়ে, ঠাকুরের সেবা পূজা ও জপ সাধনে তিনি প্রাণমন ঢেলে দেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তগিন্নির সংসারে নানা বৈষয়িক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, প্রচুর ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তবুও কামারহাটি বাগানের বিগ্রহ-সেবার ওপর সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন তিনি, চেষ্টা করতেন পূর্বতন পূজা পার্বণের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য।

ভক্তিমতী অঘোরমণিও প্রায়ই যোগ দিতেন শ্রীবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণের সেবা পূজার কাজে। এভাবে দত্তগিন্নির সঙ্গে ক্রমে তাঁর গড়ে ওঠে নিবিড় সখ্য ও আত্মিক সম্পর্ক।

অতঃপর দত্তগিন্নির আগ্রহে বাগানের প্রান্তস্থিত একটি ঘরে এসে বাস করতে থাকেন অঘোরমণি। এখান থেকে মনের আনন্দে তিনি গঙ্গা দর্শন করতেন। স্বহস্তে রন্ধন ক'রে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের পর যেটুকু সময় হাতে থাকতো, তার অধিকাংশ কাটাতেন ইষ্টদেব বালগোপালের ধ্যান জপ ক'রে। এভাবে এবং এ পরিবেশে নৈষ্ঠিক সাধিকা অঘোরমণি একটানা প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কামারহাটির দত্তদের মন্দির-বাগানে অতিবাহিত করেন।

অতিরিক্ত নৈষ্ঠিকতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে অঘোরমণির আচার আচরণে দেখা দিয়েছিল ঋজুতা এবং রুক্ষতা। তদুপরি ছিলেন

অতিরিক্ত অভিমানিনী এবং স্পর্শকাতর। যে কোনো অন্যায় অবিচার দেখলে, সেই মুহূর্তে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করতেন এবং কাউকে উচিত কথা বা অপ্রিয় সত্য বলতে—তা তিনি যত বড় মানুষই হোক্ না কেন, তিনি দ্বিধা করতেন না।

নিজের গ্রাসাচ্ছনের জন্য কারুর কাছে হাত পাতার কথা কোনোদিন তিনি ভাবতেই পারতেন না। পাঁচশত টাকার একটি কোম্পানীর কাগজ ছিল তাঁর, তাঁরই সুদের টাকা থেকে চলতো ভরণপোষণ। দু'মুঠো আতপ চাল আর বাগানের একটু শাক্‌সব্জী, এই দিয়েই নিত্যকার আহার তাঁর শেষ হতো। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কথনো তাঁকে অভিযোগ করতে শোনে নি। ইষ্টদেব শ্রীগোপালের সেবা পূজা ও ভজন, নিজের নৈষ্ঠিকতা, আর দীর্ঘদিনের অটুট ব্রহ্মচর্য, এই তিনটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বালবিধবা অঘোরমণির ব্যবহারিক এবং আত্মিক জীবন।

প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম ক'রে বার্ধক্যের গণ্ডীতে গিয়ে পড়েছেন অঘোরমণি, এমন সময়ে ঈশ্বর নির্ধারিত এক পরমলগ্নে হঠাৎ একদিন উন্মোচিত হয়ে গেল তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের তোরণদ্বার। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তিনি দর্শন করলেন, এবং সেইদিন থেকে এক অচ্ছেদ্য অধ্যাত্মসূত্রে তিনি বাঁধা পড়ে গেলেন। গোপালরূপী ইষ্টদেবকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মধ্যেই দর্শন করলেন তিনি, আর রামকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন তাঁর জীবন্ত গোপাল। সাধিকা অঘোরমণির জীবনের এই গোপাল-সিদ্ধির কাহিনী ও তথ্য প্রমাণ আধুনিক যুগের মানুষের কাছে উন্মোচিত করেছে বাৎসল্যরস সাধনার এক বিস্ময়কর অধ্যায়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। অগ্রহায়ণ মাস। গোবিন্দ দত্তের বিধবা স্ত্রী পটলডাঙা থেকে এসে কিছুদিন যাবৎ কামারহাটির বাগানে অবস্থান করছেন। যুগলবিগ্রহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিয়ম সেবা অনুষ্ঠানের মাস এটা। এ সময় প্রতি বৎসর দত্তগিন্নি তাঁদের গঙ্গা তীরের বাগানে

এসে বাস করেন, শ্রীবিগ্রহের পূজা ও সেবার কোনো ত্রুটি না ঘটে, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নামে এক উঁচু দরের মহাত্মা থাকেন, কলকাতার শিক্ষিত মহলে তাঁর খ্যাতি খুব ছড়িয়ে পড়েছে। দত্তগিন্নির ইচ্ছা, একটিবার এই সাধুটিকে দর্শন ক'রে আসবেন। অঘোরমণি গিন্নির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দত্তদের বাগানে, মন্দিরের পাশেই বাস করেন। তিনিও উৎসুক হলেন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য। আর একটি সঙ্গিনীও তাঁদের সঙ্গে এ সময়ে জুটে গেলেন। এই তিনজন ভক্ত মহিলা সেদিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত।

কালী মন্দিরে পূজো দেবার পর সবাই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। ঠাকুর এই ভক্তিমতী নবাগতাদের দেখে মহা আনন্দিত। সাদরে তাঁদের কাছে বসিয়ে ভক্তি ও ত্যাগনিষ্ঠা সম্পর্কে কিছুক্ষণ উপদেশ দিলেন। ভাবের উদ্দীপনা জেগে উঠলো তাঁর মনে, দু'একটি শ্যামাসংগীত গেয়েও শোনালেন তাঁদের। দর্শনার্থী মহিলারাও ইতিমধ্যে আকৃষ্টা হয়ে পড়েছেন ঠাকুরকে দর্শন ক'রে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে।

ভক্তিভরে ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করলেন সবাই। বিদায় নেবার সময় দত্তগিন্নি অনুরোধ জানালেন, "বাবা, একবার দয়া ক'রে আমাদের কামারহাটির মন্দিরে আসুন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদ পেয়ে যান।"

"যাবো বৈকি। একদিন অবসর মতো তোমাদের ঠাকুর দর্শন ক'রে আসবো," সানন্দে প্রতিশ্রুতি দেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

মহিলা দর্শনার্থীরা চলে গেলে বুঝা গেল, ঠাকুর তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন। বিশেষ ক'রে দত্তগিন্নি ও অঘোরমণি সম্পর্কে ভক্তদের কাছে বলতে লাগলেন, "আহা, ওদের চোখমুখের কি ভাব। ভক্তিপ্রেমে যেন ভাসছে। প্রেমময় চক্ষু। নাকের তিলকটি অবধি কি সুন্দর।"

লোক-দেখানো প্রেমভক্তির ভাব নয়, সহজ সত্যকার ঈশ্বরপ্রেম

উপস্থিত হয়েছে এই দুই মহিলার জীবনে, এই কথাটিই তিনি বুঝাতে চাইলেন সবাইকে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে ফিরে যাবার সময় অঘোরমণিও উপলব্ধি করলেন—ইনি একজন খাঁটি সাধু, প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধ সাধু। মনের ভেতর এঁর জন্য একটা অব্যক্ত আকর্ষণও বোধ করলেন অঘোরমণি। ভাবলেন, অবসর মতো শিগ্‌গীরই আবার একদিন আসবেন এঁর কাছে।

অল্পদিন পরের কথা। ইষ্টপূজা সেরে জপে বসেছেন অঘোরমণি। হঠাৎ মনে জেগে উঠলো ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা। তাঁকে দর্শন করার জন্য, তাঁর মধুমাখা কথাগুলো আবার শোনবার জন্য, চঞ্চল হলেন তিনি। তক্ষুনি উঠে পড়লেন, দোকান থেকে দু-পয়সার দেদো সন্দেশ ঠাকুরের জন্য কিনে নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়িতে।

ঠাকুরের কক্ষে ঢোকামাত্র সাগ্রহে তিনি বলে ওঠেন, "এই যে এসেছো। তা বেশ করেছো। বোসো, আর আমার জন্য কি নিয়ে এসেছো দাও দেখি।"

অঘোরমণি তো লজ্জায় সংকোচে আড়ষ্ট। সস্তা দামের যে সন্দেশ কিনে এনেছেন, তা কি ক'রে ঠাকুরের হাতে দেবেন? ভাবছেন, কলকাতার কত বড় বড় লোক এঁকে দর্শন করতে আসে, কত ভাল ভাল মণ্ডা মিঠাই ভেট দিয়ে যায়। তার তুলনায় আমার মতো দরিদ্রা বিধবার এই রোঘো সন্দেশ অতি নগণ্য, অতি হাস্যকর। শুধু তাই নয়, আসামাত্রই ঠাকুর সবার সামনে বলছেন, "কি এনেছো, দাও।"

ঐ সন্দেশ বার করা মাত্র ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরম আনন্দে তা খেতে শুরু করলেন। খেতে খেতে বললেন, "হ্যাঁগা, তুমি পয়সা খরচ ক'রে, বাজার থেকে এসব আনো কেন? ঘরে নারকেলের নাড়ু ক'রে রাখবে, তা থেকে দু-একটা নিয়ে আসবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউ চচ্চড়ি, আলু বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে-

খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"

অঘোরমণি বালবিধবা। স্বামীসুখ জীবনে তাঁর কখনো হয় নি। অপত্য স্নেহ কি বস্তু, কি তার আস্বাদ, তা থেকেও চিরবঞ্চিত। তাই বুঝি তাঁর মর্মতলে স্নেহ-প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতির তরঙ্গ জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এটা দাও, আমার জন্য ওটা এনো, এই সব শিশুসুলভ আবদারের কথা বলে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বার বার আকর্ষণ করছিলেন অঘোরমণির সুপ্ত মাতৃসত্তাকে।

অঘোরমণির মনে এ সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের অপত্যসুলভ আবদার যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সে সম্পর্কে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: "ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হ'তে লাগলো, আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই; আমি গরীব কাঙ্গালী লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি, অমনি যেন পেছন থেকে টানতে লাগলেন। কোনমতে এগুতে আর পারি না। কত ক'রে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।"

কয়েকটি দিন যেতে না যেতেই আবার তিনি অনুভব করেন ঠাকুরের অমোঘ আকর্ষণ। তাই সেদিন নিজ হাতে কিছুটা চচ্চড়ি রান্না ক'রে তা নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে।

"হ্যাঁ গা, আজ কি নিয়ে এলে গো? চচ্চড়ি, বাঃ বাঃ।"

খাবার পর শুরু হয় চচ্চড়ির সুখ্যাতি, উৎফুল্ল হয়ে বার বার ঠাকুর বলতে থাকেন,—"আহা! কি রান্না, যেন সুধা, সুধা!"

অঘোরমণির সারা দেহ পুলকাঞ্চিত। চোখ দুটো ভাবাবেগে ছলছল হয়ে ওঠে। ভাবতে থাকেন, 'আমি অসহায়া, কাঙালিনী, তাই ঠাকুর কৃপা ক'রে সবার কাছে আমায় এমন বড় ক'রে তুলে ধরছেন।'

ক্রমে কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। অঘোরমণি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এসে উপস্থিত হন। শাক বা সব্জীর তরকারী যেদিনকার যে রান্নাটি নিজের ভালো-লাগে, তাই রেঁধে নিয়ে আসেন ঠাকুরের কাছে। তিনিও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে ফরমায়েস দিয়ে বসেন, কোনো দিন চাই সুষ্নি শাকের সস্‌সড়ি, কোনোদিন বা কলমি শাকের চচ্চড়ি।

বড় সাধু, খ্যাতনামা সাধু, ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে যেচে অঘোরমণির কাছ থেকে এটা ওটা খাচ্ছেন, আর বালকের মতো আবদার করছেন। কখনো বা উচ্ছ্বসিত ভাষায় রন্ধনের গুণপনা ব্যাখ্যা চলছে। এগুলো ভালোই লাগছে অঘোরমণির।

আবার মাঝে মাঝে মনে জাগছে খেদ। ইষ্টদেব বালগোপালকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, "প্রভু, তোমায় ডেকে ডেকে, তোমার কাছে এত কাঁদাকাটি ক'রে, শেষটায় আমার এই দশা হলো? এমন সাধুর কাছে এসে পড়লাম, তাঁর শুধু খাই খাই বাই। না, আর যাবো না রাসমণির কালীমন্দিরে। যতটা সম্ভব, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে এড়িয়েই চলবো।"

কিন্তু ঠাকুরের টান এড়ানো কোনোমতেই সম্ভব হয় না। তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে কামারহাটিতে পৌঁছুলেই, মন অস্থির হয়ে ওঠে। আবার কখন তাঁকে দেখবেন, হাতে তুলে তাঁকে নূতন কি খাওয়াবেন, এই চিন্তা জেগে উঠতে থাকে বার বার।

দত্তগিন্নির শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দেখবেন বলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন। তাই ইতিমধ্যে একদিন উপস্থিত হলেন তাঁর কামারহাটির গঙ্গাতীরস্থ বাগানে। সেখানকার মেয়েমহলের এক প্রান্তে একটি কক্ষে বাস করেন অঘোরমণি। ঠাকুরের আগমনে তিনি তো মহা উল্লসিত। দত্তগিন্নি এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরাও ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। তাঁর ভজন কীর্তন শ্রবণ ক'রে, ঈশ্বরীয় ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ ক'রে, সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। এভাবে বিগ্রহ দর্শনকে উপলক্ষ ক'রে, ভক্ত সাধিকা অঘোরমণির হৃদয়ে ঠাকুর দিব্য আনন্দের এক নূতন তরঙ্গ বইয়ে দেন।

অঘোরমণির নিত্যকার দিনচর্যা, পূজা ও জপ তপ ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। সাধারণত রাত দুটোর সময় তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন, শৌচাদি সেরে তিনটের ভেতর বসতেন গিয়ে জপের আসনে। সকাল আটটা অবধি চলতো একটানা জপ ও ধ্যান। তারপর শ্রীরাধাকৃষ্ণজীকে দর্শন ও প্রণাম ক'রে সেবা পূজা ভোগ-রাগের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন তিনি।

বেলা দুটোর পর ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত হয়ে গেলে, তবে তিনি শুরু করতেন তাঁর নিজের রন্ধনকর্ম। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রেই অঘোরমণি আবার জপে গিয়ে বসতেন।

সন্ধ্যাকালে শ্রীবিগ্রহের আরতির সময় তিনি আসন ত্যাগ ক'রে উঠে আসতেন মন্দির কক্ষে। আরতি শেষ হলে, সামান্য একটু দুগ্ধ পান করার পর গভীর রাত অবধি চলতো জপ ধ্যানের পর্ব। রাত্রে দু' তিন ঘণ্টার বেশী ঘুম কখনো তাঁর হতো না।

কখনো কখনো দীর্ঘ ধ্যান জপের পর বুকের ধড়ফড়ানি দেখা দিত অঘোরমণির। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একদিন একথা জানালে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওটা বায়ুর ব্যাপার। ঠাকুর দেবতাকে এত ডাকছো, তাই ওটা হয়। যখন ওরকম হবে, তখন কিছু খেয়ে নিও।"

পূর্ব অভ্যাস মতো অঘোরমণি একদিন রাত তিনটেয় জপে বসেছেন। সঙ্কল্পিত সংখ্যার জপ সমাপ্ত হয়ে গেল। এবার তাঁর ইষ্টদেব শ্রীগোপালকে জপ সমর্পণ করার জন্য প্রাণায়াম শুরু করেছেন, হঠাৎ এসময়ে দর্শন করেন এক অলৌকিক দৃশ্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ উপবিষ্ট রয়েছেন তাঁর পাশে। শুধু তাই নয়, যে ভঙ্গীতে রাসমণির কালীবাড়িতে তাঁর নিজের ঘরে প্রায়ই তিনি বসে থাকেন, যেভাবে নিজের ডান হাতটি তিনি মুঠো ক'রে রাখেন, ঠিক তেমনটি। এ মূর্তি ঠাকুরের ছবি নয়, সূক্ষ্ম দেহও নয়—জীবন্ত।

সেদিনকার অলৌকিক দর্শন ও দিব্য অনুভূতির কথা শ্রবণ ক'রে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন। অঘোরমণি বলছিলেন :

—"দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট, জীবন্ত। ভাবিলেন, 'এ কি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন?' আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসছে!

"তারপর সাহসে ভর ক'রে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল (হাত দেখাইয়া) এতবড় ছেলে বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখ পানে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি!) বললে, 'মা, আমায় ননী দাও।' আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা! চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হ'ত।

"কেঁদে বললুম, 'বাবা আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ক্ষীর ননী কোথা পাব, বাবা!' কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুকনো নারকেল নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম, বললুম 'বাবা গোপাল, আমি তোমায় এ কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।'

"তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। যেমন সকাল হোল অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। একহাত গোপালের পাছায় ও একহাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ

১ গোপালের মা : উদ্বোধন

চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম, গোপালের টুকটুকে পা দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে।"

ইষ্টদেব শ্রীগোপালের এই দিব্য দর্শন লাভ ক'রে, দিব্যলীলা দর্শন ক'রে, অঘোরমণির দেহমন প্রাণ আনন্দে উত্তাল হয়ে ওঠে। পদব্রজে কামারহাটি থেকে ছুটে আসেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুরের একটি স্ত্রীভক্ত এসময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রত্যক্ষদর্শিনীর মুখে শুনে অঘোরমণি ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাবাবেশের কথা সারদানন্দজী বর্ণনা করেছেন :

"আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করছি--বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে! এমন সময় শুনতে পেলুম বাহিরে কে 'গোপাল গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসছে। গলার আওয়াজটা পরিচিত—ক্রমেই নিকট হতে লাগলো। চেয়ে দেখি গোপালের মা।—এলোথেলো পাগলের মত, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেছে, আঁচলটা ভূঁয়ে লুটুচ্ছে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—এমনিভাবে ঠাকুরের ঘরে পূর্ব দিককার দরজাটি দিয়ে ঢুকছে। ঠাকুর তখন ঘরের ভিতর ছোট্ট তক্তপোশখানির উপর বসেছিলেন।

"গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি—এমন সময় তাঁকে দেখে ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়লো এবং ঠাকুরও ছেলের মতো তার কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মার দুইচক্ষে তখন দর্‌দর্‌ ক'রে জল পড়ছে আর যে ক্ষীর সর ননী এনেছিল, তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছে। আমি তো দেখে অবাক আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, কারণ এর আগে কখন তো ঠাকুরকে ভাবস্থ হয়ে কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখি নাই; শুনেছিলাম বটে ঠাকুরের গুরু বামনীর কখন কখন যশোদার ভাব হতো আর ঠাকুরও তখন গোপাল ভাবে তার কোলে উঠে বসতেন। যা হোক, গোপালের মার ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট।

"কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সেভাব থামলো, এবং তিনি আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সে ভাব আর থামে না। আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে 'ব্রহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে,' ইত্যাদি পাগলের মত বলে আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়। ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বললেন—'দেখ, দেখ, আনন্দে ভরে গেছে। ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে।'

"বাস্তবিকই ভাবে গোপালের মার ঐরূপ দর্শন হ'ত ; ও যেন আর এক মানুষ হয়ে যেত। আর একদিন খাবার সময় ভাবে প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে আমাদের সকলকে গোপাল বলে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিয়েছিল। আমি আমাদের সমান ঘরে মেয়ের বিয়ে দিই নাই বলে আমায় মনে মনে একটু ঘেন্না করতো—সেদিন তার জন্যই বা গোপালের মার কত অনুনয়-বিনয়। বললে আমি কি আগে জানি যে তোর ভিতরে এতখানি ভক্তি বিশ্বাস। যে গোপাল ভাবের সময় প্রায় কাউকে ছুঁতে পারে না, সে কি না আজ ভাবাবেশে তোর পিঠের উপর গিয়ে বসলো ! তুই কি সামান্যি !"

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কক্ষ যেন এক লীলামঞ্চ হয়ে উঠেছে। মা-যশোদা আর তাঁর নয়নমণি গোপালের ভাবোচ্ছ্বাসময় নাটক সেখানে অভিনীত হচ্ছে।

ভাবরসের তরঙ্গে তরঙ্গে অঘোরমণি যেন নেচে বেড়াচ্ছেন। কখনো শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, "এই ছ্যাখো, গোপাল আমার কোলে বসে কত রঙ্গ করছে, কত বায়নাক্কা করছে।"

আবার কখনো বা বলছেন, "ঐ যে আমার গোপাল তোমার দেহের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।" কখনো বা তিনি দেখছেন লীলাচঞ্চল বালশ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছেন। আর মাতৃভাবে আবিষ্টা অঘোরমণি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছেন।

অঘোরমণির এই অপূর্ব অবস্থা দর্শনে ঠাকুরের আনন্দের অবধি নেই। সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাতে থাকেন তাঁর এই দিব্য উপলব্ধির মনোরম দৃশ্য।

রাগানুগা ভক্তি আর বাৎসল্যরসের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে এই শুদ্ধসত্ত্ব সাধিকার দেহে মনে। শান্ত নিস্তরঙ্গ করার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণ বার বার সস্নেহে তাঁর এই বৃদ্ধা ভক্তের বুকে হাত বুলোতে থাকেন, বলতে থাকেন নানা আশ্বাস বাণী। শুধু তাই নয়, একে ওকে দিয়ে ভালো ভালো সব খাদ্য সামগ্রী এনে ঠাকুর সযত্নে তাঁকে খাইয়ে দিলেন।

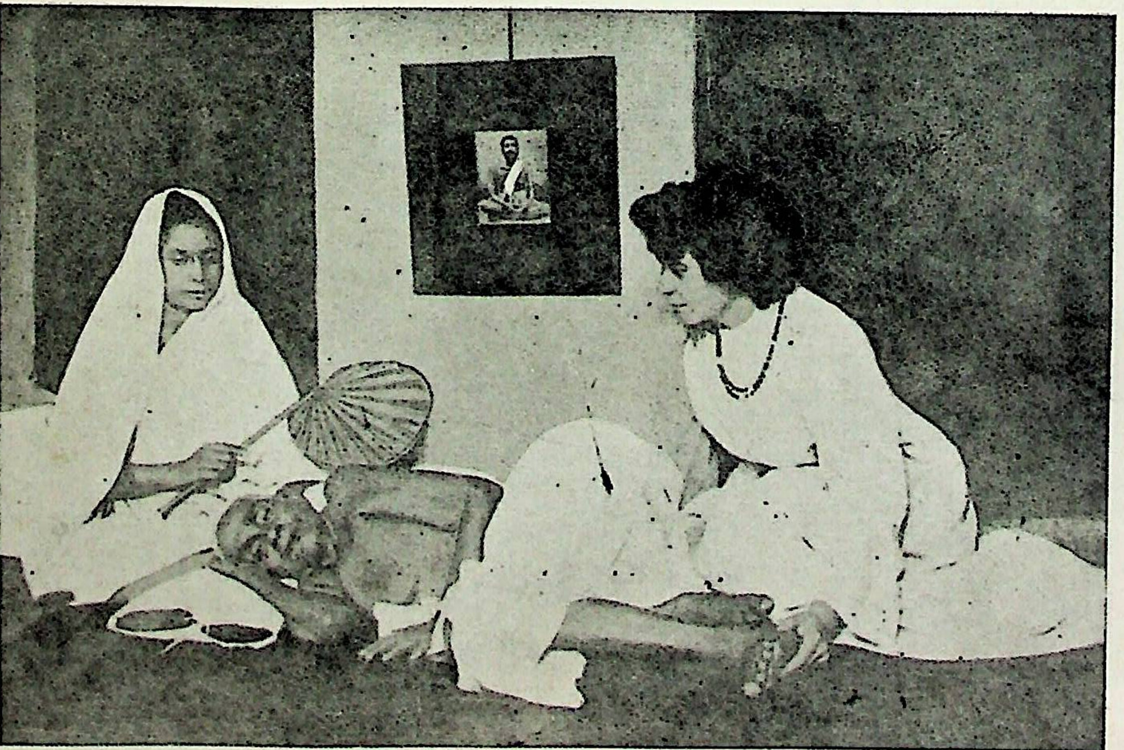
বৃদ্ধার দেহ হয়েছে পুলকাঞ্চিত, চোখ দুটি অশ্রুসজল। ঠাকুরের দিকে চেয়ে গদ্‌গদ স্বরে বলছেন, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় দুঃখে কাটিয়েছে। টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে ক'রে, তা বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি তুমি এত যত্ন আজ করছো?"

সাধিকা অঘোরমণির এদিনকার ইষ্টলীলাস্ফূর্তির পর থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে ডাকতেন 'গোপালের মা' বলে। আর অঘোরমণির দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ এখন থেকে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাঁর শ্রীগোপাল-রূপে।

গোপালের মার বাৎসল্যরসাশ্রয়ী নানা আনন্দলীলা, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের তাঁর প্রতি গোপালভাবের লীলা এসময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই দর্শন করেছেন, বিস্ময়ে আনন্দে তাঁরা অভিভূত হয়েছেন। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে গোপালের মায়ের যে রূপান্তর সাধিত হয়, সে দৃশ্যও উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল বহু ভক্তের দৃষ্টিসমক্ষে।

গোপালের মার সেদিনের ঐ রকম উত্তাল অবস্থা দেখে সারাদিন তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছে রেখে দেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর কিছুটা শান্ত ক'রে, খাইয়ে দাইয়ে বিকেলে পাঠিয়ে দেন কামার-হাটিতে।

সেদিন পথ চলতে গিয়েও গোপালের মা কম বিপদে পড়েন নি। ইষ্টদেব বালগোপাল তাঁর কোলে চেপে বসে আবদার ক'রে বলতে থাকে, এটা দাও, ওটা দাও, এপথ দিয়ে নয়—ওপথ দিয়ে নিয়ে



রোগ শয্যায় গোপালের মা পাশে জনৈকা ভদ্র মহিলা ও নিবেদীতা

চল। দুরন্ত ছেলেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে গোপালের মা কোনোমতে নিজের ঘরে এসে হাঁফ ছাড়েন।

কিন্তু এখানে এসেই কি স্বস্তি আছে? পূর্বেকার অভ্যেস মতো রাতের বেলায় জপে বসেছেন, অমনি আবার শুরু হয় গোপালের দুষ্টুমি আর নানা উপদ্রব। জপ আর করতে পারেন কই? যার জন্য এত জপতপ, সে-ই যে তাঁর সামনে এসে লীলাচঞ্চল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে, ছুটোছুটি করছে, বালসুলভ নানা রঙ্গরস করছে। মধুর দুষ্টামিতে ভরিয়ে তুলেছে গোপালের মার মনপ্রাণ।

বালগোপাল এবার বায়না ধরে, সে ঘুমুবে, বড্ডো ঘুম পেয়ে গিয়েছে তার। অনন্যোপায় হয়ে জপের পর্ব সাঙ্গ ক'রে তখনি আসন ছেড়ে উঠতে হয় গোপালের মাকে। তারপর গোপালকে কাছে নিয়ে তক্তপোশে গিয়ে শয়ন করেন।

কিন্তু শয়ন ক'রেও শান্তি নেই। দুরন্ত গোপালের চোখ থেকে ঘুম কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। সে খুঁত খুঁত করছে আর বলছে, 'একটা নরম বালিশ নেই, এভাবে শুধু মাথায় কি শোওয়া যায়?'

নিজের বাহুতে গোপালের মাথাটি ন্যস্ত ক'রে, নানা কথায় ভুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করেন গোপালের মা। কিন্তু এ উপাধানও গোপালের মনঃপূত নয়, এপাশ ওপাশ করতে থাকে সে, বার বার প্রতিবাদ জানায়।

গোপালের মা আশ্বাস দেন, "বাবা, আজ এই রকমে শুয়ে থাকো। রাত পোয়ালেই দত্তগিন্নির মেয়ে ভূতোকে বলে তোমার জন্য বিচি ঝেড়ে-বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেবো।"

দত্তদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজা ও ভোগ শেষ হলে বেলা দুটো তিনটের সময় গোপালের মা নিজের রান্না শুরু করতেন। ইষ্টদেব শ্রীগোপালকে তা নিবেদন ক'রে নিজে খেতেন। এ অভ্যেস এবার তিনি পরিবর্তন করলেন। ইষ্টদেব গোপাল আর তো সেই দূরের আরাধ্য বস্তুটি নেই, জীবন্ত হয়ে নেমে এসেছেন তাঁর কাছে, করছেন অসংখ্য রকমের দুরন্তপনা। এমন জীবন্ত গোপালকে কি

আর বেলা দুটো তিনটে অবধি না খাইয়ে কখনো রাখা যায় ? খিদে পেলেই সে কাতর হয়ে আঁচল ধরে ঘুরে বেড়াবে, নয়তো চীৎকার করতে থাক্‌বে।

স্থির করলেন, এখন থেকে সকালের দিকে গোপালের ভোগ তৈরি করবেন, তাড়াতাড়ি তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়াবেন।

রান্নার জন্য বাগান থেকে শুক্‌নো কাঠ কুড়োতে গেছেন গোপালের মা। কিন্তু একি অবাক্ কাণ্ড! তাঁর দুষ্টু গোপাল যে সেখানে গিয়েও হাজির। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে, এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ক'রে মায়ের কাঠ সংগ্রহের কাজে সে সাহায্য করছে। কাঠগুলো সব রান্নাঘরে এনে করছে স্তূপীকৃত।

রান্না করতে বসেছেন, তখনো কি কোনো স্বস্তি আছে? গোপালের দুষ্টুমির ফলে তাঁকে অস্থির থাক্‌তে হয়। কখনো সে কাছে বসে এটা ওটা নাড়তে থাকে, কখনো বা চড়ে বসে কাঁধের ওপর, আবদারের পর আবদার জানাতে থাকে। গোপালের মা আদর করেন, বুঝিয়ে তাকে শান্ত করেন। এক এক সময়ে জোর বকুনিও দিতে হয় এতো দুরন্তপনার জন্য।

কিছুদিন পরে গোপালের মা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আবার দর্শন করতে এসেছেন। মা-সারদামণি তখন অবস্থান করতেন নহবতের নিচতলার ঘরে। সেখানে বসে গোপালের মা তাঁর নিত্যকার জপ সমাপ্ত করছেন, এমন সময়ে ঠাকুর সেখানে এসে উপস্থিত।

আসনে উপবিষ্টা গোপালের মা'র দিকে দৃষ্টি পড়তেই সহাস্যে তিনি মন্তব্য করেন, "কি গো, এখনো তুমি অত জপ করো কেন? তোমার তো কত দর্শন-টর্শন হয়েছে।"

"জপ করবো না ? বল কি বাবা ? আমার কি তেমন হয়েছে ?" সবিস্ময়ে উত্তর দেন গোপালের মা।

"সব হয়েছে তোমার"—শান্ত স্বরে বলেন ঠাকুর।

"সব হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, বলছি তো—সবই তোমার হয়েছে।"

"এসব তুমি বলছো কি বাবা ?"

স্পষ্ট ভাষায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে ওঠেন, "হ্যাঁ, তোমার নিজের জন্য জপ-তপ সব হয়ে গিয়েছে। তবে—এ শরীরটা (ঠাকুরের শরীর) ভাল থাকবে বলে, ইচ্ছে হয় তো জপ করতে পারো।"

আনন্দে অভিভূত গোপালের মা নির্নিমেষে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তাহলে, এখন থেকে যা কিছু করবো সব তোমার, তোমার, তোমার।"

সদ্‌গুরু, ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু সাধকের ইষ্টে লীন হয়ে যান, আবার ইষ্ট ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুতে লীন হন[1]—এ তত্ত্বটির আভাস সেদিন ফুটে উঠেছিল ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্ত সাধিকা গোপালের মা'র সংলাপে, আর তাঁদের অনুভূতি ও আচরণে।

সেদিনকার স্মৃতিচারণ ক'রে উত্তরকালে গোপালের মা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলতেন, "গোপালের (রামকৃষ্ণের) মুখের ঐ কথা সেদিন শুনে থলি মালা সব গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলুম। অনেকদিন বাদে আবার একটা মালা নিলুম। ভাবলুম, একটা কিছু তো করতে হবে ? চব্বিশ ঘণ্টা করি কি ? তাই গোপালের কল্যাণে মালা ফেরাই।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা শোনার পর থেকে গোপালের মা'র জপতপ হ্রাস পেলো,—সত্যকার রাগানুগা ভক্তিপ্রেমে আবিষ্ট হয়ে রইলেন তিনি। এই রাগানুগা ভাবতরঙ্গে আচার নিয়ম সব কিছু কোথায় যেন তলিয়ে যেতে লাগলো।

প্রাণপ্রিয় বালগোপাল, লীলাচঞ্চল দুরন্ত গোপাল, এখন তাঁর সর্ব সময়ের সঙ্গী। তার দুরন্তপনার ফলে বিধবা ব্রাহ্মণীর আচারনিষ্ঠা রক্ষা করারই বা উপায় কই ?

যখন তখন গোপাল তার মায়ের কাছে খেতে চায়, স্বেচ্ছামতো

---

১ এস্থলে উল্লেখনীয়, শুধু ব্রহ্মবিদ্‌ গুরু ও ইষ্টদেবের ভেতরই এ একাত্মকতা ঘটতে পারে, অব্রহ্মজ্ঞ গুরুর ক্ষেত্রে নয়।

মায়ের মুখে রসাল খাদ্যের কিছুটা গুঁজে দিয়ে আনন্দ করতে থাকে। মুখ থেকে তা কোন্ প্রাণে ফেলে দেন গোপালের মা? ফেলে দিলে সে যে অভিমান করে, রাঙা ঠোঁটখানি ফুলিয়ে কেঁদে ভাসায়। এ ছেলেকে শাসন করা দায়।

গোড়ার দিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে গোপালের মা নিজের বিধবাসুলভ নৈষ্ঠিকতা ও আচার বিচার নিখুঁতভাবে বজায় রেখেছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিজে হাতে রান্না ক'রে ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছেন। খাওয়ার সময় আন্‌মনা হয়ে ঠাকুর হঠাৎ তাঁর ভাতের কাঠিটি স্পর্শ ক'রে ফেলেন। সেদিনকার রান্না করা ভাত গোপালের মা আর খেতে পারেন নি। গঙ্গায় ঢেলে দিয়েছিলেন। এবার বালগোপালের নিরন্তর দর্শন আর দুরন্তপনার ফলে বাৎসল্য-রসের জোয়ার এসেছে তাঁর ভেতরে, নৈষ্ঠিকতার বন্ধন একটি একটি ক'রে খুলে যাচ্ছে।

তাই এখন থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খাওয়ানো এবং তাঁর প্রসাদ খাওয়া, এসব বিষয়ে গোপালের মা'র আর কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ রইলো না।

শ্রীরামকৃষ্ণে ইষ্টবুদ্ধি জাগ্রত হবার পর থেকে গোপালের মায়ের গোপাল দর্শনে অনেকটা ভাটা পড়ে গেল। এখন থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণই যখন তখন আবির্ভূত হতে থাকেন তাঁর নয়নসমক্ষে। শুধু তাই নয়, ইষ্টরূপে ঠাকুর এ সময়ে তাঁকে সাধন নির্দেশ দিতেন, আরো দিতেন কল্যাণকর নানা পরামর্শ।

বালগোপাল দর্শনে সদা অভ্যস্ত গোপালের মা'র মনে কিন্তু অশান্তি দেখা দেয়। চিন্তিত হয়ে ভাবেন, 'আমার সেই দুষ্টু আবদেরে লীলাচঞ্চল গোপাল তো আর এসে দাঁড়াচ্ছে না আমার সামনে? তবে কি এ দুর্ভাগিনীকে সে একেবারে ছেড়ে চলে গেল?'

সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে, সাশ্রুনয়নে নিবেদন করেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, "গোপাল, এ তুমি আমার কি করলে? আমার কি কোনো

অপরাধ হয়েছে? কেন আমি আর তোমায় আগেকার মতো গোপালমূর্তিতে দেখা পাইনে?"

প্রশান্ত কণ্ঠে ঠাকুর উত্তর দেন, "ছ্যাখো, ও রকমের সদা সর্বক্ষণ দর্শন হলে, কলিতে শরীর থাকে না। শুকনো পাতার মতো ঝ'রে পড়ে যায়।"

আগেকার মতো আর যখন তখন বালগোপালকে দেখতে পান না গোপালের মা। এজন্য মনটা শায়কবিদ্ধ পাখির মতো ছটফট করতে থাকে, বুকে দেখা দেয় তীব্র যন্ত্রণা।

ঠাকুর রামকৃষ্ণকে একদিন জানালেন, "বায়ুর প্রকোপ আমার বেড়ে গিয়েছে, গোপাল। বুক যেন করাত দিয়ে চিরছে।"

ঠাকুর আশ্বাস দেন, "এজন্য ভেবো না, ও তোমার হরিবাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে। ও একটু থাকা ভাল। খুব বেশী কষ্ট হলে, কিছু খেয়ো।"

নিরন্তর লীলাময় ইষ্টদর্শনের পর্যায়টি গোপালের মায়ের সাধন জীবনে এসে উপস্থিত হয়েছিল একটা দুরন্ত ঝড়ের মতো। এই ঝড়ের মাতামাতি একটা প্রমত্ত আবেশের মতো, ঘোরের মতো, সর্বক্ষণ জেগে থাকতো তাঁর দেহে মনে সর্বসত্তায়। ধ্যান জপ, রন্ধন, আহার বিহার সব কিছু ক'রে যেতেন যন্ত্রচালিতের মতো। প্রায় দুই মাস বাদে ইষ্টদর্শন ও ইষ্টলীলা স্ফূর্তির এই প্রমত্ততা শান্ত হয়ে আসে, নূতনতর ও উচ্চতর সাধনভূমিতে প্রতিষ্ঠিতা হন গোপালের মা।

এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন:

"অনবরত দুই মাস কাল কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্র বুকেপিঠে করিয়া একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। ভাবরাজ্যে এই রূপ দীর্ঘকাল বাস করিয়া 'চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যামে'র প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন মহাভাগ্যবানেরই সম্ভবে। একে তো শ্রীভগবানের বাৎসল্যরতিই জগতে দুর্লভ—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞানের লেশমাত্র মনে থাকিতে উহার উদয় অসম্ভব—তাহার

উপর সেই রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সহায়ে ঘনীভূত হইয়া শ্রীভগবানের এইরূপ দর্শনলাভ করা যে আরও কত দুর্লভ তাহা সহজে অনুমিত হইবে।

"প্রবাদ আছে, 'কলৌ জাগর্তি গোপালঃ', 'কলৌ জাগর্তি কালিকা' —তাই বোধহয় অদ্যাপি শ্রীভগবানের ঐ দুই ভাবের জ্বলন্ত উপলব্ধি কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়।

"...শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার খুব হয়েছে। কলিতে এরূপ অবস্থা বরাবর থাক্‌লে শরীর থাকে না।' বোধহয় ঠাকুরের ইচ্ছাই ছিল, বাৎসল্যরতির উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণীটির ভাবপূত শরীর লোকহিতায় আরও কিছুদিন এ সংসারে থাকে। পূর্বোক্ত দুই মাসের পরে গোপালের মা'র দর্শনাদি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন।"

সে-বার ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস রথ-উৎসব দর্শনের জন্য কলকাতার বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে এসেছেন। বসু পরিবারের সবাই ঠাকুরের ভক্ত। বলরাম ও তাঁর ভক্তিমতী গৃহিণী তো তাঁকে জ্ঞান করেন দেবমানব রূপে, পরমাশ্রয় রূপে।

ঠাকুর নিজ মুখে প্রায়ই বলতেন, ভক্ত বলরামের অন্ন—শুদ্ধ অন্ন। তাই কলকাতায় এলে তাঁর ভবনেই উঠতেন এবং ঠাকুরকে কেন্দ্র ক'রে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতো সারা অঞ্চলে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আরো একটি কথা বলতেন, "বলরামের বাড়ি হচ্ছে মা-কালীর কেল্লা। অর্থাৎ তা ছিল মা-কালীর সঙ্গে একাত্মীভূত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। উত্তরকালে ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্যদের অনেকেই প্রয়োজন বোধে বলরাম বসুর ভবনে এসে বাস করতেন।

সেদিন রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কয়েক জন অন্তরঙ্গ ভক্ত

সঙ্গে নিয়ে বলরাম ভবনে গিয়ে উপস্থিত। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে তখন দিব্য আনন্দের ধারা উৎসারিত হতে থাকে।

ঠাকুরের মেয়ে ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বলরাম বসুর নিজ পরিবারের মেয়েরা তো রয়েছেনই, আরো এসেছেন তাঁদের বহু আত্মীয়া, কুটুম্বিনী ও বান্ধবীরা

অন্দর মহলে মেয়েরা ঠাকুরের জন্য জলযোগের বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে এবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। কামগন্ধহীন এই মহাসাধকের সঙ্গে পরিচিত ভক্ত মেয়েদের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সবাই সানন্দে তাঁকে ঘিরে বসেছেন, নানা কথাবার্তা ও আনন্দরঙ্গ হচ্ছে।

এখানে বসে, খেতে খেতে, ঠাকুর গোপালের মা'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। বললেন, "ওগো, সেই যে কামারহাটি থেকে বামুনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব—তার কত কি সব দর্শন হয়েছে! সে বলে, গোপাল—জ্যান্ত গোপাল—তার কাছে এসে উপস্থিত হয়। কত কি দুষ্টুমি করে, আবার তার কাছ থেকে হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন ঐসব কত কি দেখে শুনে, ভাবে ও প্রেমে উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হলো। থাক্‌তে বললুম, কিন্তু থাকলো না। যাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ—গায়ের কাপড় খুলে ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়ে যাচ্ছে। হুঁশ নেই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে, বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দি। খুব ভক্তি বিশ্বাস—বেশ! তাকে এখানে তোমাদের এই আনন্দের হাটে আনতে পাঠাও না।"

বলরাম বসুর কানে গেল ঠাকুরের এই কথা কয়টি। তৎক্ষণাৎ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তিনি কামারহাটিতে একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন গোপালের মাকে নিয়ে আসতে। ভাবলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো রথ উপলক্ষে আরো দুদিন তাঁর ভবনে অবস্থান করবেন, ইতিমধ্যে গোপালের মা এখানে এসে পড়ুন, সবাই মিলে আনন্দ করা যাবে।

সন্ধ্যার পর বলরাম ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সবাই উৎসবে মত্ত। কখনো ভক্তি সংগীত চলছে, কখনো ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে

তাঁরা নানা উপদেশ বাণী শ্রবণ করছেন। হঠাৎ দেখা গেল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। বালগোপালের ধাতুমূর্তি যেমন দুই জানু ভূমিতে রেখে হামা দেবার ভঙ্গীতে বসে এবং হাত উত্তোলন ক'রে ক্ষীর ননীর জন্য আবদার করে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে ঠাকুর স্থির হয়ে বসে আছেন। দিব্য আনন্দের ছটায় তাঁর চোখ-মুখ উদ্‌ভাসিত। সতৃষ্ণ নয়নে যেন অদৃশ্যা সূক্ষ্মলোকচারিণী মাতা যশোমতীর পানে তাকিয়ে আছেন।

এই অপূর্ব ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ ক'রে উপস্থিত ভক্ত নরনারীরা অপার আনন্দে অভিভূত। ঠিক এই সময়ে ভক্ত বলরামের প্রেরিত গাড়ি গোপালের মাকে নিয়ে সদর দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। গোপালের মা ছুটে আসেন দোতলার ঘরে, গোপালভাবে আবিষ্ট ঠাকুরকে দর্শন করতে থাকেন নির্নিমেষে।

উপস্থিত ভক্ত শিষ্য ও দর্শনার্থীরা বুঝতে পেরেছেন, গোপালের মা'র ভক্তির জোরেই ভক্তাধীন শ্রীরামকৃষ্ণের এ আবেশ ঘটেছে। সবাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপালের মাকে আদর ও সম্মান জানাতে থাকেন। কেউ কেউ বলতে লাগলেন, "আপনি মহা ভাগ্যবতী। আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্যই ঠাকুর গোপালভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। আমরা এ দৃশ্য দেখে ধন্য হলাম।"

কিন্তু ইষ্টদেব বালগোপালের সদা চঞ্চল, সদানন্দময় রূপটিই গোপালের মা'র বেশী প্রিয়। দিব্যভাবে আবিষ্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণ নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে আছেন, এতে গোপালের মা'র মন তেমন ভরে উঠছে না। তিনি বললেন, "আমি কিন্তু বাপু, ভাবে অমন কাঠ হয়ে যাওয়া ভালবাসিনে। আমার গোপাল হাসবে খেলবে বেড়াবে দৌড়বে, তা নয়।—ও মা, ও কি! একেবারে যেন কাঠ, আমার অমন গোপাল দেখে কাজ নেই।"

কামারহাটিতে দত্তগিন্নির বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম যেদিন গিয়েছিলেন, সেদিনও ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও শ্যামা সংগীত করতে গিয়ে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। সেদিনও তাঁর বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থা ও

নীরব নিস্পন্দ দেহ দেখে আঁতকে উঠেছিলেন গোপালের মা। মধুময় বাৎসল্যে ভাবিতা এই তাপসী সেদিনও চমকে উঠে বলেছিলেন, "ও বাবা, তুমি অমন হয়ে গেলে কেন? আমাদের সঙ্গে হেসে খেলে কথা বলো, আনন্দ করো।"

দুদিন বলরাম বসুর ভবনে অবস্থানের পর ঠাকুর নৌকো ক'রে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন। সঙ্গে চললেন কালীপ্রসাদ, (উত্তরকালের স্বামী অভেদানন্দ), আরো দু একটি তরুণ ভক্ত, স্ত্রীভক্ত গোলাপ-মা এবং গোপালের মা।

গোপালের মা এ দুদিন বলরাম বসুর বাড়ির সকলের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছেন। সবাই ঠাকুরের মুখে এই ভক্ত সাধিকার অলৌকিক দর্শনাদির কাহিনী শুনেছেন, উচ্ছ্বসিত নানা প্রশংসাবাদও শুনেছেন। তাঁর নৈষ্ঠিকতা ও ত্যাগ বৈরাগ্যময় আচরণ দেখে বাড়ির মহিলারা অতিশয় মুগ্ধ। গোপালের মা'র দুঃখ দারিদ্র্য ও অসহায়তার কথা শুনেও তাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়েছে। তাই বিদায় নেবার সময় ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে তাঁরা একজোড়া থান কাপড় ও রান্নাঘরের প্রয়োজনীয় কয়েকটা হাতা বেড়ি, খুন্তি তাঁকে দিয়ে দিলেন।

বাড়ির মেয়েরা ভালবেসে, শ্রদ্ধা ক'রে তাঁকে এসব দিচ্ছেন, নেবার ইচ্ছে না থাকলেও গোপালের মা তাঁদের নিষেধ করেন কি ক'রে? তাছাড়া, নতুন পরিচয়, এস্থলে নিজস্ব মতামত সম্পর্কে সোচ্চার হওয়া যায় না। তাই মেয়েদের দেওয়া এ বস্তুগুলো তিনি ফিরিয়ে দিতে পারলেন না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা সবাই নৌকোয় গিয়ে বসেছেন। বাড়ির মেয়েরা গোপালের মাকে দেওয়া তাঁদের জিনিসগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে নৌকোর একধারে রেখে দিয়ে এলেন।

বাগবাজারের গঙ্গার ঘাট ছেড়ে আসার পর ঠাকুরের দৃষ্টি পড়ে ঐ পুঁটুলির ওপর। "ওটি কার গো?"—এ প্রশ্ন করতেই জানা গেল, বলরাম ভবনের অন্তঃপুরিকারা গোপালের মা'র জন্য কতকগুলো প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়ে দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দময় ঠাকুর একেবারে গম্ভীর হয়ে ওঠেন। মুখ ফিরিয়ে নেন গোপালের মা'র দিক থেকে। তারপর অপর স্ত্রী-ভক্ত গোলাপ-মাকে লক্ষ্য ক'রে বলতে থাকেন, "ছ্যাখো, যে আসল ত্যাগী সে-ই ভগবানকে পায়। যে লোকের বাড়িতে খেয়েদেয়ে শুধু হাতে চলে আসে, সে ভগবানের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে।"

নৌকো দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে ভিড়লো। এতটা পথ একত্রে আসা হয়েছে, কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ একটিবারও গোপালের মা'র দিকে তাকান নি, তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলেন নি। গোপালের মা মরমে মরে গিয়েছেন। অনুশোচনার আগুন জ্বলছে তাঁর অন্তরে। কেন ও-বাড়ির মেয়েদের দেওয়া জিনিসগুলো তিনি গ্রহণ করলেন? ইতিমধ্যে দু'একবার ভেবেছেন, 'দিই, ছাই এ পুঁটুলীটা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে।' কিন্তু সবার সামনে আবার একটা নূতন বিতর্কের সৃষ্টি করতে, নাটকীয়তা করতে, সঙ্কোচ বোধ হয়েছে তাঁর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই নীরব বিমুখতার ভেতর দিয়ে ত্যাগ তিতিক্ষা সম্পর্কে এমন একটা মৌল শিক্ষা সেদিন গোপালের মায়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করলো, উত্তর জীবনে যা তিনি কোনোদিনই আর বিস্মৃত হতে পারেন নি।

দক্ষিণেশ্বরে পেঁৗছেই গোপালের মা ত্রস্তপদে উপস্থিত হন ঠাকুরের পত্নী সারদাদেবীর কাছে। শঙ্কাভরা কণ্ঠে বলেন, "ও বৌমা, গোপাল এ সব জিনিসের পুঁটুলী দেখে রাগ করেছে। এখন উপায়? তা এসব আর কামারহাটিতে নিয়ে যাবো না, এখানেই বিলিয়ে দিয়ে যাই।"

দয়া ও সহানুভূতিতে সারদামণির হৃদয় সদা পূর্ণ। বৃদ্ধাকে তিনি বার বার সান্ত্বনা দেন, "উনি বলুন গে। তোমার দেবার তো আর কেউ নেই, তা তুমি কি করবে, মা? দরকার বলেই তো ওরা দিয়েছে, আর তোমাকেও আনতে হয়েছে।"

একথা শুনেও গোপালের মায়ের ভয় ও আড়ষ্টতা দূর হয় না। পুঁটুলী থেকে বার ক'রে কিছু কিছু কাপড় ও জিনিসপত্র দক্ষিণেশ্বরে একে ওকে তখনি বিলিয়ে দিলেন।

এখানে এলেই গোপালের মা নিজ হাতে ঠাকুরকে তাঁর প্রিয় দু'একটা তরকারী রেঁধে খাওয়ান। সেদিন ভয়ে ভয়ে রান্না করলেন, সসঙ্কোচে নীরবে পাশে বসলেন তাঁকে খাওয়াতে।

অনুতাপের আগুন জ্বলছে গোপালের মা'র অন্তরে, অন্তর্যামী ঠাকুর তা বুঝেছেন। এবার ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। আবার পূর্ববৎ হাসি আনন্দে উচ্ছল হয়ে গোপালের মা'র সঙ্গে নানা কথাবার্তা তিনি বলতে থাকেন। বৃদ্ধা তাপসী এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ইষ্টদেব বালগোপাল এবং তাঁর একান্ত ভক্ত গোপালের মা'র দিব্য অনুভূতিময় সম্পর্ক সম্বন্ধে সারদানন্দজী যা লিখেছেন, তা সাধনপ্রয়াসী মানুষ মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখেছেন :

"—প্রতিদিনই গোপালের মা দিনের মধ্যে দুই দশবার তাঁর গোপালের দর্শন পাইতেন, আবার যখনই কোন বিষয়ে তাঁর শিক্ষার প্রয়োজন তখনই গোপাল সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া সঙ্কেতে, কথায় বা নিজে হাতে-নাতে করিয়া দেখাইয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করিতেন। ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বার বার মিশিয়া যাইয়া তিনি গোপালের মাকে শিখাইয়াছিলেন, বালগোপাল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন। খাইবার শুইবার জিনিস ভাবিয়া চিন্তিয়া লইয়া কি ভাবে তাঁহার সেবা করা উচিত তাহা শিখাইয়াছিলেন, আবার কোন কোন বিশেষ বিশেষ রামকৃষ্ণভক্তদিগের সহিত একত্র বিহার করিয়া বা তাঁহাদের সহিত একত্র বিহার করিয়া বা তাঁহাদের সহিত অন্য কোনরূপ আচরণ করিয়া দেখাইয়া নিজ মাতাকে (গোপালের মাকে) বুঝাইয়াছিলেন ইহারা ও তিনি অভেদ—ভক্ত ও ভগবান এক। কাজেই তাঁহাদের ছোঁয়াল্যাপা বস্তু ভোজনেও গোপালের মার দ্বিধা ক্রমে দূর হইয়া যায়।"

প্রকৃতপক্ষে সাধন ও গুরুকৃপার বলে বালগোপালের স্বরূপ ও মহিমা গোপালের মা দিনের পর দিন যত বেশী উপলব্ধি করছিলেন, ততই হয়ে যাচ্ছিলেন গোপালময়।

সেবার কয়েকজন ধনী শেঠ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন বহু রকমের ফল মিছরি মিঠাই। এমন সময়ে গোপালের মা এবং আরো কয়েকজন স্ত্রীভক্ত ঠাকুরের কক্ষে এসে উপস্থিত। ঠাকুর তখনি উল্লসিত হয়ে গোপালের মা'র কাছে এসে দাঁড়ান, তাঁর গায়ে মাথায় পায়ে হাত বুলোতে থাকেন। দীর্ঘদিন পরে মাকে দেখতে পেয়ে ছেলে যেমন ভাবাবেগে উচ্ছল হয়, মাকে আদরযত্ন করে, তেমনি করছেন ঠাকুর। মাঝে মাঝে গোপালের মা'র সম্পর্কে সবাইকে বলছেন, "এ খোলটায় ভেতর কেবল হরিতে ভরা। এ শরীর হরিময়।"

গোপালের মাও বাৎসল্যরসের আবেগ তরঙ্গে তখন অভিভূত। বহুজনের নমস্য, প্রখ্যাত মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পায়ে হাত বুলোচ্ছেন, তাতে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, সংকোচ বা ভাববৈলক্ষণ্য নেই।

এ সময়ে ধনী ভক্তেরা যা কিছু ভালো ভালো মিঠাই ঠাকুরকে ভেট দিয়েছেন তা থেকে বেছে বেছে নিয়ে ঠাকুর পরম যত্নে বৃদ্ধাকে খাওয়াতে লাগলেন। এভাবে প্রায়ই প্রাণের আশ মিটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালের মাকে ভালো ভালো দ্রব্য ভোজন করান।

বৃদ্ধা সেদিন প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালোবাসো কেন?"

ঠাকুর ততক্ষণে গোপালভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন। উত্তরে বলেন, "তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েছো।"

"আগে মানে? কবে খাইয়েছি?"

"জন্মান্তরে—" বলে চুপ করে যান ঠাকুর।

রাত হয়েছে। দর্শনার্থীদের অনেকেই ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। গোপালের মাও তাঁর আবাসে কামারহাটিতে ফেরবার জন্য ব্যস্ত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবার নিজে উঠে গিয়ে শেঠদের দেওয়া একতাল মিছরি এনে রাখলেন গোপালের মা'র সম্মুখে।

গোপালের মা তো অবাক্। বলেন, "গোপাল, একি করছো, সবগুলো মিছরি আমায় দিয়ে দিচ্ছো কেন ?"

ঠাকুর আদর ক'রে চিবুক স্পর্শ করলেন বৃদ্ধা তাপসীর। সহাস্যে মিষ্টি স্বরে বললেন, "ওগো, ছিলে গুড়, হলে চিনি, তারপর হলে মিছরি। এখন মিছরি হয়েছো। মিছরি খাও, আর আনন্দ করো।"

শেঠদের অনেকে বৈষয়িক কামনা বাসনা নিয়ে আসে, ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নানা মিষ্টদ্রব্য তারা দিয়ে যায়। কিন্তু এসব বস্তু ঠাকুর তাঁর অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তদের খেতে কখনো অনুমতি দেন না। বলেন, "বিষয়ীর দেওয়া জিনিসে বিষয়-বাসনার সূক্ষ্ম রেশ জড়িত থাকে, ত্যাগী সাধকদের ওসব খাওয়া ঠিক নয়।" কিন্তু গোপালের মা'র বেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের উল্টো বিধান। ভক্ত শিষ্যেরা বুঝলেন, এই বৃদ্ধা তাপসী সাধনার এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে তাঁর মন আর মলিন হবার নয়।

ঠাকুরের পীড়াপীড়িতে গোপালের মাকে সবগুলো মিছরি সঙ্গে নিতে হলো, তবে তিনি ছাড়া পেলেন সেখান থেকে।

ধ্যান জপ করার সময় গোপালের মা'র নানা দিব্য অনুভূতি লাভ হতো, বিচিত্র ধরনের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদিও ঘটতো। পূর্ব অভ্যাস মতো দক্ষিণেশ্বরে এলেই সবিস্তারে সরলভাবে এসব ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তিনি বিবৃত করতেন। ঠাকুর এবার এসব নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তাই বলেন, "না গো, দর্শনের কথা এখন থেকে আর কাউকে বলো না। বল্‌লে ওসব আর হয় না।"

গোপালের মা উত্তর দেন, "কেন ? সে সব তো তোমারই দর্শনের কথা। তাও তোমায় বলতে নেই ?"

"হ্যাঁ, এখানকার দর্শন-টর্শন হলেও আমায় কিছু বলবে না।" প্রশান্ত স্বরে বলে ওঠেন ঠাকুর।

ঠাকুরের কথায় গোপালের মা'র ষোল আনা বিশ্বাস। বলা বাহুল্য,

অতঃপর তিনি নিজের এসব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রায় নীরব হয়ে গেলেন।

একদিন ভক্তপ্রবর নরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বসে ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন।

এমন সময়ে গোপালের মা সেখানে এসে উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বালকের মতো সদানন্দময় এবং রহস্যপ্রিয়। সুযোগ পেলেই ভিন্ন রুচি ও মতবাদের লোকদের ভেতর বিতর্ক বাধিয়ে দিতেন, বসে বসে তা শুনতেন আর মজা দেখতেন।

তাঁর ইচ্ছে হলো, নরেন আর গোপালের মা, এ দুয়ের ভেতর সেদিন একটা ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন।

নরেন ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী, ইংরেজীতে পারঙ্গম ; আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব তিনি ভালো জানেন। সেই সঙ্গে বেদান্তের বিচারশীলতা ও জ্ঞানধর্মী সাধনার দিকে তাঁর প্রবল ঝোঁক। তাঁর সম্মুখে ঠাকুর ঠেলে দিচ্ছেন বৃদ্ধা ভক্ত গোপালের মাকে, যিনি একজন নিরক্ষর সরলবিশ্বাসী কাঙালিনী গ্রাম্য মহিলা—নৈষ্ঠিকতা আর জপতপের ওপর ভরসা ক'রে যিনি ভগবানের চরণ লাভ করতে চান।

কৌতুকী ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেন, "ওগো, কি ভাবে গোপালের দর্শন তুমি পেলে, আর তারপর থেকে গোপাল তোমার সঙ্গে যত সব দুষ্টুমি করলে, লীলাখেলা করলে, সব নরেনকে একবার খুলে বল তো। সে কি বলে, তা একবার শোনা যাক্।"

উত্তরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন গোপালের মা, "তাতে কোনো দোষ হবে না তো, গোপাল ?"

"না, না, আমি বলছি, কোনো দোষ হবে না। সব কথা ওকে বল দিকিনি।" আশ্বাস দেন রামকৃষ্ণ।

ইষ্টদেব বালগোপালের আবির্ভাব এবং লীলা চঞ্চলতার কথা গদ্‌গদ স্বরে গোপালের মা এবার বর্ণনা করতে থাকেন নরেনের কাছে। কামারহাটি থেকে দক্ষিণেশ্বর তিন মাইল পথ, এই সারা

পথটা গোপাল তাঁর কোলে চেপে এসেছে। তারপর দিনে রাতে সব সময়ে কত দৌরাত্ম্য করেছে—কাঠ কুড়িয়েছে গোপালের মা'র সঙ্গে, রান্নার সময় ঘুরঘুর করেছে তাঁর চারপাশে, খেয়েদেয়ে শয়ন করেছে তাঁর খাটের ওপর। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে কতবার বার হয়ে এসেছে গোপাল। আবার তাঁরই অঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এই গোপাল—গোপালের মা'র দুষ্টু গোপাল। আদর জানালে সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে আবার শাসন করতে গেলে ঠোঁট বাঁকিয়ে কত কেঁদেছে তাঁর কোলে বসে।

নরেন্দ্রনাথ মুখে জ্ঞান বিচারের ওপর জোর দিলেও তাঁর ভেতরটা ছিল ভক্তিপ্রেমে ভরপুর। সরলা বৃদ্ধা সাধিকা নিজ মুখে তাঁর ইষ্ট-লীলার এই প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। শুনে ভাবরসে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন নরেন্দ্রনাথ। আয়ত নয়ন দুটি তাঁর অশ্রুসজল।

কাহিনী শেষ ক'রে গোপালের মা প্রশ্ন করেন নরেনকে, "বাবা, তোমরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান—আর আমি মুখ্যু-সুখ্যু, কাঙালী, কোনো কিছুই জানিনে। আচ্ছা, তোমরা বল তো, আমি যা দেখেছি শুনেছি তা কি সব মিথ্যে ?"

"না মা, মিথ্যে নয়। যা যা তুমি দেখেছো, সব সত্যি।" দৃঢ়স্বরে বৃদ্ধাকে আশ্বাস দেন নরেন্দ্রনাথ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ খাটের ওপর বসে উৎসাহভরে দু'জনের বাক্যালাপ শুনছেন। এবার নরেনের কথা শুনে প্রসন্নতায় তাঁর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গোপালের মা'র বড় ইচ্ছে, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কামারহাটিতে নিয়ে, নিজ হাতের ভালো ভালো রান্না তাঁকে খাওয়াবেন। ঠাকুর তাই সেদিন তাঁর ওখানে এসেছেন। সঙ্গে তরুণ ভক্ত রাখাল।

গোপালের মা আনন্দে আত্মহারা। উৎসাহ ভরে ঠাকুরের প্রিয় শাক চচ্চড়ি সব রান্না করলেন, পরিতোষ সহকারে তাঁকে আর রাখালকে খাইয়ে শয়ন করতে দিলেন দোতলার একটি খালি ঘরে।

এসময়ে ঠাকুরের প্রেতদর্শনের একটি কৌতূহলজনক কাহিনী বর্ণনা করেছেন স্বামী সারদানন্দ :

"ঠাকুর বলেছেন, একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো, তারপর দেখি ঘরের কোণে দুটো মূর্তি! বিট্‌কেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে নাড়িভূঁড়িগুলো ঝুলছে; আর মুখ হাত পা– মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়গোড় সাজানো দেখেছিলাম (মানুষের অস্থি কঙ্কাল)—ঠিক সেই রকম! তারা আমায় অনুনয় করে বলছে, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের (নিজেদের অবস্থার কথা মনে পড়ে বোধহয়) বড় কষ্ট হচ্ছে।'

"—এদিকে তারা ঐরূপ কাকুতি মিনতি করছে, ওদিকে রাখাল ঘুমুচ্ছে। তাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে বটুয়া ও গামছাখানা নিয়ে চলে আসবার জন্য উঠছি, এমন সময় রাখাল জেগে উঠে বললো—'ওগো তুমি কোথায় যাও?' আমি তাকে 'পরে সব বলবো' বলে তার হাত ধরে নীচে নেমে এলাম ও বুড়ীকে (তার তখন খাওয়া হয়েছে মাত্র) বলে নৌকোয় গিয়ে উঠলাম। তখন রাখালকে সব বলি—ঐখানে দুটো ভূত আছে! বাগানের পাশেই কামারহাটির কল। ঐ কলের সাহেবেরা খানা খেয়ে হাড়গোড়গুলো যা ফেলে দেয় তাই শোঁকে (কারণ, ঘ্রাণ নেওয়াই ওদের ভোজন করা) আর ঐ ঘরে থাকে। বুড়ীকে ও-কথার কিছু বললুম না—তাকে ঐ বাড়ীতে সদা সর্বক্ষণ একলা থাকতে হয়—ভয় পাবে।"

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তখন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, অবস্থান করছেন কাশীপুরে। তরল জাতীয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু এসময়ে খেতে পারেন না। একদিন তাঁর ইচ্ছে হলো পালো-দেওয়া ক্ষীর খাবেন। ভক্ত যোগীনকে পাঠানো হলো কলকাতায়, ঐ রকমের ক্ষীর তিনি কিনে আনবেন।

কলকাতায় পৌঁছে যোগীন ভাবতে থাকেন, বাজারের ক্ষীরে

কত কি ভেজাল থাকে, তাতে ঠাকুরের গলার অসুখ হয়তো বেড়ে যেতেও পারে। বরং কোন ভক্তের বাড়ী থেকে খাঁটি ক্ষীর তৈরী করে নিয়ে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই চলে আসেন ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর ভবনে। সেখানে ক্ষীরের কথা উঠতেই পুরমহিলারা বলে ওঠেন, "ঠাকুর অসুস্থ, তাঁকে বাজারের ক্ষীর কেন খাওয়ানো হবে? আমরাই ঘরে পালো-দেওয়া ক্ষীর তৈরী করে দিচ্ছি। তবে, এতে কিছুটা সময় লাগবে। বিকেল বেলায় আমরা সব গোছগাছ করে দেবো।"

কথাগুলো যোগীনের মনঃপূত হলো ঐ বেলাটি বসু ভবনে তিনি অপেক্ষা করলেন, তারপর ক্ষীর নিয়ে বিকেলবেলায় পৌঁছুলেন কাশীপুরে। এদিকে দুপুরবেলার দিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। শেষটায় তার দেরি দেখে, নিত্যকার পথ্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হলো।

বিকেলে যোগীন কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। ঠাকুর মহা বিরক্ত। বললেন, "তোকে স্পষ্ট করে বলা হলো, বাজার থেকে ক্ষীর কিনে আনবি। তা খাবার জন্যেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল। কেন তুই ভক্তদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এ ক্ষীর করিয়ে আন্‌লি? তাছাড়া, এ ক্ষীর তো ঘন, গুরুপাক। ওকি খাওয়া চলবে? ও আমি খাবো না।"

নিজে এ খাদ্য বস্তুটি ঠাকুর স্পর্শও করলেন না! কিন্তু বলরাম ভবনের স্ত্রী-ভক্তেরা কত কষ্ট করে এটা তৈরী করেছেন। তাই বললেন, "এর সবটা তোরা গোপালের মাকে খাইয়ে দে। ভক্তের দেওয়া জিনিষ। ওর ভেতরে বালগোপাল রয়েছেন। ও খেলে আমারই খাওয়া হবে।"

তপস্বিনী গোপালের মায়ের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এমনিভাবে ঠাকুর এক একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করতেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর গোপালের মা গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন কামারহাটির মন্দির সংলগ্ন নিজের কক্ষে বসে একান্তে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

অতঃপর বিদেহী অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে কয়েকবার দর্শন দান করেন। তাঁর কৃপায় সাধন সম্পর্কিত কিছু কিছু নির্দেশও গোপালের মা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।

এসময়ে কোনো সময়ে নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ বোধ করলে তিনি বরানগর মঠে এসে ঠাকুরের ত্যাগী তরুণ ভক্তদের মধ্যে দু'চারদিন বাস করে যেতেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ কথা আলোচনা ক'রে লাভ করতেন পরম শান্তি।

সে-বার গঙ্গার ওপারে মাহেশে গোপালের মা প্রভু জগন্নাথদেবের রথ-উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছেন। সেখানে থাকাকালে হঠাৎ এক অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জেগে ওঠে তাঁর সারা সত্তায়। রথ-টানা শুরু হলে তিনি দর্শন করেন,—রথ, রথে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ, আর রথের রজ্জু যারা টেনে চলেছে, সবারই মধ্যে রূপায়িত ও চৈতন্যময় হয়ে উঠেছেন তাঁর ইষ্টদেব শ্রীশ্রীবালগোপাল। সর্বাতিশায়ী, বিশ্বচরাচরে ওতপ্রোত, শ্রীভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শনের পর তিনি আত্মহারা হয়ে যান।[১]

উত্তরকালে সেদিনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ ক'রে রামকৃষ্ণ শিষ্যদের কাছে তিনি বলেছিলেন, "তখন স্বর্গীয় আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। আমাতে আমি ছিলাম না। নেচে হেসে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম।"

হিন্দুধর্মের সনাতন বাণী ও বেদান্তের তত্ত্ব প্রচার ক'রে, আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেশে ফিরে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন কয়েকটি বিদেশিনী ভক্ত শিষ্যা।

---

১ ডিসাইপলস্ অব রামকৃষ্ণ : অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া।

মা-সারদামণি তখন বাগবাজারে অবস্থান করছেন। স্বামীজী এই বিদেশিনী ভক্তদের মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এদের সরলতা ও ভক্তিবিশ্বাস দেখে মা পুলকিত হয়ে ওঠেন, আপনার জন বলে সস্নেহে তাদের গ্রহণ করেন।

সিদ্ধা তপস্বিনী গোপালের মাকে বিদেশিনী ভক্তেরা দর্শন করুক, প্রাচীন ভারতের নৈষ্ঠিক সাধনার কিছুটা পরিচয় পেয়ে যাক্, এটাও স্বামীজীর ইচ্ছে। একদিন্ গোপালের মা'র সঙ্গে দেখা হতে বল্‌লেন, "আমার সব সাহেব মেম চেলারা আছে, তাদের তুমি কাছে আসতে দেবে তো? না—তোমার জাত যাবে?"

বৃদ্ধা গোপালের মা'র চোখে মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের দীপ্তি, বলেন, "সেকি বাবা, তারা সবাই তোমার সন্তান, তাদের যে আমি আদর ক'রে নাতি-নাতনী বলে কোলে নেব গো।"

বলা বাহুল্য, স্বামীজী এসময়ে গোপালের মা'র পূর্বেকার অতিরিক্ত নৈষ্ঠিকতা ও ছুৎমার্গী আচরণের কথা উল্লেখ ক'রে নানা হাস্যরসের অবতারণা করতে ছাড়েন নি।

যেভাবে ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদে ধীরে ধীরে গোপালের মা'র ভেতরে উদার মনোভাবের উদয় হয়, ঠাকুর এবং ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্পর্কে তিনি অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেন, তাও স্বামীজী সরসভাবে বর্ণনা করেন। একদিন গোপালের মা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খাদ্য পরিবেশন করছেন। ঠাকুর আনমনা ছিলেন, হঠাৎ ভাতের কাঠিটি ছুঁয়ে ফেলেন। পরিবেশনের পর গোপালের মা ঐ ভাতের কাঠিটি গঙ্গায় ফেলে দেন।

অচিরে ঠাকুরের প্রভাবে এই গোপালের মায়ের ভেতরেই এসে যায় বিস্ময়কর পরিবর্তন। একদিন প্রিয় ভক্ত নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখে আনন্দে অধীর। পরম সমাদরে তাঁকে সামনে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। মা ভবতারিণীর প্রসাদী পাঁঠার মাংস সেদিন রান্না হয়েছিল, তার একবাটি নরেন তৃপ্তি সহকারে উদরস্থ করলেন।

পাশে দাঁড়ানো একটি স্ত্রী-ভক্তকে ঠাকুর বললেন, "ওগো, মাংসের বাটিটা নিয়ে যাও, জায়গাটা ধুয়ে মুছে ফেল।"

কক্ষের এক কোণে গোপালের মা উপবিষ্টা। ঠাকুরের কথাটি কানে যাওয়া মাত্র তিনি ঝটিতি উঠে এলেন, হাড়গোড় ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ নিজ হাতে তখনি পরিষ্কার ক'রে ফেললেন।

ঠাকুর মহাখুসী! স্ত্রী-ভক্তদের বললেন, "ছাখো ছাখো, দিন দিন কি উদার হয়ে যাচ্ছে।" প্রেমের দৃষ্টি খুলে গিয়েছে, তাই কোনো ভেদরেখাই আর গোপালের মায়ের দৃষ্টির সামনে নেই।

প্রসন্ন মনে পুরনো দিনের সেই সব মধুর স্মৃতিকথা বর্ণনা করার পর গোপালের মাকে বলে দিলেন বিবেকানন্দ, "আমার বিদেশিনী ভক্তেরা একদিন তোমায় দর্শন করতে যাবে। তাহলে, ঠাকুমার মতোই তাদের নিয়ে আনন্দ ক'রো, আর দেখো, তোমার আর তোমার বালগোপালের আশীর্বাদ তারা যেন পায়।"

অতঃপর কামারহাটিতে গোপালের মা'র কাছে গিয়ে একদিন উপস্থিত হন মিসেস সারা বুল্ (সারা), মিস্ জে ম্যাকলাউড (জয়া) এবং নিবেদিতা। বৃদ্ধা আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন তাঁদের দেখে। প্রত্যেককে চিবুক ধরে আদর করেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বিবৃত করেন তাঁর অলৌকিক লীলা দর্শনের কথা। নিজের বিছানায় বসিয়ে আদর ক'রে তাঁদের মুড়ি বাতাসা ভোজন করান।[১]

গুরু বিবেকানন্দের স্মৃতিচারণ গ্রন্থে গোপালের মা'র সম্পর্কে নিবেদিতা যে চিত্রটি এঁকেছেন তা অতি মনোরম:

"গোপালের মা এক বয়োবৃদ্ধা সাধিকা। পনের কুড়ি বছর আগে, তখনো তিনি যথেষ্ট প্রাচীন, সেই সময়ে একদিন দুপুর বেলায় তাঁর কামারহাটির গঙ্গাতীরস্থিত ক্ষুদ্র আবাসটি থেকে পদব্রজে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। শোনা যায় ঠাকুর যেন তাঁরই জন্য প্রতীক্ষমাণ হয়ে সেদিন তাঁর কক্ষের

---

১ দেবী অঘোরমণি: স্বামী নির্লেপানন্দ (গোপালের মায়ের ভক্ত ও সেবিকা কুসুমদেবীর থেকে সংগৃহীত।)

দ্বারদেশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই বৃদ্ধা নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণী, যিনি তাঁর বালগোপালের আরাধনা এতদিন ক'রে আসছিলেন, ঠাকুরের মধ্যে সেই ইষ্টদেবকে দর্শন ক'রে অনিবার্যভাবে বাঁধা পড়ে যান তাঁর কাছে। ঠাকুরের প্রতি তাঁর এই গোপলভাব পরিণত হয়েছিল এক গভীর সত্য উপলব্ধিতে। ফলে এরপর আর কখনো তিনি প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করতে পারেন নি, কারণ ঠাকুরও যে গোপালরূপী হয়ে তাঁকে মা বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি আমাদের শ্রীমাকে কখনো 'বৌমা' ছাড়া আর কিছু বলে সম্বোধন করেছেন, এমন শোনা যায় নি।

"শ্রীমা এবং তাঁর স্ত্রী-ভক্ত ও সেবিকাদের সঙ্গে অবস্থান করার কালে আমি গোপালের মাকে কলকাতায় কখনো শ্রীমায়ের কাছে বাস করতে বা কয়েক সপ্তাহ কামারহাটিতে কাটিয়ে আসতে দেখেছি।

"এক পূর্ণিমা রাত্রে তাঁর দর্শনের জন্য আমাদের মধ্যে কয়েকজন কামারহাটিতে গিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত অপরূপ সুন্দর গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নৌকা ধীরে ধীরে ঘাটে উপস্থিত হয়। নদীজল থেকে মন্দির-বাগানের উঁচু চত্বরের দিকে উঠে-যাওয়া দীর্ঘ-বিন্যস্ত প্রশস্ত সিঁড়িগুলি—তাও বা কি মনোরম। সেই সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে, সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণের অপর দিকে, নিভৃত অবরোধতুল্য বারান্দায় ছোট্ট একটি ঘর। এক সময়ে এটি হয়তো বাগানস্থিত অট্টালিকার প্রান্তে নির্মিত হয়েছিল ভৃত্য বা মালীদের জন্য। সেই ঘরটিই গোপালের মার আবাস। তাতে অবস্থিত থেকেই বছরের পর বছর ধরে চলেছে তাঁর জপতপ। অট্টালিকাটি এখন শূন্য পড়ে আছে। গোপালের মার থাকবার ছোট ঘরটিতেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যৎসামান্য ব্যবস্থাটুকুও নেই। মেজেটি পাথরে নির্মিত। সেই মেঝেতেই তিনি শয়ন ক'রে থাকেন।

"বিদেশিনী অভ্যাগতদের বসবার জন্য যে মাদুর পেতে দিলেন, তা তাকে গুটিয়ে রাখা ছিল—সেখান থেকে পেড়ে এনে মেঝের ওপর বিছিয়ে দিলেন। কিছু মুড়ি আর বাতাসা একটি মাটির হাঁড়িতে

শিকের ওপর ঝোলানো ছিল, তাই দিয়েই হল বিদেশিনী অতিথিদের অভ্যর্থনা। কক্ষটি পবিত্র এবং পরিষ্কার। কষ্ট ক'রে গঙ্গা থেকে জল তুলে এনে স্থানটি তিনি প্রতিদিন ধোয়া-মোছা করেন। নিকটস্থ কুলঙ্গীতে রক্ষিত আছে এক খণ্ড রামায়ণ, পুরনো এবং ভাঙাচোরা বড় চশমাখানি, আর নিত্যকার ব্যবহার্য জপের মালার সাদা ছোট ঝোলাটি। এই পবিত্র মালা জপ ক'রেই সাধিকা গোপালের মা তাঁর অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধ হয়েছেন। অদ্ভুত তাঁর সাধনার নিষ্ঠা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দীর্ঘকাল এই জপমালা আবর্তিত হয়েছে তাঁর হাতে, ভাবতন্ময় হয়ে কাটিয়েছেন তিনি।

"চাঁদিনী রাত্রের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে আশে পাশে—শির দুলিয়ে কানাকানি করছে কৃষ্ণছায়ায় জড়ানো তরুলতা ও পুষ্পের গুচ্ছগুলো। মর্মরশুভ্র এক স্বপ্নলোকের অপরূপ দৃশ্য যেন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেখানে। কিন্তু গভীর প্রশান্তিতে ভরা গোপালের মা'র পবিত্র ক্ষুদ্র কক্ষটির চাইতে মহত্তর স্বপ্নলোক আর কী থাকতে পারে আমাদের কর্মচঞ্চল জাগতিক জীবনের কাছে!

"আ-হা!—এই হচ্ছে চির পবিত্র এবং ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষ—তোমরা যা দেখে আজ জীবনে নূতন আশ্বাস পেয়ে এলে।" স্বামীজী বলেছিলেন সেদিন তাঁর বিদেশিনী ভক্তদের। আরো বলেছিলেন, "এই হল অশ্রুজল ও প্রার্থনার ভারতবর্ষ! উপবাস ও নিষ্ঠার পবিত্র ভারতবর্ষ! এ ভারত ক্রমে বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে,—আর আমাদের ভেতর ফিরবে না কোনদিন।"

রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর মহান্ নেতা, বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের তখন তিরোধান ঘটেছে। এসময়ে কামারহাটি বাগানেই অবস্থান করছেন গোপালের মা। ঠাকুর ও স্বামীজীর অন্তর্ধানের পর থেকে সারদানন্দজী, নিবেদিতা এবং মঠের অন্যান্য সাধুরা সদাই বৃদ্ধা তাপসী গোপালের মা'র খোঁজখবর নিতেন। অসুখ বিসুখের সময় তাঁর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করতে এগিয়ে যেতেন।

গোপালরূপী রামকৃষ্ণর মা, গোপালের মা—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সবার দৃষ্টিতে এসময়ে অধিষ্ঠিতা হয়েছেন এক মাতৃকা-শক্তি রূপে। তাই তাঁর সেবা যত্নের জন্য সবাই উৎসুক হয়ে থাকতেন।

নির্লেপানন্দজীর লেখায় এ সম্পর্কিত তথ্য কিছু সংগৃহীত রয়েছে। তিনি লিখেছেন, "কামারহাটি বাগানে থাকাকালে—স্বামীজীর দেহ ত্যাগের পরে—গোপালের মার একবার কঠিন আমাশয় পীড়া হইল। এই সময়ে সেবিকা কুসুম তিনমাস একাদিক্রমে তাঁহার সেবা করেন। পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ, নিবেদিতা ও আর একটি মেয়েকে (নিবেদিতার পরিচারিকা বেট ?) লইয়া প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। হোমিওপ্যাথী ঔষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গণেন ব্রহ্মচারী ঔষধ দিয়া আসিতেন। একটি ঝি ছিল। রাত্রে ঘরের কোণে চওড়া দালানে একটি লণ্ঠন জ্বলিত। যে ঘরে তিনি শয়ন করিতেন, সে ঘরে কাহাকেও শয়ন করিতে দিতেন না।"

আরো পরে, গোপালের মা যখন বার্ধক্যের ভারে অশক্ত ও পীড়িত হয়ে পড়েন, তখন তাঁর সেবাশুশ্রূষা ও বাসস্থানের একটা নূতনতর সুব্যবস্থার জন্য স্বামী সারদানন্দ চিন্তিত হয়ে ওঠেন। এসময়ে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন ভগিনী নিবেদিতা। বলেন, "আপনি এজন্য ভাববেন না, ইনি আমাদের সদানমস্য তাপসী, ঠাকুরের মা, স্বামীজীর পরম শ্রদ্ধার বস্তু। এঁর ভার আমিই নেব সানন্দে। আমার বোস-পাড়ার গৃহেই ইনি থাক্‌বেন। সেবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা সবাই মিলে আমরা করবো। আপনারাও কাছেই আছেন, সব সময়ে এসব ব্যবস্থা তদারক করতে পারবেন।"

স্বামী সারদানন্দের মন থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। নিবেদিতার গৃহে গোপালের মাকে স্থানান্তরিত করতে তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমতি দিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্পর্শগুণে গোপালের মা'র মধ্যে সাধিত হয়েছে এক দূরপ্রসারী রূপান্তর, চির অভ্যস্ত নৈষ্ঠিক জীবনে এসেছে ভেদ-বৈষম্যহীন উদার আত্মিক ভাবধারা। সবই হয়ে উঠেছে গোপালময়।

তাই আশেপাশের সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিয়ে গোপালের মা প্রবেশ করলেন নিবেদিতার বাসাবাড়ির একটি কক্ষে।

নিবেদিতার কাছে গোপালের-মা শ্রীমায়ের মতোই আর একটি আশ্চর্য আত্মারূপে প্রতীয়মান—সুতরাং তাঁকে কাছে পেয়ে নিবেদিতার আনন্দের অবধি নেই। সে আনন্দের আবেগ তিনি অনেকবারই চিঠিতে প্রকাশ করেছেন। ২ই ডিসেম্বর ১৯০৩, এক বান্ধবীকে লিখছেন—"গোপালের মার কাছে থাকলে অন্তরে একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে। সেন্ট এলিজাবেথের কথাগুলি কানে বাজে: 'কী এমন আমি যে, আমার ঠাকুরের মা আমায় দেখতে আসবেন?' গোপালের মা'র যে পরমহংস অবস্থা, এ আমি বিশ্বাস করি। মনে হয়, যদি শুধু ওঁকেই পূজা করতে পারি, তাহলেই যাদের ভালবাসি, তাদের পরে বিধাতার আশীর্বাদ অজস্র হয়ে ঝরে পড়বে। এর বেশী আর কী বলব!" (নিবেদিতা: লিজেল রেমঁ; অনুবাদ: নারায়ণী দেবী।)

অপর একটি চিঠিতে মিসেস বুলকে জানাচ্ছেন—"গতবার তোমায় লিখে উঠতে পারিনি, কারণ, গোপালের মা এখানে এসে উপস্থিত। তিনি এক সপ্তাহ এখানে আছেন। কী অসাধারণ লাগছে—অনুভব করতে পারো।"

ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন নিবেদিতা—"গোপালের মা এখানে আছেন। আমার কী যে আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, তিনি আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আহা, আমাদের আদরের ছোট্ট ঠাকুরমা!"

গোপালের মাকে নিজের বাসভবনে, নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে নিবেদিতা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিলেন। সেবা শুশ্রূষা ও নিত্য প্রণামের অধিকার পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন তিনি। এ সময়কার এক মনোরম আলেখ্য পাই লিজেল রেমঁ-এর বর্ণনায়:

"ভোরবেলায় নিবেদিতা তাঁর দোরগোড়ায় গিয়ে বসে থাকেন, কখন বুড়ি ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলবেন, এই প্রতীক্ষায়। এমনি

প্রতিদিন। গোপালের মা হয়ত স্তব পড়ছেন কি জপ করছেন। নিবেদিতাকে দেখলেই তাঁর বলিকুঞ্চিত মুখ খুশির হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে। নিবেদিতাকে কাছে টেনে এনে একটু ফল মিষ্টি মুখে তুলে দেওয়া চাই-ই রোজ।

"গোপালের মা'র ঘরে ঠাকুরদের আনাগোনা চলে, কিন্তু তাঁদের কথা বুড়ি মুখেও আনবেন না। কথা কইলেই তাঁরা নাকি ভয় পান। ঘরের বাতাস ভরে আছে গোপালের বাঁশির সুরে, সে সুরও যায় থেমে। এ খবরটি নিবেদিতার মোটেই অজানা নয়, তাই তিনি চুপ করে থাকেন।

"রাতে যখন গোপালের মা কষ্ট পান, নিবেদিতা গা-হাত-পা টিপে দেন। মা যেমন রুগ্ন মেয়ের যত্ন করে, তেমনি যত্ন করেন তাঁর। জগদীশ্বরী যেন অসহায় দুর্বল সেজে সেবা নিতে এসেছেন, এমনি মনে হয় নিবেদিতার। নিজের মায়ের কোন সেবাতেই তো লাগেন নি, গোপালের মা যেন নিবেদিতার সেই মা-জননী।"

গোপালের মা'র জীবনে অতঃপর আসে চিরবিরতির পালা। প্রয়াণকালের দৃশ্যটির এক মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা পাই নিবেদিতার ভাবাপ্লুত ভাষায়[১] :

'সারারাত্রি ধরে আমরা মুমূর্ষুর ধীর গভীর শ্বাসের ওঠা-পড়া লক্ষ্য করছিলাম। গভীরে, আরো গভীরে, আরো আরো গভীরে—স্ফীত, পরিস্ফীত শ্বাস প্রবেশ করে যায়, মনে হয় ঐ অতি প্রাচীন দেহ বুঝি সব স্পন্দন হারিয়ে ফেলল—তারপরেই শ্বাসমুক্তি, পর পর কয়েকটি দ্রুত অন্তঃশ্বাস। এরকম শ্বাসগতি নাকি কদাচিৎ দেখা যায়—বহু বৎসরের প্রাণায়ামের ফলেই এ জিনিস হওয়া সম্ভব। জপমালা হাতে এই বৃদ্ধা 'গোপালমন্ত্র' জপ ক'রে গেছেন দিবারাত্র, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে, সেই সময়ে অসচেতনেই নিরন্তর ঘটে গেছে প্রাণায়াম।

১ স্টাডিজ ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোম—নিবেদিতা। অনুবাদ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

'কেননা—ইনি যে গোপালের মা। যাঁর পাশে বসে ছিলাম আমরা—যাঁকে দেখছিলাম ইনি সেই সিদ্ধা তাপসী, যাঁকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মায়ের মতো দেখতেন।

'শায়িত তপস্বিনী। অনুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নেই তাঁর, কোনোদিনই ছিল না তা। একটি ভাবে শুধু মন স্থির—যা তাঁর জীবনসর্বস্ব। সেই ভাবেরই আনন্দে ও পরমা শান্তির শেষ কিরণে উদ্ভাসিত আনন। এই ভাবেই গঙ্গাতীরে শুয়ে আছেন পূর্ণ এক রাত্রি ও একদিন। পূর্ণিমার চাঁদ যখন আকাশে উঠেছিল, তখন আমরা তাঁকে দুয়ারের বাইরে এনেছিলাম। পার্থিব বন্ধনের প্রথম বেষ্টনী গৃহবন্ধনকে যখন তিনি পেরিয়ে গেলেন জয়হর্ষের সঙ্গে—আমরা অনুভব করেছিলাম তাঁর আত্মার নীরব ধীর ঊর্ধ্বপ্রয়াণ। কিন্তু গঙ্গার ঘাটে যখন এলেন, স্নিগ্ধ শীতল বাতাস যখন বয়ে গেল, তাঁর দেহের উপর দিয়ে, তারই মধ্যে উজ্জ্বল পূর্ণিমালোকের মধ্যে যখন তিনি রইলেন কিছুক্ষণ—তখন আত্মার পুনঃ প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ যেন দেখা গেল তাঁর মধ্যে, মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে যা সচরাচর দেখা যায় না। তারপরে, পূর্ণ নির্বাপণের পূর্বে, আরও অনেক ঘণ্টা ধরে জীবনদীপ জ্বলতে লাগল জীর্ণ আধারে।

এইকালে সম্পূর্ণ চৈতন্যহারা কিন্তু হন নি। তাঁর চাহনি যাদের উপর পড়েছে, তাদের মনে হয়েছে, তিনি যেন তাদের চিনেছেন। আর শেষ সকালে, পুরোহিত সামনে এসে যখন উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই সাড়া দিয়েছিলেন, যেন বিশেষ আবেগের সঙ্গেই। সারা জীবন তিনি গোপালভাবের সাধনা করেছেন, নবব্ই-উত্তীর্ণ তাঁর প্রাচীন জীর্ণ দেহ যখন বিদায় নিচ্ছে, সেই শেষক্ষণে শিশুর নির্ভরতায় ভরে থাকবে, এই তো স্বাভাবিক। শুধু দেহের কাঁপন, কি মাথার একটু নড়াচড়ায় ইচ্ছাশক্তি সামান্য হয়তো ছিল।

'কিন্তু সে অবস্থাও এখন অতীত। আবার রাত্রি ঘনিয়ে এসেছে। বহু ঘণ্টা ধরে শায়িত, স্থির—সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ। শান্তি! পৃথিবীতে যার কোনো কামনাই নেই তাঁরই যোগ্য শান্তি।

'প্রতীক্ষা করে আছি আমরা মেয়ের দল, কানে আসছে ঘাটের তলায় সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে গঙ্গার জল ছল ছল ছলাৎ শব্দ, কিংবা বর্ষার ঝড়ো হাওয়ার চাপা দীর্ঘশ্বাস, যখন তা নদী তরঙ্গের উপর দিয়ে ঝাপট দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তারই মধ্যে একবার তখন মধ্যরাত্রি, মধ্যরাত্রির ঘণ্টাখানেক পরে কি? হঠাৎ নীরবতাকে মথিত করে মেঘাবৃত পূর্ণিমাকাশের তলবর্তী নদীতরঙ্গ পাক খেয়ে ছুটল প্রচণ্ড বেগে, নোঙরকরা নৌকাগুলি গায়ে গায়ে ধাক্কা খেতে লাগল, রব উঠল—বান আসছে, বান আসছে! সেই দৃশ্য দেখে বুক ভেঙে দীর্ঘশ্বাস পড়ল কয়েকজনের—এই বিদায়ী আত্মা যাদের কাছে সুহৃদ্ ও গুরু। তারা ভাবল, এই বন্যাই তো সঙ্কেত, ঘনিয়ে আসছে বিদায়ক্ষণ। স্বজন, স্বভূমি ছেড়ে এবার তিনি প্রস্থান করবেন অজানালোকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলেও এখনো একই প্রকার। বিশ্রাম ছেড়ে কেউ হয়ত উঠে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে শ্রদ্ধাকোমল হাতে কিছু পরিচর্যা করলেন, অন্য কেউ কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজনে শুয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ কিছু চাঞ্চল্য, নিদ্রিতকে কার ছোট একটি হাত স্পর্শ করে জাগাল; 'বাহকদের ডাক! শেষ হয়ে আসছে।' তারা বসেছিল ঘাটের উপরের চত্বরে; সারা রাত্রি বসে তারা পুরনো কথা বলছিল, এই বিদায়ী জীবনের সঙ্গে নানাজনের সম্পর্কের কথা আলোচনা করছিল সারাক্ষণ—সুতরাং ডাকামাত্র তারা উঠে আসতে পারল, অবিলম্বে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মুমূর্ষুকে খাটিয়ায় তুলে গেরুয়া ও সাদা কাপড় পরা ঐ সব বাহকেরা কাঁধে ক'রে উত্তরের ঘর থেকে দ্রুত বাইরে নিয়ে এল। কয়েক পা নিচেই গঙ্গাতট, সেখানে পবিত্র বারিতে পাদস্পর্শ ক'রে শায়িত হবেন গোপালের মা, তারপর চলে যাবেন।

'শুয়ে আছেন সেখানে—শ্বাসরীতির পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার সহজ উত্থানপতন। আবাল্য গোপালের মাকে জানেন, এমন এক সন্ন্যাসী তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে

ফিস্‌ফিসানির সুরে মৃত্যুকালে হিন্দুর একান্ত ইচ্ছার মন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন—ওঁ গঙ্গা নারায়ণ! ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম! তারপরে—শুধু এক মুহূর্ত—তারপরেই সমবেত কণ্ঠে 'হরিবোল'। নির্গত হয়ে গেছে প্রাণবায়ু। গোপালের মা'র আত্মা উর্ধ্বপথে—পড়ে আছে দেহযন্ত্র।

'এখন কি উপক্ষণ!—মেঘের পিছনে স্বচ্ছতার আভাস দেখে খাটিয়ার মাথার দিকের একজন জিজ্ঞাসা করলেন। পায়ের দিক থেকে উত্তর এল—'হাঁ, তাই বটে উষা!' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে দেখলাম, যে বারিধারা মুমূর্ষুর চরণ স্পর্শ ক'রে বয়ে যাচ্ছিল, তা সরে গেছে, নেমে গেছে কয়েক ইঞ্চি ইতিমধ্যেই। গোপালের মা সত্যই ব্রাহ্মমুহূর্তে দেহত্যাগ করেছেন—নদীর স্রোত ফেরার ঠিক মুখে।'

১৯০৬ সালের ৮ই জুলাই তারিখে, সিদ্ধা তাপসী গোপালের মা, রামকৃষ্ণের মা, এমনিভাবে সেদিন প্রয়াণ করলেন তাঁর সাধনোচিত ধামে।

নিবেদিতা

বন্ধু এবেনজার কুক সেদিন মার্গারেটকে চিত্রবিদ্যার পাঠ দিতে এসেছেন। হঠাৎ বললেন তাকে, "মনস্তত্ত্ব ও আত্মিক জীবনের কত কিছু সমস্যা নিয়ে তুমি চঞ্চল হয়ে উঠছো, আর প্রকৃত সত্য খুঁজে বেড়াচ্ছো। এযাবৎ এ নিয়ে ঘোরাঘুরিও কম করো নি। তাই তোমায় একটা কথা জানাচ্ছি। লেডি ইসাবেল মার্গসন তাঁর বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে কয়েকজন বন্ধুকে যেতে বলেছেন। এক হিন্দু সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ, সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছেন; সেখানে কিছু বলবেন। যাবে তুমি ?"

এ সন্ন্যাসীর নাম স্বামী বিবেকানন্দ, শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে এবং সারা আমেরিকায় যিনি চাঞ্চল্য তুলেছিলেন। মার্গারেট এ সংবাদ কাগজে পড়েছেন। সন্ন্যাসী লণ্ডনে এসেছেন, তাঁর এখানকার বক্তৃতাও সুধীজনের মনোযোগ কম আকর্ষণ করে নি। কিন্তু মার্গারেট এখনো তাঁকে দেখেন নি। শুনেছেন, তিনি বয়সে তরুণ, প্রতিভা-বান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই চিন্তাধারায়ই তাঁর জ্ঞান আছে। কৌতূহলী হয়ে কুকের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করলেন।

মনস্বী ব্যক্তিদের মিলনকেন্দ্র সিসেম ক্লাবের সঙ্গে মার্গারেট জড়িত। সেখানকার কয়েকজন সদস্য এই নবাগত সন্ন্যাসীকে চেনেন। বিশেষ ক'রে হেরিয়েটা মুলার এবং মিঃ স্টার্ডি তাঁকে ভালোভাবেই জানেন। তাঁদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলে মার্গারেটের ঔৎসুক্য আরো প্রবল হয়ে ওঠে।

নির্ধারিত দিনে লেডি মার্গসনের ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত হলেন মার্গারেট। ড্রয়িংরুমের পর্দাটি সরাতেই দেখেন, জন পনের বিদগ্ধ নরনারী ভারতীয় সাধুটির সম্মুখে উপবিষ্ট। সবাই চুপচাপ, তাঁর ভাষণ শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব। মার্গারেট দেরিতে এসেছেন, তাড়া-তাড়ি সামনের একটা চেয়ারে ঝুপ ক'রে বসে পড়লেন।

নবেম্বরের রাত্রি। ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে লণ্ডনের পথ ঘাট আকাশ। শীতের তীব্রতাও তখন প্রচণ্ড। সন্ন্যাসীর পশ্চাৎদিকে ফায়ার-প্লেসের জ্বলন্ত আগুন। সামনের ধূপাধার থেকে নির্গত হচ্ছে একরাশ সুগন্ধী ধোঁয়ার কুণ্ডলী। একটা পবিত্র মোহময় বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে, আর সন্ন্যাসীর সম্মুখে অর্ধবৃত্তাকারে শ্রোতারা রয়েছেন অপেক্ষমাণ।

মার্গারেটের দিকে সোজাসুজি মুখ রেখে বসেছেন সন্ন্যাসী। পরনে গৈরিক আলখাল্লা। মাথায় গেরুয়া-রঞ্জিত পাগড়ি। দিব্যশ্রীমণ্ডিত চেহারা। আয়ত নয়ন দুটিতে বুদ্ধি, প্রতিভা ও ভাবলোকের দ্যুতি। প্রসন্ন গম্ভীর আননে মৌন মহিমায় তিনি উপবিষ্ট রয়েছেন। পরি-পার্শ্বের দিকে, শ্রোতাদের দিকে, তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে মনে হয় না। মার্গারেট দেখছেন আর ভাবছেন, এযেন কল্পলোকের মানুষ।

লেডি ইসাবেল সম্ভ্রমের সুরে বললেন, "স্বামীজী, আমাদের বিশিষ্ট বন্ধুরা সবাই এসে গিয়েছেন।"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মৃদু হাসি হেসে স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন তাঁর প্রিয় স্বস্তিবাচন—'শিব শিব, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।' এবার শুরু হলো তাঁর ভাষণ।

নির্নিমেষে তাকিয়ে আছেন মার্গারেট আর ভাবছেন,—সন্ন্যাসীর কণ্ঠে একাধারে পেলবতা এবং উদাত্তভঙ্গী, তাঁর ব্যক্তিত্বে জড়ানো রয়েছে শিশুর কোমলকান্ত ভাব আর উচ্চতর শক্তির মহিমা। চোখ-দুটো দেখে মনে হয়, কাছে থেকেও তিনি যেন দূরের মানুষ, সিস্টিন চাইল্ডের মুখমণ্ডলে শান্ত ও সমাহিতের যে দিব্য ভাব এঁকেছেন রাফায়েল, এই সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখে যেন তা-ই খুঁজে পাচ্ছেন মার্গারেট।

চমৎকার ইংরেজীতে, শাণিত যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে নিজের বক্তব্য বলে চলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাঝে মাঝে তাঁর ভাব ও ভাষায় শোনা যাচ্ছে কাব্যের ঝংকার, সত্যপিয়াসী পক্ষী যেন এক একবার আকাশের নিঃসীম নীলিমায় ডানা মেলে দিয়ে পাড়ি জমাতে

চায়। কখনো বা তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হচ্ছে সুমধুর সংস্কৃত শ্লোক। আবার তখনি ত্রুটিহীন ইংরেজীতে সেগুলো তিনি অনুবাদ ক'রে শোনাচ্ছেন শ্রোতাদের।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজের পাশ্চাত্যে আসার কারণ বললেন। তাঁর মতে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আঞ্চলিক সীমানা ও ভেদরেখা ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এক দেশের পণ্য যেমন অপর দেশে যাচ্ছে, তেমনি এক দেশের ভাব, চিন্তা ও অধ্যাত্মতত্ত্বেরই বা বিনিময় হবে না কেন? হিন্দু ঋষির উচ্চারিত বাণী—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা নিপুণভাবে করলেন। শোনালেন, গীতায় ভগবান বলেছেন,—ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব, অর্থাৎ, সূত্রে গ্রথিত মণি-সমূহের মতো এই বিশ্ব চরাচর আমাদ্বারা বিধৃত।

আরো জানালেন তিনি হিন্দুদের উপলব্ধ একটি সত্যের কথা। শরীর ও মন প্রকৃতপক্ষে চালিত হয় আত্মা নামক একটি পরম বস্তুর দ্বারা। সত্য-সন্ধানী, মনস্বিনী তরুণী মার্গারেট উচ্চকিত হয়ে ওঠেন, একথা শুনে। সত্যের এক নব দিগন্ত যেন উন্মোচিত হতে চায় তার মনোজগতের সম্মুখে।

স্বামীজীর মুখে আরো ধ্বনিত হলো—সুখ নয়, দুঃখ নয়, স্বর্গ নয়, নরক নয়,—মুক্তিই হচ্ছে হিন্দু দর্শন ও হিন্দু সাধনার চরম লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, তিনি একথাও জানালেন, ভারতের মন্দির এবং তার পুরোহিতেরা উচ্চতর সাধনা ও সিদ্ধির পথিপ্রদর্শক নয়। তাঁর দেশে পরম পথের প্রদর্শক হচ্ছেন সর্বত্যাগী সিদ্ধ মহাত্মারা যাঁদের নির্দেশে ও পবিত্র স্পর্শে মানুষ পরা শান্তি ও পরা মুক্তির সন্ধান লাভে ধন্য হয়। জোর গলায় একথাও তিনি ঘোষণা করলেন, হিন্দু ধর্মে স্বর্গপ্রাপ্তির কথা আছে বটে, কিন্তু সে প্রাপ্তি পরম প্রাপ্তি নয়, স্থূল বস্তু প্রাপ্তি। মুক্তি বা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই ভারতীয় সাধনার আসল লক্ষ্য বস্তু। এ প্রসঙ্গে শ্রোতাদের একথাও তিনি বুঝিয়ে বললেন, পাশ্চাত্যের সমাজসেবার আদর্শ নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু আত্মিক সাধনার যুক্তিপূর্ণ ও পরমকাম্য পরিণতি হচ্ছে—আত্মার মুক্তি। ত্যাগ বরণ,

বিত্ত বিষয়ে নিরাসক্তি এবং ধ্যান মনন সমাধি ছাড়া এই মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে স্বামীজী সেদিন সতর্কবাণী উচ্চারণ ক'রে বললেন, "এরা আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবে না। কারণ, ব্যবহারিক জীবন ও অর্থসম্পদের ওপর এদের লোভ অত্যধিক।"

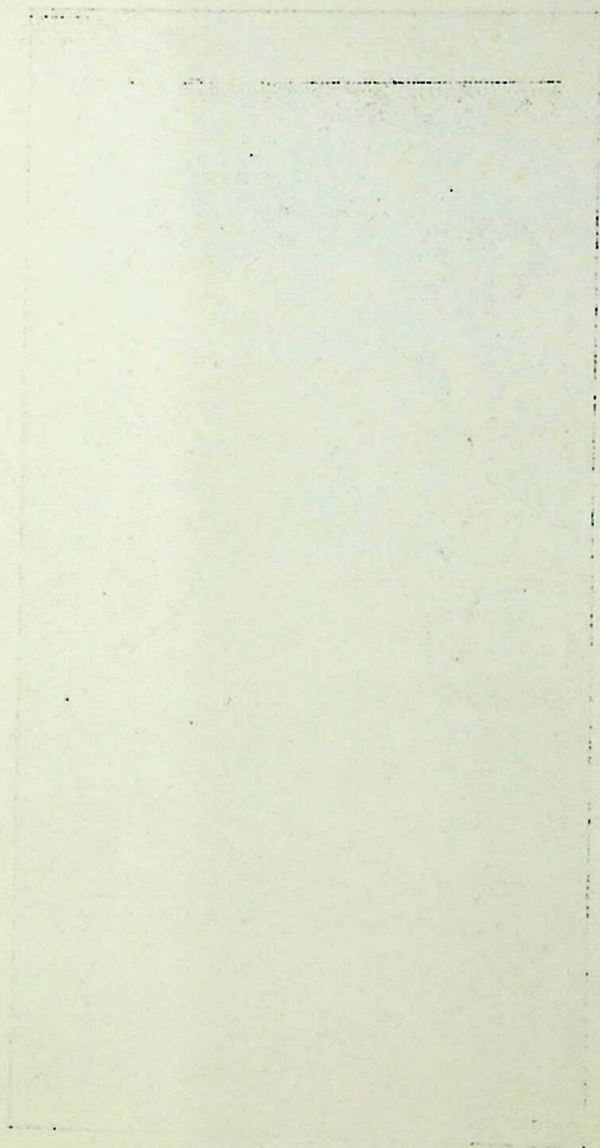
আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন,—সভ্য মানুষ একটি সত্য থেকেই মহত্তর সত্যে গিয়ে পৌঁছোয়, অসত্য এবং ভ্রান্তি থেকে কখনো সত্যে গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। নানা দৃষ্টি-ভঙ্গীর দিক থেকে, নানা ধরনের বিচার ও যুক্তির মধ্য দিয়ে, এই তত্ত্বটিকে সেদিন তিনি শ্রোতাদের মনে গেঁথে দেবার প্রয়াস পেলেন এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অবতরণ তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত করলেন। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—গীতার এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে তার ব্যাখ্যা দিলেন : যখনি ধর্মের গ্লানি আর অধর্মের অভ্যুদয় ঘটে, তখনি আমি নিজেকে করি সৃজন। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে হই আবির্ভূত।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ ও প্রশ্নোত্তর একই সঙ্গে চলছিল এই বৈঠকে। গৃহস্বামিনী লেডি ইসাবেল মার্গেসন ও তাঁর যেসব বন্ধু সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন অতিমাত্রায় বিচারপ্রবণ ও মননশীল মনস্তত্ত্বই ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র—এই আধুনিক মতবাদের সমর্থক ছিলেন তাঁরা। তাই স্বামীজীর ভাষণ তাঁদের অন্তরে তেমন কোনো গভীর রেখাপাত সেদিন করে নি। বরং শ্রোতাদের কেউ কেউ বিদায় নেবার সময় বলে গেলেন, "স্বামীজী তাঁর বক্তব্য বেশ মনোরম ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু কোনো নূতন কিছু বলেন নি, কোনো নূতন তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত করেন নি।"

মার্গারেট নোবল্ নিজে বিচারশীলা এবং মনস্বিনী। কিন্তু তাঁর মনে এই হিন্দু সন্ন্যাসীর বাণীর ঝংকার এক নূতন অনুরণন তুলে দেয়,



ভগ্নী নিবেদীতা



দিব্যলোকের নূতন দিগন্ত যেন উন্মোচিত হতে চায় তাঁর মনোলোকের সম্মুখে।

বাড়িতে ফিরে যাবার পর তিনি ভাবতে থাকেন, 'প্রাচ্য থেকে আগত এই নবীন সন্ন্যাসীর বাণী ও আদর্শকে যাচাই বা তৌল না ক'রে এভাবে বাতিল করলে, আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতাই শুধু প্রমাণিত হবে না, এটা হবে একটা ঘোরতর অন্যায়। তাঁর ভাষণে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব ইনি প্রকাশ করলেন, তা হয়তো কোথাও কোথাও আমরা পেয়েছি। কিন্তু এমনভাবে, মাত্র একঘণ্টার ভেতরে, এমন সুসম্বদ্ধভাবে বলতে আমি কোথাও তো শুনি নি।'

তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণধী, মনস্বিনী মার্গারেট নোবল্ সেই দিনই এই হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি বটে, কিন্তু ঈশ্বরীয় বিধানে, ঐ দিনটির এবং ঐ লগ্নটির রন্ধ্রপথেই প্রবেশ করেছিল তাঁর উত্তর জীবনের মহামুক্তির বীজ। মার্গারেট নোবল্ রূপান্তরিত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতায়। রামকৃষ্ণ নামের মহামন্ত্র, আর ধ্যানী বিবেকানন্দের ভারতমন্ত্র চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল তাঁর মনপ্রাণ ও সাধনসত্তায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাত হয়েছিলেন লোকমাতা নিবেদিতারূপে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভেতর দেখেছিলেন শিখাময়ী নিবেদিতাকে।

শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও ভারতীয় ধর্মের পতাকাই নিবেদিতা তাঁর জীবনে বহন করে যান নি। গুরুর স্বদেশ ভারতকে এবং ভারতের সংস্কৃতি ও জনজীবনকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, তার উজ্জীবন সাধনে নিজেকে দান করেছিলেন পলে পলে, নিঃশেষে।

প্রেরিত পুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর ঈশ্বর নির্দিষ্ট কর্মব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সিংহিনীতুল্যা শিষ্যার, নিবেদিতার মধ্যে মিলেছিল এই সিংহিনীর সন্ধান।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত বিবেকানন্দ জীবনীতে এর স্বীকৃতি পাই। এতে বলা হয়েছে—বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের ভেতর থেকে মহান্ আচার্য বিশেষভাবে একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, তার ওপর

ন্যস্ত করেছিলেন গভীর আশা ও বিশ্বাস। তাই স্বামীজীর চৈতন্যময় দিক্‌দর্শন ও আলোচনার প্রবাহ ঐ শিষ্যার দিকেই সমধিক প্রবাহিত হত। সে সময়ে যদি তিনি ভগিনী নিবেদিতার সংগঠনের অতিরিক্ত কোনো কর্ম না করতেন, তাহলেও বলা যেত না—তাঁর সময় বৃথায় গিয়েছে।

আর নিবেদিতা? তাঁর সর্বস্ব নিবেদনের ভেতর দিয়ে কি লাভ করেছিলেন সেদিন? স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সেই পবিত্র দিনটি ছিল তাঁর নিজের ভাষায়, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্র পরিবর্তনের এক মহা-সন্ধিক্ষণ।

উত্তরকালে নিজের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' প্রকাশের পর নিবেদিতা তাঁর এক বান্ধবীকে এ কথাটি আরো স্পষ্ট ক'রে লিখেছিলেন:

"মনে কর যদি সে সময়ে স্বামীজী লণ্ডনে আবির্ভূত না হতেন? আমার জীবনটা তাহলে ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়ে যেতো। কারণ আমি যে সদাই উপলব্ধি করতাম, আমি এক পরম সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছি। সব সময়ে বলে এসেছি,—একটা আহ্বান আমার জীবনে আসবে, আর সত্যই সেদিন সে আহ্বানটি এসে গেল। যদি নিজের জীবন সম্পর্কে আমার আরো নিবিড় পরিচয় থাক্‌তো, তাহলে হয়তো আমার মনে সেদিন সংশয় জাগতো, পরম লগ্নটি যে সময়ে এসে উপস্থিত হবে, তখন তাকে আমি চিনতে পারবো কিনা! আমার ভাগ্য ভালো, জীবন সম্পর্কে কোনো গভীর অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। তাই সংশয় ও দ্বিধা দ্বন্দ্বের হাত থেকে আমি রক্ষা পেয়ে গিয়েছি। এই মুহূর্তে নিজের রচিত ভারতীয় জীবন সম্পর্কে এই বইখানির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আমার মনে হচ্ছে—যদি তিনি না আসতেন আমার জীবনে, তবে কি দুর্দৈবই না ঘটতো। সকল সময়ে আমার ভেতরে একটা জ্বলন্ত আকুতি আমি অনুভব ক'রে আসছি। কিন্তু আমি তো ভালভাবেই জানি, তা প্রকাশ করার মতো শক্তি সত্যিই আমার ছিল না। কত সময় গেছে, যখন কলম হাতে নিয়ে

উন্মুখ হয়ে বসে আছি, আমার প্রাণের ভাবকে রূপ দেব বলে—কিন্তু ভাষা যোগাতে পারি নি কলমের মুখে। আর আজ মনে হয়, আমার বক্তব্যের বুঝি আর শেষ নেই। এ বিষয়ে আজ আমি নিঃসন্দেহ যে, এই বিশ্বের যে কাজের জন্য আমায় প্রস্তুত ক'রে তোলা হয়েছে, তাতে আমার সত্যকার প্রয়োজনও রয়েছে।"

যে আধারে, যে প্রতিশ্রুতিময় জীবনপাত্রে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শক্তি, জ্ঞান ও কর্মের প্রবাহ অকৃপণ করে ঢেলে দিয়েছিলেন, কিভাবে তা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল সে কাহিনী এবার আমরা বিবৃত করবো।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের ডানগ্যানন শহরে মার্গারেট নোবল্ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা স্যামুয়েল ছিলেন একজন আদর্শবাদী, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। দেশপ্রেম ও ঈশ্বর চেতনায় সদা উদ্বুদ্ধ ছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম দিকে, যখন প্রথমা কন্যা মার্গারেটের জন্ম হয়, সে সময়ে স্যামুয়েল নিজের একটি ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। কিন্তু জনসেবা আর ভগবৎ-প্রেমের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি বড় হয়েছেন, তাই বণিকের জীবন বেশীদিন ভালো লাগে নি। কাজেই এক বৎসর পরে কারবার গুটিয়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। সেখানে গিয়ে ধর্মযাজকের বৃত্তি সোৎসাহে গ্রহণ করেন। পত্নী মেরীরও জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল ধর্মধৃত জীবনের আদর্শে।

আর্থিক দুর্গতি ও ত্যাগ তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে স্বামী স্ত্রী উভয়ে চালিয়ে যান তাঁদের জীবিকার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিলেন স্যামুয়েল। তাই দেখা গেল, স্থান পরিবর্তন ক'রে ওল্ডহামে এসে যখন তিনি স্থানীয় ধর্মযাজকের পদে নিযুক্ত, তখন তাঁর দুটি ফুসফুসই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

স্যামুয়েলের পিতা, মার্গারেট নোবলের পিতামহ, জন নোবল্ ছিলেন উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের বহুলখ্যাত ধর্মযাজক এবং বীর স্বদেশপ্রেমিক।

ইংল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ডের অনুরাগী চার্চ অব আয়র্ল্যাণ্ড, দুইয়েরই বিরুদ্ধে তিনি অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। প্রভু যীশুর মানবপ্রেম আর বিদ্রোহ-দীর্ণ আইরিশদের সেবা, দুটি ধারাকেই নিজ জীবনের খাতে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন জন নোবল্। তাই এই যোদ্ধা-যাজকের কাহিনী এক সময়ে রূপকথার মতো সারা আয়র্ল্যাণ্ডের গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পিতামহ ও পিতার মনস্বিতা, ধর্মীয় আদর্শবাদ এবং তেজবীর্য অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছিল মার্গারেট নোবলের জীবনে।

মার্গারেট তখন স্কুলে পড়ছে, দশ বৎসর বয়স তাঁর। এসময় থেকেই সে পিতার একান্ত ভক্ত, গুণগ্রাহী ও সঙ্গী হয়ে ওঠে। পিতার ত্যাগপূত জীবনকে যেন অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে সে তার আদর্শরূপে গ্রহণ করে।

পিতা স্যামুয়েল যখন গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে যান, সেও তাঁর সঙ্গী হয়। বাইবেলের কাহিনীগুলো, উচ্চতর নীতিবাদের সূত্রগুলো, গ্রথিত হয়ে যায় তার মনে ও প্রাণে। পিতার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের নেতৃত্বশক্তি ছায়া ফেলে তরুণ মার্গারেটের চরিত্রের ওপর। ঋজুতা, দৃঢ়তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী এসে যায় তার ভেতরে, সেই সঙ্গে জাগে সূক্ষ্মতর জীবনের, উচ্চতর জীবনের, নানা প্রশ্ন।

সেদিন ভারত থেকে সদ্য ফেরা এক ধর্মযাজক বন্ধু এসেছেন স্যামুয়েল নোবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিশোরী মার্গারেটও সেখানে উপস্থিত। উৎসুক হয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছেন। বিদায় নেবার সময় প্রতিভাদীপ্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পিতৃবন্ধু হঠাৎ বলে ওঠেন, "ভারতবর্ষ অতন্দ্র হয়ে তার দেবতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেমন ক'রে আমায় সে ডাক দিয়েছিল, তেমনি তোমাকেও হয়তো ডাক দেবে। সেদিনের জন্য তুমি তৈরী থেকো।"

কথা কয়টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মার্গারেট। টেবিল থেকে মানচিত্র বার ক'রে বাবার কাছ থেকে তখনি সে জেনে নেয়, কোথায় কোন্ সুদূরে রয়েছে সেই রহস্যময় ভারতবর্ষ।

পিতা স্যামুয়েলের মনে পড়ে যায় মার্গারেটের জন্ম মুহূর্তের কথা। প্রসূতি আগারে শায়িত তখন মেরী নোবল্। সেদিন্ নবজাত সন্তানের কল্যাণের কথা ভেবে বলেছিলেন ঈশ্বরের কাছে, "হে প্রভু, এ সন্তানকে আমি তোমার বেদীতলেই সমর্পণ করলাম।"

মেয়ে বয়সে নিতান্ত ছোট। কিন্তু হলে কি হয়, স্যামুয়েল যে তার জীবনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছেন। পিতৃকুল মাতৃকুলের বহু গুণ সমন্বিত হয়েছে মার্গারেটের ভেতরে। সত্যাশ্রয় আর ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণা সুপ্ত রয়েছে ওর জীবনে, একদিন তা বাইরে বেরিয়ে আসবেই।

অকালে, মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে, স্যামুয়েল নোবল্ সংসার থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। স্ত্রীকে তাঁর শেষ কথা ক'টি বলার সময় কিশোরী মার্গারেটের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। নিস্তেজ চোখদুটি শেষ বারের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, স্ত্রীকে বলেন, "ঈশ্বর যেদিন মার্গটকে ডাক দেবেন, সেদিন তোমরা কেউ ওকে যেন বাধা দিয়ো না। আমি জানি—ও ঊর্ধ্বলোকের দিকে হাত বাড়াবেই।

পিতা চিরতরে চলে গেলেন। মার্গারেটের হৃদয়ে নেমে এলো দুঃসহ শোকের বেদনা। পিতা যে তার কাছে শুধু পিতাই ছিলেন না, ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রেরণাদাতা।

সহায়-সম্পদহীনা মেরীর পক্ষে বিদেশে দুটি কিশোরী কন্যা ও বালক পুত্র নিয়ে বাস করা আর সম্ভব নয়। স্বামী যতদিন জীবিত ছিলেন, মেরী তাঁর সঙ্গে মিলে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছেন। একাকী এ অবস্থায় আর তা সম্ভব নয়। তাই ফিরে এলেন আয়র্ল্যাণ্ডে, পিতা হ্যামিল্টনের গৃহে।

দাদুর ব্যবস্থাপনায় ঠিক হলো, মার্গারেট এবং মে এই দু'বোন হ্যালিফাক্সের স্কুলে পড়তে যাবেন। স্কুলটি কংগ্রিগেশনালিস্ট চার্চের অধীন। কঠোর নিয়ন্ত্রণ আছে, আর আছে ধর্মজীবনকে সুসংহত করার ব্যবস্থা। সেখানে যথাসময়ে উভয়ের পড়াশুনা শুরু হয়ে গেল।

মার্গারেটের ভেতর অনুসন্ধিৎসা যেমন প্রবল ছিল, তেমনি ছিল যে-কোনো বিষয়বস্তুকে সম্যক্‌রূপে অধিগত করার নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা। তাই স্কুলে পাঠ করার সময় সাহিত্য, সংগীত ও কলাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌ বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন।

স্কুলের অবকাশ সময়ে মার্গারেটকে দাদু হ্যামিল্টনের গৃহে এসে মাঝে মাঝে বাস করতে হতো। দাদু ছিলেন একজন আদর্শনিষ্ঠ দেশনেতা, আইরিশ স্বায়ত্তশাসনের অন্যতম ধারক ও বাহক। বড় হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার ফলে মার্গারেটের জীবনে ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে তীব্র দেশাত্মবোধ ও আইরিশ জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা।

স্কুল ও কলেজের পরীক্ষায় মার্গারেট কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময়কার ছাত্রী জীবনেই তাঁর ভেতরে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব ও সংগ্রামশীলতার উন্মেষ ঘটতে দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধির প্রখরতা ও মননশীলতার বলে সহপাঠিনীদের ভেতর একটি বিশিষ্ট স্থান ইতি-মধ্যেই তিনি অধিকার করেছিলেন। আবার অনমনীয় মনোভাব, চরিত্রের দৃঢ়তা ও তর্কশক্তির জন্য কেউ কেউ তাকে ভাবতেন গর্বিতা, জেদী ও তার্কিক বলে।

শিক্ষাদানের ওপর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল মার্গারেটের। তাই কলেজের পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করলেন শিক্ষয়িত্রীর কাজ। কেসউইকের একটি মেয়ে-স্কুলে অচিরে একটি চাকুরিও তাঁর জুটে গেল।

স্কুলটি বিখ্যাত এবং পুরনো ঐতিহ্যে ভরা। হ্রদ আর পাহাড়ের সৌন্দর্য আশে পাশে ছড়ানো। এখানে এসে মন খুলে যায় মার্গারেটের। কিশোরী মেয়েদের সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ান, আর নিজের অবসর ভরে তোলেন উচ্চতর সাহিত্য চর্চায়, ধর্মীয় চিন্তায়।

দুঃখী মানুষের সমস্যা বুঝবার জন্য, তাদের ভেতর কাজ করার জন্য, একটা অদম্য স্পৃহা এসময়ে জেগে ওঠে মার্গারেটের অন্তরে।

তাই প্রায় আড়াই বৎসর কেসউইকে বাস করার পর সে স্থান ত্যাগ ক'রে নূতন কাজ গ্রহণ করেন রাগ্‌বির অনাথা আশ্রমে।

বৎসর খানেক সেখানে কাটানোর পর মার্গারেট যোগদান করেন রেক্সহামের সেকেণ্ডারী স্কুলে। বয়স তখন তাঁর একুশ। অটুট স্বাস্থ্য আর অদম্য কর্মশক্তি নিয়ে নূতন নূতন কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে তিনি চাইছেন।

শিল্প কারখানা আর খনির মজুরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এই বিদ্যালয়টি। শ্রমিক পরিবারের মেয়েদের সযত্নে তিনি পড়ান। বাকী সময়টাতেও কাজের অন্ত নেই। খনি অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত সেণ্ট মার্কস চার্চ। সেখানে গিয়ে চার্চ-কর্মী হিসেবে নাম লেখান মার্গারেট। কল্যাণময়ী মূর্তিতে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ান, আর্ত পীড়িত নারীদের খুঁজে খুঁজে বার করে তারপর তাদের সাহায্যের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হন ধর্মযাজকের কাছে।

চার্চের চালকেরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মার্গারেটের দিকে। এমন জনদরদী তরুণী তো সহসা তাঁদের চোখে পড়ে না। কিন্তু তার সাথে সহযোগিতা করার উপায় নেই তাঁদের। চার্চের নিয়ম গোঁড়ামির নিগড়ে বাঁধা। সেই সব দুঃস্থ পরিবারকেই তাঁরা সাহায্য দেবেন, যারা নিয়মিতভাবে তাঁদের উপাসনা কেন্দ্রে হাজিরা দেবে। মার্গারেটের বক্তব্য এস্থলে সুস্পষ্ট। তিনি তর্ক বাধিয়ে দেন, চার্চ কেন সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে? দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষ মাত্রকেই কেন আপন ক'রে নেওয়া হবে না? সাহায্য দেওয়া হবে না?

এ বিতর্কের পর আসে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ। ফলে চার্চকর্মীর কাজ ছেড়ে দেন মার্গারেট।

এবার মনে নূতনতর চিন্তা খেলে যায়। এভাবে দীন দুঃখী মজুরদের দোরে দোরে ঘুরে, আর তিনি শক্তিক্ষয় করবেন না। চার্চ-পরিচালকদের কাছেও ধর্না দেবেন না, বরং ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে বিভিন্ন কাগজে তিনি জোরালো ও

যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে থাকবেন। তাতে সমাজে আলোড়ন হবে, সত্যকার কাজও হবে। এই প্রয়াসের ভেতর দিয়ে সেদিন শুরু হয়েছিল মার্গারেটের উত্তরজীবনের প্রবন্ধ রচনার ভিত্তি।

দরিদ্রা নারীদের সাহায্যের জন্য অফিস অঞ্চল থেকে মাঝে মাঝে চাঁদা তুলতেন মার্গারেট। একাজ করতে গিয়ে সেদিন এক তরুণ ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। স্থানীয় একটা বড় লেবরেটরিতে ইনি কাজ করেন। এই তরুণের বয়স সাতাশ, দেখতে মন্দ নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিকে আকর্ষণ আছে, সুরুচি ও বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর মিল যথেষ্ট। ফলে উভয়ের আলাপ পরিচয় পরিণত হয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে।

সেদিন যুবকটি তাঁর মাকে নিয়ে গির্জায় এসেছেন। মায়ের সঙ্গে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুত্রের এ বান্ধবীকে দেখে বৃদ্ধা মহিলার খুশীর অন্ত নেই। তখনি সাগ্রহে তাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন, করলেন চায়ের নিমন্ত্রণ।

এরপর থেকেই মার্গারেট আর তাঁর তরুণ ইন্‌জিনিয়ার বন্ধুর জীবন ক্রমে আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। প্রেমের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে যান তাঁরা দু'জনে।

স্কুলের ছুটির পর প্রায়ই মার্গারেট তার প্রণয়ীর ফ্লাটে উপস্থিত হন। চা পানের পর নানা আলোচনা চলে সংবাদপত্রে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির কাটিং নিয়ে। এমার্সন, থোরো, রাস্কিনের আদর্শ ও কল্যাণময় জীবনবাদ নিয়ে দু'জনে মশগুল হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে গ্রামের দিকে বনে জঙ্গলে উন্মুক্ত প্রান্তরে খেয়ালখুশী মতো তাঁরা ঘুরে আসেন। আনন্দে তৃপ্তিতে উচ্ছল হয়ে ওঠেন দু'জনেই।

দিনের পর দিন রঙীন আশার স্বপ্ন দেখেন মার্গারেট। উভয়ে মিলে গড়ে তুলবেন এক সুখনীড়, ঈশ্বরধৃত জীবনে ফোটাবেন আনন্দ ও কল্যাণের ফুল। কত কল্পনা আর কত ছবিই মনে মনে তিনি এঁকে ফেলেন।

কিন্তু যৌবন সাফল্যের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা একদিন মরীচিকার

মতো দূর গগনে মিলিয়ে যায়। হঠাৎ এসে পড়ে দৈবের এক নির্মম আঘাত। বিয়ের জন্য বাগ্‌দান করা হবে, তার প্রাক্কালেই প্রাণান্তকর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন মার্গারেটের তরুণ প্রণয়ী। এ রোগ তার বাবার রোগের চাইতেও ভয়ঙ্কর, এ গ্যালপিং থাইসিস।

কয়েক সপ্তাহের ভেতরই তরুণ ছেলেটির জীবনাবসান ঘটলো। মার্গারেটের কুমারী হৃদয় ভেঙে পড়লো দুঃসহ শোকের ভারে।

অতঃপর এ শহরে থাকা আর মার্গারেটের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সত্বর বদলীর জন্য তিনি আবেদন জানান এবং কিছুদিন পরে চলে আসেন চেস্টার শহরে।

প্রিয় বিরহের বেদনা প্রশমিত হবার পর মার্গারেটের জীবনে জেগে ওঠে একটা বিরাট শূন্যতাবোধ। মা আর ভাই বোনদের কাছে পাবার জন্য একটা তীব্র আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তাঁর মনে। ছোট বোন যে দশবারো মাইল দূরে লিভারপুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। সেখানকার স্থানীয় কলেজে ভাই রিচমণ্ডের পড়াশুনার বেশ সুবিধা হয়েছে। এবার মা-ও যদি সেখানে চলে আসেন, সবাই মিলে একত্রে বাস করতে পারেন, আর মার্গারেটও প্রতি সপ্তাহে একবার ক'রে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন। এই ব্যবস্থাই এবার করা হলো, আত্মজনদের স্নেহমমতার বাতাবরণে থেকে মার্গারেটের তাপিত হৃদয় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

আদর্শ শিক্ষাব্রতীর জীবন গ্রহণ করেছেন মার্গারেট, ইতিমধ্যে চার বৎসরের বেশী কাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এবার এই ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করার জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। অনুসন্ধিৎসু মন ও তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি তাঁর সহজাত, তাই নিয়ে এবার শিক্ষার আধুনিকতম পদ্ধতির দিকে, প্রগতিবাদী পন্থার দিকে, ঝুঁকে পড়লেন।

পেস্তালেৎসি এবং ফ্রোবেল, সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও জার্মানীর এই দুই শিক্ষা-পথিকৃৎ শিশুমনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে নূতন শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রবর্তন

করেছেন। এদের পদ্ধতির দিকে মার্গারেটের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। এ নিয়ে বিস্তর পড়াশুনা তিনি ক'রে ফেললেন। তারপর চললো শিশুদের নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা।

এ সময়ে প্রগতিবাদী শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন মার্গারেট, বিশেষ ক'রে লজম্যানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। স্থানীয়.তরুণ লেখকেরা গুড্ সানডে ক্লাব নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, সেখানে নূতন ভাষণ ও লেখার ভেতর দিয়ে বিদগ্ধ মানুষদের মধ্যে সাহিত্যের রস পরিবেশিত হয়, চিন্তার বিনিময় চলে। মার্গারেট তাঁদের সঙ্গে ভিড়ে যান।

এ সময়ে নূতন উৎসাহ নিয়ে আবার লেখার কাজও তিনি শুরু করেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর আইরিশ সমস্যামূলক চিন্তাশীল নানা প্রবন্ধ।

লজম্যানদের আসরে যাতায়াত করার কালে মিসেস ডি-লিউ নামক এক প্রগতিপন্থী শিশুশিক্ষা বিজ্ঞানীর সঙ্গে মার্গারেটের বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়। এই মহিলাটি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ ফ্রোবেলের অন্যতম ভাবশিষ্যা।

মিসেস ডি-লিউ একদিন মার্গারেটকে বলেন, "লণ্ডনে আমি শিশুদের জন্য একটা নূতন ধরনের স্কুল খুলছি। তুমি কি যাবে সেখানে? আমার কাজে সাহায্য করবে।"

এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সায় দেন মার্গারেট। এমনি একটি উন্নত ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে নিজেকে তিনি পুরোপুরি ঢেলে দিতে চান। তাছাড়া, এ প্রস্তাবের আরো একটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে লণ্ডন। শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ইংরেজদের প্রাণকেন্দ্র এই মহানগর। সেখানে বাস করার সুযোগ পেলে মার্গারেট তাঁর জীবনকে স্থাপন করতে পারবেন বৃহত্তর পটভূমিকায়। সার্থকতর মহত্তর জীবনের উন্মেষ সাধনের সুযোগ—যা তিনি মনেপ্রাণে চেয়ে এসেছেন,—তা তিনি পাবেন।

লিভারপুল থেকে মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে, বুকভরা

সাহস ও আশা নিয়ে মার্গারেট উপস্থিত হলেন লণ্ডনের উইম্বলডনে। সেখানকার নূতন ক্ষুদ্র স্কুলটিতে শুরু হলো তাঁর জীবনের নূতনতর অধ্যায়।

প্রচুর প্রাণশক্তি ও বৈদগ্ধ্য রয়েছে মার্গারেটের। তাই এখনকার এই তরুণ বয়সে যখনি যেখানে গিয়েছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির চক্রে যোগদান করেছেন। আইরিশ স্বাধীনতার পূজারী, বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। লেখক ও সম্পাদকদের সঙ্গে হয়েছেন ঘনিষ্ঠ।

'ফ্রি আয়র্ল্যাণ্ড' নামে এক বিদ্রোহী দলে এসময়ে কিছুকালের জন্য মার্গারেটকে যোগদান করতে দেখা যায়। দলের সংগঠনকে দৃঢ় করতেও তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই সূত্রে প্রখ্যাত রুশ বিপ্লবী, প্রিন্স পিটার ক্রপটকিনের সংস্পর্শে আসেন মার্গারেট। এই বর্ষীয়ান্ নেতা তখন ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন। সেখানকার দুঃস্থ শ্রমিকদের আন্দোলন প্রেরণা পাচ্ছে তাঁর আদর্শ ও অভিজ্ঞতা থেকে। নিহিলিস্ট ক্রপটকিনের ভেতর অধ্যাত্মবাদের কোনো চিহ্নই ছিল না। কিন্তু এই আজন্ম সংগ্রামী, ত্যাগ তিতিক্ষাময়, আদর্শবাদী বৃদ্ধের মধ্যে মার্গারেট যেন তাঁর পিতার ছায়াকে দেখতে পেতেন। তাই শহরতলিতে, ঈলিংস্থিত ভবনে, মাঝে মাঝে তিনি এই মহাবিপ্লবীকে দেখতে যেতেন, প্রাণমন তাঁর নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতো।

মিসেস ডি-লিউর সঙ্গে একত্রে কাজ করা শেষ পর্যন্ত মার্গারেটের হয়ে ওঠে নি। তাই ১৮৯৫ সালের শেষভাগে তাঁর বিদ্যালয় থেকে নিজেকে অপসৃত ক'রে নেন, স্থাপন করেন তাঁর নিজস্ব এক শিশু-শিক্ষালয়। মার্গারেটের মৌল দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর প্রতিভা ও নিরলস কর্মোদ্যোগ অচিরে ফলপ্রসূ হয়, স্কুলটি সে অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করে।

শিশু-চিত্রকর এবেনজার কুক তখন লণ্ডনের শিক্ষিতসমাজে বেশ খ্যাতিমান। কুক বলতেন, শিশুদের সহজাত শিল্পবোধ রয়েছে। অক্ষর পরিচয়ের আগে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাদের অঙ্কনের

কাজ করতে দেওয়া উচিত, রং ও তুলির ভেতর দিয়ে তারা খুঁজে পাবে নিজ নিজ সুপ্ত প্রতিভা।

কুক বন্ধুভাবে মার্গারেটের স্কুলে প্রায়ই আসতেন, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সদাই করতেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এই এবেনজার কুকের মাধ্যমেই মার্গারেট শিল্প ও সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্র লেডি রিপনের সেলুনে আসা যাওয়া শুরু ক'রে দেন।

মার্গারেট যেখানেই যান, তাঁর অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ ঢেলে দেন তার চারপাশে। এখানেও তাই হলো নূতন বন্ধু, সেণ্ট জেমস গেজেটের সম্পাদক, আর ম্যাকনীলের এবং মার্গারেটের উৎসাহ ও চেষ্টায় সাহিত্য ও শিল্পের এই কেন্দ্রটি রূপ পরিগ্রহ করলো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের। তার নাম দেওয়া হলো সিসেম ক্লাব। মার্গারেট হলেন তার সম্পাদিকা। এছাড়া ক্লাবের অন্যতম সংগঠক এবং বক্তারূপে পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। সিসেম ক্লাবে আমন্ত্রিত হয়ে বার্নার্ড্‌শ, হাক্সলি এবং সমকালীন অন্যান্য মনীষীরা নিয়মিতভাবে আসতেন, পাঠচক্র ও বক্তৃতায় তাঁরা উৎসাহভরে যোগদান করতেন।

নিজের স্থাপিত শিশু বিদ্যালয়ে কাজ কম ছিল না। তারপর ছিল সিসেম ক্লাবের পরিচালনা। এই সঙ্গে আইরিশ মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েও মার্গারেটকে কম পরিশ্রম করতে হতো না। এত কিছু করার পরও প্রচুর লেখাপড়া ও প্রবন্ধ রচনা করতেন তিনি, মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিতেন বিদগ্ধ মণ্ডলীতে এবং গুপ্ত রাজনীতির চক্রে। বন্ধু বান্ধব এবং আশেপাশের মানুষের দৃষ্টিতে এসময় থেকেই মার্গারেট এক প্রতিভাময়ী আকর্ষণীয় তরুণী রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠেছেন, অধিষ্ঠিত হয়েছেন বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে।

এসময়ে দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়লেন মার্গারেট। অসামান্য রূপসী তাঁকে বলা যেত না বটে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি-প্রোজ্জ্বল স্বপ্নিল দুটি আয়ত চোখ, দেহের স্বাস্থ্য ও লাবণ্যশ্রী, সর্বোপরি তাঁর প্রাণোচ্ছলতা ও বৈদগ্ধ্য যে-কোনো রুচিবান তরুণকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এই প্রণয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে প্রায় দেড় বৎসর অতিবাহিত করেছেন মার্গারেট। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে মধুর প্রীতি, সত্যকার সখ্য ও যৌবনের অমোঘ আকর্ষণ। স্বর্গীয় আনন্দে আর অনাবিল প্রেমের স্রোতে ভেসে চলেছেন মার্গারেট। আসন্ন শুভ মিলনের আশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে মনের গহনে উঁকিঝুঁকি দেয় এক পূর্বতন স্মৃতি। তাঁর প্রথম বারের মিলন প্রয়াসটি দৈবের বিধানে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। বুক দুরুদুরু ক'রে কাঁপে, এবার যেন তেমন কোনো দৈবী বাধা তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত না হয়।

ইতিমধ্যে ভাবী বর বাক্‌দান অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন ক'রে ফেললেন। যাক্, এবার তাহলে মার্গারেট তাঁর ঘর বাঁধতে পারবেন, জীবনকে ভরে তুলতে পারবেন আনন্দে ও তৃপ্তিতে।

কিন্তু এবারও বিধি বাম হলেন। মার্গারেটের প্রণয়ীর সম্মুখে হঠাৎ এসে দাঁড়ায় আর এক প্রতিযোগিনী নারী, কুহকজাল বিস্তার ক'রে বসে। দেড় বৎসরের সুস্থিত প্রেম আর বিয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায় এক নিমেষে। প্রেমের ব্যর্থতা আর পরাজয়ের গ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে মার্গারেট।

অব্যক্ত বেদনা উথ্‌লে উঠতে থাকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে। সজলচক্ষে, যুক্তকরে, প্রশ্ন করেন ভগবানের কাছে, 'হে প্রভু, তবে কি এ দুর্ভাগিনীকে এ-জীবনে ঘর বাঁধার অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রেই রাখলে! স্বামীর প্রেম ও সন্তানের মায়ামমতা-ঘেরা সংসারে কোনো দিনই সে কি বাস করতে পারবে না?'

পবিত্রতা, চরিত্রবল, মননশীলতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেকে অপরের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র বলে মনে করতেন মার্গারেট। যেখানেই যেতেন, স্বাভাবিকভাবে সর্বকর্মের নেতৃত্ব করতেন তিনি, নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইতেন নিঃশেষে। এবারকার এই প্রেম-প্রত্যাখ্যানের আঘাত যেন তাঁকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত ক'রে ফেললো। একটা চাপা কান্না দিনরাত গুমরে গুমরে উঠছে তাঁর বুকে। অথচ এ নিয়ে কারুর সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন, দুঃসহ বেদনার লাঘব করবেন,

তার উপায় নেই। ব্যর্থতা ও পরাজয় তাঁকে এখানকার সবার কাছে যেন উপহাসের বস্তু ক'রে ফেলেছে।

হঠাৎ মনে পড়ে, হ্যালিফাক্সের শিক্ষিকা মিস্ কলিন্সের কথা। ঐ কঠোরতপা ও বিদুষী মহিলার ভেতরে সে লক্ষ্য করেছিল করুণাপেলব একটি মানবহৃদয়। তাঁর সংস্পর্শে এসে কিশোরী ছাত্রী মার্গারেট সে সময়ে সূক্ষ্ম উর্ধ্বলোকের একটা মধুর আস্বাদ অনুভব করেছিলেন। মনের তাপ জুড়ানোর জন্য সেই মমতাময়ী মহিলার কাছেই মার্গারেট এবার ছুটে যান।

মিস্ কলিন্সের বুকে মুখ রেখে শোকাকুল বালিকার মতো কাঁদতে থাকেন। কখনো বা বিধাতার এ অভিশাপের উত্তরে ধ্বনিত করেন বিদ্রোহের বাণী। মিস্ কলিন্সের সান্ত্বনাবাক্যে ধীরে ধীরে বেদনাহত মন শান্ত হয়ে আসে। ঈশ্বরের বিধানকে মেনে নেবার মতো সাহস, শক্তি ও স্থৈর্য লাভ করেন মার্গারেট। প্রায় সপ্তাহখানেক হ্যালিফাক্সে মিস্ কলিন্সের স্নেহচ্ছায় অবস্থান করার পর লণ্ডন অভিমুখে তিনি রওনা হন।

বিদায়ের কালে মিস্ কলিন্স আবেগভরে বলেন, "মার্গ ট, সব সময়ে মনে রাখবে ভগবানের এ আঘাত নিছক আঘাতমাত্র নয়, এর ভেতর দিয়ে মানুষকে তিনি শুচিশুভ্র ক'রে তোলেন, খুলে দেন তার ভেতরকার জ্যোতির উৎসদ্বার। চিত্ত স্থির ও প্রশান্ত হলেই এ আঘাতের কল্যাণমর্ম নিজেই তুমি বুঝতে পারবে।"

হ্যালিফাক্স থেকে লণ্ডনে ফিরে আসার পর মার্গারেট তাঁর মনের শান্তি অনেকাংশে ফিরে পান। জীবনের ছেঁড়া তার জোড়া দিয়ে আবার শুরু করেন পূর্বেকার অভ্যস্ত দিনচর্যা।

বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু কাজকর্মই মার্গারেট ক'রে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু তাতে তাঁর যেন কোনো আঁট নেই। মর্মমূলে যে আঘাত পড়েছিল, এবার তা থেকে উদ্গত হচ্ছে আত্মিক জীবনের নানা জিজ্ঞাসা। মনে পড়ে, কিশোরী জীবনে প্রায়ই ভাবতে বসতেন,— এই বিশ্ব সৃষ্টির উৎস কোথায়, কোথায় সেই পরমপ্রভু যিনি তাঁর

সৃষ্ট মানবের দিকে সদাই হাত বাড়িয়ে বসে আছেন? সেই পরম বস্তুর, সেই সত্য বস্তুর আচ্ছাদন কে দেবে সরিয়ে?

এবার উনত্রিশ বৎসরের তরুণ জীবনের মর্মমূলে সেই প্রশ্নেরই আঘাত আসে নূতন ক'রে এবং বার বার ক'রে। এ যাবৎ তাঁর স্রষ্টার কাছ থেকে, তাঁর জীবনপ্রভুর কাছ থেকে, কম ঐশ্বর্য লাভ করেন নি। শুভ সংস্কার নিয়ে তাঁর জন্ম। পবিত্রতার ভিত্তিতে নিজ জীবনকে তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন। ধীশক্তি, মনস্বিতা, প্রতিভা অনেক কিছু অকৃপণ করে ভগবান তাঁকে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন আত্মপ্রত্যয় ও বিপুল প্রাণশক্তি। যা দেন নি, তার জন্য আজ আর মনে কোনো ক্ষোভ নেই, অশান্তি নেই।

কিন্তু এসব কথা বুঝা সত্ত্বেও মার্গারেটের অন্তরে এসেছে একটা বিরাট শূন্যতাবোধ। আত্মিক জীবনের যে মাধুর্য ও প্রসন্নতা দিয়ে এই বিরাট শূন্যতাকে পূর্ণ ক'রে তোলা যায়, তা এখনো রয়ে গিয়েছে তাঁর নাগালের বাইরে।

ধর্মের প্রবল সংস্কার মার্গারেটের ভেতরে সহজাত। এই ধর্মের পরম উপলব্ধি না আসা অবধি, তাঁর জীবনে শান্তি আসবে না, আসবে না সত্যকার পূর্ণতা ও প্রসন্নতা।

খ্রীষ্টধর্ম কি তাঁকে এই পরম উপলব্ধির প্রান্তে পৌঁছুতে পারে? গীর্জার গণ্ডী আর মণ্ডলীগত সংকীর্ণতার দেয়ালে বার বার ধাক্কা খেয়েছে মার্গারেট, তাঁর আত্মিক জীবনের সুধা সেখান থেকে আহরণ করা সম্ভব নয়, এ কথাটি সে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, ফ্রি-থিংকার প্রভৃতির প্রবক্তাদের কথা সে শুনেছে, তাদের তত্ত্ব ও আদর্শ পাঠ করেছে বার বার। কিন্তু তাঁর সংবেদনশীল, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিমার্গী মনে তাঁরা সাড়া জাগাতে পারেন নি।

সংশয় ও অনিশ্চিতির দোলায় মার্গারেটের জীবন তখন দোল খাচ্ছে। তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের এই আকুতির কথা, এই শূন্যতাবোধের কথা জানতেন শুধু দু'চারজন ঘনিষ্ঠ এবং বিদগ্ধ বন্ধু। চিত্রশিল্পী এবেনজার কুক তাঁদের অন্যতম। তিনিই হঠাৎ সেদিন এসে

মার্গারেটকে জানান নবাগত হিন্দু যোগীর কথা, লেডি ইসাবেল মার্গসনের ড্রইংরুমে তাঁর ঘরোয়া ভাষণদানের কথা। হঠাৎ পাওয়া একটি সংবাদই সেদিন মার্গারেটের জীবনে এনে দিয়েছিল তাঁর জীবনের বহু প্রত্যাশিত পরম লগ্ন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর, আর এই সাক্ষাতের শুভক্ষণটি থেকে নূতনতর আত্মিক পূর্ণতার দিকে দিনের পর দিন অগ্রসর হয়েছিলেন মার্গারেট। উত্তরকালে সার্থক হয়ে উঠেছিলেন তিনি বীর সাধক, মহাবেদান্তী মহান্ কর্মবীর বিবেকানন্দের মানসতনয়া রূপে।

প্রথমবারে ১৮৯৬ সালে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম এসেছিলেন তখন মার্গারেট তাঁর ভাষণ শোনার বা সান্নিধ্যে থাকার খুব বেশী সুযোগ পায় নি। লেডি ইসাবেল মার্গসনের ড্রইংরুমের সেই ঘরোয়া বৈঠকের পর স্বামীজীর আর মাত্র দুই তিনটি ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের কালে সে উপস্থিত থেকেছে। তাঁর বক্তব্যের নোট নিয়েছে সে, অনুসন্ধিৎসু হয়ে দার্শনিক তত্ত্বের বহু প্রশ্নও তাঁকে করেছে। তারপর স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করার পর নোটগুলো বারবার পড়েছে, মনন ও বিশ্লেষণ করেছে সাধ্যমতো। স্বামীজীর মত ও পথ উদারপন্থী, তাঁর প্রচারিত বেদান্ত ও ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বও অতি মাত্রায় সর্বজনীন, সত্যপথের সন্ধান তা অবশ্যই এনে দেয়। মার্গারেট এই মহান্ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেছে, তাঁর ভেতর পেয়েছে এক ভাবী মুক্তিদাতার সন্ধান। তবুও তার যুক্তিবাদী সংশয়ী মন স্বামীজীর মত ও আদর্শকে আরো বিশ্লেষণ করতে চাইছে, যুক্তি-তর্কের প্রখর আলোতে যাচাই ক'রে নিতে চাইছে।

১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আবার লণ্ডনে এলেন আমেরিকা থেকে। এবার মার্গারেট তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে যেতে লাগলো।

মার্গারেটের ভাবমূর্তিটি বিবেকানন্দের মনোলোকে ইতিমধ্যে সঠিকভাবে ফুটে উঠেছে। আর পাঁচটি ভাববিলাসী সৌখীন অধ্যাত্ম-

বাদী মেয়ের মতো তিনি নন। তিনি যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বিচারশক্তি তাঁকে অপর সবার থেকে স্বতন্ত্র ক'রে তুলেছে। প্রশ্নোত্তর বৈঠকে মার্গারেটের প্রশ্নবাণই হয়ে ওঠে সবার চাইতে তীক্ষ্ণ। আর স্বামীজীও অপার ধৈর্য নিয়ে তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের সম্মুখীন হন, তার মীমাংসা ক'রে দেন।

একদিন হেসে মার্গারেটকে বলেন তিনি, "তোমার সংশয় আর বিচারশীলতা দেখে আমি এতটুকু ধৈর্য হারাইনে। আমি তো জানি, আমার আচার্যকে আমি কত জ্বালাতন করেছি। ছয় বৎসর সংশয় ও তর্কদ্বন্দ্বের পর আত্মসমর্পণ করেছি তাঁর কাছে।"

মার্গারেটের তাত্ত্বিক প্রশ্নের সংখ্যা ক্রমে কমে আসতে থাকে। এবারে স্বামীজীর আরো ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি এসে পড়েছেন। তাছাড়া, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি স্বামীজীর শিষ্যাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ঘনীভূত হয়েছে। ব্যক্তিগত যে সমস্যা, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের যে সমস্যা তাঁর সম্মুখে উদ্ভূত হচ্ছে, সে সম্পর্কেও মাঝে মাঝে আলোচনা করছেন স্বামীজীর সঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনমতো পরামর্শও গ্রহণ করছেন।

সেদিন মার্গারেট স্বামীজীকে তাঁর শিশু-বিদ্যালয়টি দেখতে নিয়ে গিয়েছেন। শিশু-মনস্তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে এটিকে চালানো হচ্ছে। সব দেখে শুনে আনন্দে বিবেকানন্দের চোখ দুটি ছলছল হয়ে ওঠে।

মার্গারেট উৎসাহে মুখর হয়ে ওঠেন। বলতে থাকেন, "শিশুদের মনোজগৎ একটা বিস্ময়কর জগৎ। তার অনেক কিছুই আমাদের জানা হয় নি। কিন্তু জানতে চাচ্ছি, আর সে উদ্দেশ্য নিয়ে নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা এখানে করছি। শিশুদের স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব ভঙ্গীতে ওরা ফুলের মতো ফুটে উঠবে, তাই যে আমরা চাই।"

দুঃখ দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতের কোটি কোটি মানুষের কথা মনে পড়ে যায় স্বামীজীর। অনুতাপের দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিম্নস্বরে বলতে থাকেন, "হায়, আমার দেশের দুর্ভাগা ছেলেমেয়েরা ডুবে রয়েছে ঘোর

অন্ধকারে। সেখানে চারদিকে অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার। পড়াশুনা করবে কি, অভাবের তাড়নায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেত-খামারে, খনিতে, কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। চরম দারিদ্র্যে ডুবে আছে একটা বিরাট দেশ। টাকা কোথায় যে শিশুদের বিদ্যা-দানের ঢালাও ব্যবস্থা হবে? এক একবার ভাবি, এজন্য উঠে পড়ে লাগি, গরীব ছেলেদের শিক্ষার জন্য দলে দলে কর্মী পাঠাই মাঠে মাঠে, কারখানায়, দেশের সর্ব অঞ্চলে।"

গভীর সহানুভূতিতে মার্গারেটের সারা অন্তর্লোক দুলে ওঠে দেশ-প্রেমিক, মানব-প্রেমিক, স্বামী বিবেকানন্দের এই কথা শুনে। এই বিরাট পুরুষের সংকল্পিত কর্মে সে কি নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে পারে না? তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁর মহান্ জীবনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রে নিয়ে, এগিয়ে যেতে পারেনা কি পরম সত্যের দিকে?

ফরাসী লেখিকা লিজেল রেমঁ সেদিনকার ঘটনার এক চমৎকার আলেখ্য এঁকেছেন[১]:

"স্বামীজী,...বলে মার্গারেট তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে ইতস্তত করতে থাকে। একটু মৌনী থাকে, গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে। কথাটা পাড়াই শক্ত, কিন্তু পাড়তেই হবে।

"স্বামীজীর বেদনায় হৃদয় বিচলিত হয়েছে ওর। তাঁর দেশ-হিতৈষণার এই বিপুল আবেগ অনুরাগীদের মাঝেও সঞ্চারিত হোক্। এতে প্রাণ জাগবে, কল্যাণ হবে সকলের, এটা মার্গারেট ভালভাবেই বুঝেছে। অথচ একা স্বামীজী কিছুই ক'রে উঠতে পারছেন না। কারণ, তাঁর কোনো কিছুরই স্থিরতা নেই। সংগঠন শক্তির অভাবও আছে খানিকটা, মার্গারেটের মতে। ইতিমধ্যেই ও তাঁকে কতক-গুলো সঙ্কট পার হতে সাহায্য করেছে, সলা পরামর্শ দিয়েছে। ওতো আরো হাজারো রকমে তাঁকে সাহায্য করতে পারে। কেমন ক'রে তাঁর কাজ গুছিয়ে দিতে হবে, তা ও বেশ বুঝেছে। ওর নিজের

১ নিবেদিতা ফিল্ ছ ল্যাঁদ: লিজেল রেমঁ—অনুবাদ: নারায়ণী দেবী।

জীবনে আর কোনো বন্ধন নেই। প্রেমের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে চির-দিনের মতো। ও তো সম্পূর্ণ স্বাধীন! তবে কি ও তাঁর ডান হাত হয়ে উঠতে পারে না, তাঁর কাজে নিজের জীবনকে বাঁধা দিতে পারে না তাঁর কাছে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে ওর স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই এশিয়া বা আফ্রিকা-যাত্রী পাত্রীদের বিয়ে করেছে, ও জানে···

—'তাই যদি ভগবানের ইচ্ছা, আমি আসবো আপনার পাশে··· আপনার কাজে যোগ দেবো···আমরা একসঙ্গে খাটবো একই উদ্দেশ্য নিয়ে '

"এ-প্রস্তাবের পিছনে কতখানি আত্মত্যাগ রয়ে গিয়েছে, তা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝলেন। এমন কথা এক মার্গারেটই বলতে পারে। কিন্তু ওর সন্দেহমাত্র হয় নি যে, স্বামীজী সন্ন্যাসব্রত নিয়েছেন, কঠিন তার বিধি বিধান।

"তিনি ওর কথা শুনে নত মস্তকে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী।' আর কোনো ব্যক্তিগত কথাই হলো না।"

পবিত্রতা, তেজ, স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার দীপ্তিতে মার্গারেট নোবল ছিলেন একখানি খাপখোলা তরবারি। এই তরবারিটিকে সাগ্রহে সেদিন তিনি ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যোদ্ধ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কোমরবন্ধে। কিন্তু আবেগের বশে সেদিন একটা প্রকাণ্ড ভুল তিনি ক'রে বসেছিলেন। ক্ষণপরেই তিনি আত্মস্থ হলেন এবং নূতনতর মূল্যায়নে ও নূতনতর মহিমায় স্বামী বিবেকানন্দকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন।

ব্যক্তিসত্তা ও মায়িক জীবনকে সমিধের মতো বিরজাহোমের আগুনে ভস্মীভূত করেন ভারতীয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের সাধনপথের পথিক হন। বিবেকানন্দ যে তেমনি এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী!

মুহূর্তে উপলব্ধি করলেন মার্গারেট,—প্রদীপ্ত নয়ন, প্রিয়দর্শন, প্রতিভা-সমুজ্জ্বল যে আচার্যকে দেখে তিনি আজ মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁর তরুণ জীবনের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছেন, সে আচার্য মায়িক সম্বন্ধের বহু ঊর্ধ্বে বিরাজমান। স্বামী বিবেকানন্দকে আঁকড়ে ধরতে হলে

মিস্ মার্গারেট নোবলকে আঁকড়ে ধরতে হবে সেই পরম বস্তুকে যা তাঁর ভেতরে জ্যোতির্ময় সত্তারূপে ফুটে রয়েছে। জীবনতরীর চালক হিসেবে মার্গারেট যদি তাঁকে পেতে চান তবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে শুদ্ধবুদ্ধ এবং মুক্তাত্মা স্বামীজীর কাছে। সদ্ গুরুরূপী, আধ্যাত্মিক পিতারূপী, দেবমানব বিবেকানন্দের কাছেই তাঁকে শরণ নিতে হবে।

স্বামীজীর ঘরোয়া ক্লাসগুলি ছিল দার্শনিক যুক্তিতর্কের বড় আসর। এ আসরে মার্গারেট সদাই সকলের পুরোভাগে।

একদিন প্রবল বাদপ্রতিবাদের ঝড়ো হাওয়ার পর স্বামীজী ভাবাপ্লুত স্বরে বলে ওঠেন, "বিশ্বে আজ সত্যকার অভাব কিসের তা জানো? বিশ্ব চায় এমন বিশজন নরনারী যারা সদর্পে দাঁড়িয়ে বলতে পারে,—ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র সম্বল। কে কে একাজে যেতে প্রস্তুত?"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে স্বামীজী আসন ছেড়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ান, স্থির থর নেত্রে তাকিয়ে থাকেন অন্তরঙ্গ শ্রোতাদের দিকে। তাঁর বজ্রকণ্ঠের আহ্বান জাগিয়ে তোলে দিব্য প্রেরণা। উদ্বেল হয়ে ওঠে মার্গারেটের বক্ষ। ভাবে, সে কি এক্ষুণি উঠে দাঁড়াবে, সাড়া দেবে এই চরম উৎসর্গের আমন্ত্রণে?

আবার প্রত্যয়ভরা উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেন স্বামীজী, "কিসের ভয়? ঈশ্বর আছেন, একথা যদি সত্য হয়, তবে এই জগতের আর কিছু দিয়ে মানুষের কি প্রয়োজন? আর যদি একথা সত্য না হয়, তবে আমাদের জীবনেরই বা ফল কি? সার্থকতা কি?"

অতঃপর মার্গারেটের প্রতীক্ষমাণ জীবনের দ্বারে আসে স্বামীজীর আহ্বানের আর এক স্পষ্টতর ইঙ্গিত। এক চিঠিতে তিনি লিখেন:

—প্রিয় মিস নোবল,

আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যেতে

পারে—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং প্রতিটি কাজে দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ।

এ জগৎ কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যে উৎপীড়িত, নির্জিত—সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, তাকে আমি করুণা করি। আর যে উৎপীড়ক সে আমার অধিকতর করুণার পাত্র।

একটা ধারণা আমার সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সকল দুঃখের মূলে রয়েছে শুধু অজ্ঞতা। জগৎকে আলো দিয়ে পথ দেখাবে কে? আত্ম-উৎসর্গ ছিল অতীতের পথপ্রদর্শকদের নীতি। এবং হায়, যুগ যুগ ধরে তাই যে চলতে থাকবে। জগতে যাঁরা সবার চাইতে সাহসী ও বরেণ্য, বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় তাঁদের আত্মদান করতে হবে। আবার প্রেম করুণার উৎস শত শত বুদ্ধকে এজন্য হতে হবে আবির্ভূত।

জগতের ধর্মগুলি আজকের দিনে যেন প্রাণহীন ব্যঙ্গরূপে পর্যবসিত। জগৎ চায় প্রকৃত চরিত্র। জগতে আজ তেমনি সব মানুষের প্রয়োজন, যাঁদের জীবন প্রেমের প্রভায় ভাস্বর, যারা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থবোধহীন। সেই প্রেম যে প্রত্যেকটি উচ্চারিত বাক্যকে বজ্রগর্ভ ক'রে তুলবে। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, এটি নিশ্চয়ই তোমার দৃষ্টিতে কোনো কুসংস্কার নয়। তোমার ভেতরে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা বিশ্ব-আলোড়ক শক্তি। আমাদের কাজে ধীরে ধীরে আরো অনেকে আসবে। আমরা চাই সাহস-উদ্দীপক বাণী আর সাহসপূর্ণ কর্ম! হে মহাপ্রাণ। ওঠো, জাগো! যন্ত্রণার আগুনে জগৎ দগ্ধ হয়ে মরছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা আবাহন জানাই, যতক্ষণ অবধি অন্তরের দেবতা এ আবাহনে সাড়া না দেন। জীবনে একাজ অপেক্ষা গুরুতর ও মহত্তর আর কি আছে বলতো?

আমার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত কর্মসূচী এসে উপস্থিত হবে। আমি আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা করি না; আমার কর্মপ্রণালী আপনা থেকে গড়ে ওঠে, এবং কর্মকে সুসম্পন্ন ক'রে তোলে।

আমি শুধু বলি, জাগো! জাগো! অনন্তকালের জন্য রইলো আমার আশীর্বাদ।

—বিবেকানন্দ

প্রেম ও করুণার এই চৈতন্যময় মহাআহ্বান উদ্বেল ক'রে তোলে মার্গারেটের সর্বসত্তাকে। জীবন উৎসর্গের জন্য দৃঢ়তর সংকল্প জেগে ওঠে তাঁর মনে।

গ্রীষ্মের সময় মাস তিনেকের জন্য স্বামীজী ইংল্যাণ্ড থেকে সুইটজারল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভক্ত সেভিয়ার দম্পতি, মিস্ হেনরিয়েটা মূলার, গুডউইন প্রভৃতি। সেখানে থাকা কালে স্থির হয়, এই ভক্ত শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে ভারতে যাবেন, সেখানে পবিত্র হিমালয়ের বুকে কুমায়ুন অঞ্চলে গড়ে তোলা হবে একটি মনোরম মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় আপ্লুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধকেরা সেখানে থেকে তপস্যা করবেন, উন্মোচিত করবেন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক নবতন প্রবাহ।

লণ্ডনে ফিরে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁর সংকল্পিত কর্মের মাঝে। প্রচার, ভাষণ, সংগঠন, সব চলছে একসঙ্গে। ইতিমধ্যে তাঁর রাজযোগ বইখানা প্রকাশিত হয়েছে। এক মাসের মধ্যে তার সব কপিও নিঃশেষিত। শিকাগোর বিশ্বধর্মমেলার বিজয়ী বীর লণ্ডনেও দৃঢ়রূপে প্রোথিত করেছেন বেদান্তের নিশান, সর্বজনীন হিন্দুধর্মের নিশান।

মিস্ মার্গারেট নোবল্ এখন তাঁর সেক্রেটারী, এবং বহু কর্মের সহযোগিনী। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আপন মনে বলে ওঠেন এই সার্থকনামা বীর সন্ন্যাসী, "সারা জীবনে আমি যা করবো, আমার গুরুর তুলনায় তা একমুঠো ভস্ম ছাড়া আর কি?"

চমকে ওঠেন মার্গারেট। আমেরিকা ও ইউরোপের সুধী মহলে যাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই, দিকে দিকে বেজে উঠেছে যাঁর

বিজয়-দুন্দুভি, তাঁর মুখে একি বিস্ময়কর কথা ? গীতার যে জ্ঞানময় বাণী সেদিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন বিবেকানন্দের কণ্ঠে, তা মনে পড়ে যায়।—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,—কর্মেই শুধু অধিকার, লাভালাভ জয় পরাজয়ের কথা অবান্তর।

সেদিন ভক্তদের এক আসরে বসে মার্গারেটকে বলে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ, "ভারতে স্ত্রীশিক্ষার একটা পরিকল্পনার কথা ভাবছি। হয়তো সে কাজে তোমার থেকে অনেক সহায়তা পাবো।"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। দুঃখিত অন্তরে ভক্তদের কাছে বর্ণনা করেন—কি ভাবে তাঁর একটি আদরের বোন শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ফলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। এ দুর্ঘটনাটির শোকাবহ স্মৃতি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি স্বামীজী। তারপর থেকে তিনি ভারতীয় নারীদের সুশিক্ষা ও সামাজিক মুক্তির কত স্বপ্ন দেখে আসছেন।

আনন্দে দুলে ওঠে মার্গারেটের মন প্রাণ, স্বামীজীর এ আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু এ কথা নিয়ে স্বামীজী সেদিন আর অগ্রসর হন নি। চলে গিয়েছেন অপর প্রসঙ্গে।

নিজের মনের অগোচরে, স্বামীজীর মহান্ ব্যক্তিসত্তার পূজারিণী হয়ে উঠেছেন মার্গারেট। সম্মোহিতের মতো প্রবেশ করেছেন তাঁর আত্মিক জীবনের প্রভাব-বলয়ের ভেতরে। এই মহান্ নেতার জন্য, তাঁর দেশের জন্য, নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, আর নিজের দেশ ও নিজের আত্মপরিজনের প্রতি মমত্ববোধ এবার প্রায় বিলীন হতে বসেছে।

কিন্তু স্বামীজী যেন মার্গারেটের কাছে থেকেও সুদূরের মানুষ। দিনের পর দিন মার্গারেট লক্ষ্য করছে তাঁকে—সিংহবিক্রমে অবিরাম তিনি কর্ম ক'রে যাচ্ছেন, আবার যে কোনো মুহূর্তে কর্মের এই রণক্ষেত্র থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন অবলীলায়, প্রবেশ করছেন তাঁর আত্মিক জীবনের নির্জন গুহায়। সেখানে তিনি একেবারে নির্লিপ্ত, নির্ব্যৈক্তিক।

স্বামীজীর ধ্যানের ভারত, ধ্যানের বেদান্ত, মার্গারেটেরও ধ্যানের বস্তু হয়ে উঠেছে। স্বামীজীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলে তিনি যে ধন্য হবেন, এ কথাটি কেন যেন নিজে মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছেন না মার্গারেট।

সেদিন স্বামীজী ও মার্গারেট দু'জনেই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন হেনরিয়েটা মুলারের ভবনে। সেখানে মার্গারেটের পক্ষ হয়ে মুলার জানালেন স্বামীজীকে, "মার্গারেটের একান্ত ইচ্ছা, ভারতে স্বামীজী যে বিপুল কর্মের উদ্যোগ শুরু করবেন, সে ভার সামিল হতে চায়। ভারতবর্ষকেই করতে চায় তার কর্মভূমি, সাধনভূমি।"

মার্গারেট স্বামীজীর কাজে সাহায্য করবেন, এটা স্বামীজী খুবই আশা করছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের সর্ব সংস্কার বিসর্জন দেবেন, তাঁর স্বদেশ, ধর্ম সংস্কৃতি ও আত্মপরিজন পরিবার ত্যাগ ক'রে ভারতে গিয়ে বসবাস করবেন, এতটা ভাবতে পারেন নি স্বামীজী।

এ প্রস্তাব শোনা মাত্র তাঁর আয়ত নয়ন দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। ভাবাবেগে বলতে লাগলেন, "আমার দিক থেকে আমি শুধু এই বলতে পারি, আমার দেশের যে পবিত্র কর্মভার আমি মাথায় নিয়েছি, তা উদ্‌যাপনের জন্য দুশো বার আমি জন্ম নিতে প্রস্তুত।"

সেদিন শ্রীমতী মুলারের বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগে স্বামীজী মার্গারেটকে কাছে ডাকলেন। প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "তুমি তোমার মতো সাহসী নারীর যোগ্য সিদ্ধান্তই নিয়েছো। হ্যাঁ, ভারতবর্ষই হবে তোমার আপন স্থান। কিন্তু এজন্য তোমায় প্রস্তুত হতে হবে। সে প্রস্তুতি গড়ে উঠবে তিলে তিলে, কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষা ও তপস্যার ভেতর দিয়ে।"

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে চললেন কয়েকজন পাশ্চাত্য শিষ্য ও শিষ্যা। সবাই কিন্তু অবাক হলেন দেখে, ভক্তদের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা মার্গারেট তাঁদের ভেতরে নেই। জানা গেল, মার্গারেট তাঁর নিজের প্রবর্তিত

স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে, তারপর ভারতে চলে আসবেন।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের বংশে মার্গারেটের জন্ম। পিতা ও পিতামহের সংস্কারগুলো তাঁর ভেতরে প্রবলভাবে বয়ে চলেছে। তাছাড়া, মার্গারেট অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আবেগপ্রধান, তাই বিবেকানন্দ হয়তো তাঁকে আরো কিছুটা সময় দিতে চেয়েছিলেন মানসিক প্রস্তুতির জন্য। ভেবেছিলেন, ওর সংস্কার ও আবেগ আরও কিছুটা শান্ত হোক, থিতিয়ে আসুক।

দেশে ফিরবার মাস ছয়েক পরে মার্গারেট নোবল্‌কে এক গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দিলেন স্বামীজী। এতে ভারতের বাস্তব জীবনের রূঢ়তা সম্বন্ধে যেমন সতর্ক বাণী রয়েছে, তেমনি রয়েছে আচার্য হিসেবে তাঁর আশ্বাস ও প্রেরণাদান :

"তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর— —একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।

"কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা ; ভয়েই হোক বা ঘৃণায়ই হোক—তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গেরা তোমাকে খামখেয়ালী মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চক্ষে দেখবে।

"তাছাড়া, জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশের প্রায় সব

জায়গার শীতই তোমাদের গ্রীষ্মের মতো, আর দক্ষিণাঞ্চলে তো সর্বদাই আগুনের হলকা চলছে।

"শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই। যদি এসব সত্ত্বেও তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হ'তে সাহস কর, তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি। সর্বত্র যেমন, তেমনি এখানেও আমি কেউ নই; তবু আমার যেটুকু প্রভাব আছে, সেটুকু দিয়ে আমি অবশ্যই তোমায় সাহায্য করব।

"কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা ক'রো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনও কর্মে বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে, আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্তধর্ম ত্যাগই কর আর ধরেই থাকো, 'মরদকী বাত হাতীকা দাঁত'—একবার বেরুলে আর ভিতরে যায় না; খাঁটি লোকের কথারও কোন নড়চড় নেই—এই আমার প্রতিজ্ঞা। সেই সঙ্গে আবার সতর্ক করে দিই। তোমাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।"

মনস্বিনী মার্গারেট তাঁর তরুণ জীবনের সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ত্যাগ ক'রে ভারতে আসছেন প্রধানত স্বামীজীর দিব্যোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের টানে—একথা স্বামীজী জানতেন। তাই নিজের নেতৃত্ব ও আচার্য জীবনের প্রকৃত স্বরূপটি তাঁকে আগেভাগেই জানিয়ে দিলেন। লিখলেন আর একটি চিঠিতে:

শ্রীনগর, কাশ্মীর
১ অক্টোবর, ১৮৯৭

—অনেকে অপরের নেতৃত্বে সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারে। সকলেই কিছু নেতা হয়ে জন্মায় না। শ্রেষ্ঠ নেতা তিনিই, যিনি শিশুর মত নেতৃত্ব করেন। শিশুকে আপাতত অন্যের উপর নির্ভরশীল মনে হলেও, সে-ই বাড়ির রাজা। অন্তত, আমার ধারণায় এখানেই নেতৃত্বের রহস্য। অনুভব অনেকেই করে, প্রকাশ করতে পারে মাত্র

কয়েকজন। অন্যের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি ও সমাদর জ্ঞাপনের ক্ষমতার দ্বারাই একে অন্যের তুলনায় ভাবপ্রচারে অধিক সাফল্যলাভ করে।

বড় অসুবিধা এই আমি দেখতে পাই—অনেকে তাদের প্রায় সবটুকু ভালবাসাই আমার উপর অর্পণ করে। কিন্তু প্রতিদানে কোন একজনকে আমার সবটুকু তো দেওয়া চলে না, কারণ সেক্ষেত্রে একদিনেই সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ তেমনই চায়—যাদের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি নেই। কাজের সাফল্যের জন্য যত বেশি সংখ্যক সম্ভব মানুষের উৎসাহপূর্ণ ভালবাসা পাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু অপরদিকে আমাকে ভালবাসার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্পর্কের উপরে থাকতে হবে। নচেৎ ঈর্ষা ও বিপদে সব কিছু চুরমার করে দেবে। নেতাকে থাকতে হবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডীর বাইরে। প্রকৃত জিনিসটি তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আমি একথা বলছি না যে, অপরের ভক্তিকে তিনি পাষণ্ডের মত নিজের কাজে লাগাবেন, আর পিছনে হাসবেন। আমি যা বলতে চাই, তা আমার জীবনেই ব্যক্ত; আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হলে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন—'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' আমি নিজহস্তে নিজ হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি। পাগল এই প্রেম, কিন্তু কোন বন্ধন নেই। প্রেমের প্রভাবে জড় চেতনে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত, এই হল বেদান্তের সার কথা। সেই একই আছেন, অজ্ঞানীরা যাকে জড় বস্তু বলে দেখে, মনীষীরা তাকেই দেখে ভগবান্ বলে। সভ্যতার ইতিহাস নিরাকারকে সাকার দেখে, জ্ঞানীরা সাকারের মধ্যে নিরাকারের দর্শন পায়। সুখে দুঃখে বেদনায় এই শিক্ষাই আমরা পেয়ে যাচ্ছি।

—বিবেকানন্দ

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মার্গারেটের জীবনের এক স্বর্ণাক্ষর দিবস। ঐদিন তাঁর ধ্যানের ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় তিনি পদার্পণ

করলেন। জেটিতে তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আচার্যকে দর্শন করে মার্গারেট আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন।

অতঃপর রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে নিবেদিতা পরিচিত হতে লাগলেন।

দেবী সারদামণি দেশ থেকে বাগবাজারের বাড়িতে আসার পর বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশিনী ভক্তদের নিয়ে গেলেন মায়ের চরণ দর্শনে। এদের দেখে শ্রীমার আনন্দের অবধি নেই। কন্যা জ্ঞানে চিবুক স্পর্শ ক'রে সবাইকে আদর করলেন, এমন কি তাদের সঙ্গে বসে জল খাবার খেতেও তাঁর দ্বিধা রইলো না। রক্ষণশীল জীবনে অভ্যস্ত সঙ্ঘজননীর এ উদারতা ও স্নেহ প্রেমের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন মার্গারেট।

অতঃপর মার্গারেটের জীবনে সংযোজিত হয় এক নূতনতর অধ্যায়। শুভদিনে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দান করেন। বেলুড় মঠের ঠাকুরঘরে পূজার আয়োজন করা ছিল, সেখানে বসে সংক্ষেপে শিবপূজা করার পর ভক্তিভরে শিষ্যা প্রণাম নিবেদন করেন স্বামীজীর চরণে। দীক্ষার সময়ে আচার্য তাঁর নব নামকরণ করেছিলেন নিবেদিতা। মার্গারেট নোবলের এই নব নামকরণ এবং গুরুর আদিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপন—দুই-ই তাঁকে ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর ক'রে রেখেছে।

ভারতের কল্যাণে স্বামীজী তাঁর এই শিষ্যা ও মানসকন্যাকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। নামের এমন সার্থকতা লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে।

স্বামীজীর বিদেশিনী শিষ্যার এই নামটি লক্ষ্য ক'রে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য ক্ষমতা আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয়স্বজনের

স্নেহ মমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব—কিছুই তাঁহাকে ফিরাইতে পারে নাই !'

বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠের মতো সন্ন্যাসিনী ও মহিলা ভক্তদের জন্য আর একটি মঠের পত্তন ক'রে যাবেন। নিবেদিতাই যে এরূপ একটি মঠ পরিচালনার কাজে সর্বাপেক্ষা বেশী উপযুক্ত এবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসিনী মঠ স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ তখনকার দিনে কোথায়? তাই স্বামীজী স্থির করলেন, নিবেদিতাকে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার একটি বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করবেন এবং তার সূচনাটি হবে নিবেদিতার পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র নারী বিদ্যালয় থেকে। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিবেদিতার পক্ষে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ দুই-ই সহজতর হবে বলে স্বামীজী ভেবেছিলেন। ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিময় জীবনের সঙ্গে নিবেদিতা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠুন, তাঁর ভারতীয়করণ পূর্ণাঙ্গ হোক্, এটাই ছিল স্বামীজীর আশা। তাঁর এ আশা যে পূর্ণ হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

দীক্ষা দান করার পরের দিন স্বামীজী নিবেদিতাকে প্রশ্ন করেন, "এখন তুমি নিজেকে কোন জাতির বলে মনে করছো?"

ব্রিটিশ জাতীয় পতাকার উপর নিবেদিতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তিনি সহজ স্বরে উত্তর দিলেন, "কেন, আমি জাতিতে অবশ্যই বৃটিশ[১]।"

স্বামীজী বিস্মিত হলেন বৈকি। তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা লাভের পরেও শিষ্যার স্বাজাত্যবোধ কি আগের মতনই রয়ে গিয়েছে?

স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, ভাবের প্রাবল্যে, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে বীরপূজার দিকেই নিবেদিতা ঝুঁকেছেন। এবার তাঁকে এ নূতন অধ্যাত্মজীবনকে পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করতে

১ জাতিতে আইরিশ ছিলেন নিবেদিতা, কিন্তু আয়র্লাণ্ড দেশটি গ্রেটবৃটেনের অন্তর্ভুক্ত বলে, পরিচয়ে তিনি ছিলেন বৃটিশ।

হবে, আত্মসংশোধন করতে হবে। নিবেদিতা ভারতকে ভালবাসতে শুরু করেছেন সত্য, কিন্তু মনেপ্রাণে ভারতীয় হতে পারেন নি তখনো। স্বামীজী যে তাই চান, আরো চান সর্ব পূর্ব সংস্কারের বর্জন।

এজন্য অল্প কিছুদিনের জন্য স্বামীজী বেছে নিলেন ভারতীয় গুরুদের অবলম্বিত কঠোর পথটি। কখনো করছেন উপেক্ষা, কখনো বা অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে নিবেদিতার অহংবোধ, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যকে বার বার আঘাত করছেন তিনি। এর ফলে নবদীক্ষিতা শিষ্যা নিবেদিতার মনে পর্যায় ক্রমে নেমে আসতে থাকে নৈরাশ্য আর সংশয়।

নিবেদিতার অন্তর্লোকের তৎকালীন দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মুক্তিপ্রাণা। লিখেছেন ঃ

"চিন্তায় ও অনুভূতির ক্ষেত্রে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী এত পরিপূর্ণ ও সবল ছিল যে, নিবেদিতার মানসিক রাজ্যে উহা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিকে শিক্ষার কঠোরতা তো ছিলই, ইহারই সহিত আর একটি বিষয় তাঁহাকে প্রবলভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার নিকট ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। স্বামীজীর উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার ভারতে আগমন। তাঁহার মধ্যে নিবেদিতা এক অনুকূল ভাবাপন্ন, প্রিয় আচার্য লাভের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে স্বামীজীর ব্যবহারে তাঁহাকে উদাসীন, হয়তো বা বিরূপ বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। এই চিন্তাও নিবেদিতার নিকট অসহনীয় ছিল। একদিকে আশাভঙ্গের ফলে অবিশ্বাসের উদয়, অপর দিকে বিরক্তি এবং কতকটা শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নিবেদিতা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

"স্বামীজীর সহিত তাঁহার এইরূপ সংঘর্ষের কারণ ছিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা নিবেদিতা গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার আদর্শ এবং যুক্তিগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করিবার মতো মানসিক দীনতা নিবেদিতার ছিল না। তিনি নিজে যদি সাধারণ হইতেন, তাহা হইলে স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা

কেবল আকৃষ্ট নহে, অভিভূত হইতেন এবং নিজ মতবাদ বা যুক্তি অনায়াসে, বিসর্জন দিতেন। কিন্তু নিবেদিতার চরিত্রও অসাধারণ, তাঁহার ব্যক্তিত্বও কিছু কম নহে। তাহার উপর ছিল প্রচণ্ড তেজ ও অভিমান। অসহায়ভাবে নিজেকে বিলুপ্ত করিবেন, নিবেদিতার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার নিজের দিক দিয়া বিচার এবং ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য।

"দ্বিতীয়ত, স্বামীজী যদি কোমলভাবে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ নিবেদিতার নিকট উপস্থিত করিতেন, তাহা হইলে হয়তো হৃদয়ের আবেগবশত নিবেদিতা কতকটা নত হইতেন। ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্রের নিকট স্বেচ্ছায় পরাজয়-স্বীকার বহু সময়ে ঘটিয়া থাকে —কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু স্বামীজী সে ধার দিয়াও যান নাই। তাঁহার অভিধানে আপস বলিয়া কোনো শব্দ ছিল না। বিশেষত তিনি বুঝিয়াছিলেন, নিবেদিতার যে দৃঢ় অনুরাগ, তাহা একান্ত তাঁহারই প্রতি। এই ব্যক্তিগত বন্ধন নির্মমভাবে ছিন্ন করিবার জন্য তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। ফলে নিবেদিতার সমগ্র অন্তর শূন্যতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল[১]।"

নিবেদিতা সম্পর্কে সাময়িকভাবে যে নীতি স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন, অচিরে তা কিন্তু ফলপ্রসূ হয়েছিল। নিজের পূর্বাশ্রমের সংস্কার, পাশ্চাত্যের অভ্যস্ত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে পরিহার করা শুরু করেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দও এবার এগিয়ে আসেন বেশ খানিকটা। ভারতবর্ষ এবং তার ধর্মসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে বার বার উদ্‌ঘাটন করতে থাকেন তাঁর নূতনতর এই অধ্যাত্মসৃষ্টি—ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতার কাছে।

এ সময়কার এক চিঠিতে নিবেদিতার নূতনতর ও গভীরতর দৃষ্টির পরিচয় পাই :

"অনেক কিছুই এবার শিখিতেছি।···একটি নির্দিষ্ট অবস্থা আছে, তাহাকেই আখ্যা দেওয়া চলে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা

১ ভগিনী নিবেদিতা : মুক্তিপ্রাণা

লাভ করা প্রয়োজন। মানুষের ভালবাসা লাভ করিবার জন্য হৃদয় যেমন আকুল হইয়া উঠে, ঠিক তেমন করিয়া অন্তরাত্মা হাহাকার করে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য। যাহা এতদিন ধরিয়া আমার কাছে মহানুভবতা বা নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, প্রকৃত অহমিকাশূন্যতার শুভ্র অনাবিল জ্যোতির তুলনায় তাহা নিতান্তই হালকা ও অত্যন্ত শুষ্ক অবস্থা ব্যতীত কিছুই নহে। এ সবই আমি উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আশ্চর্য! প্রাথমিক সত্যগুলি পরিষ্কার রূপে দেখিতে এত সময় লাগিল। আপাতত ইহার অধিক আর কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মানুষের জীবন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে আমার অতীত ধারণাগুলিকে এখনও সম্পূর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই—অথচ দেখিতেছি, মহাপুরুষগণ সেগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। আর তাঁহারা কি একেবারে ভ্রান্ত হইতে পারেন? বর্তমানে আমি কেবল অন্ধকারেই হাতড়াইতেছি; এখানে ওখানে জিজ্ঞাসা করিতেছি ও প্রমাণ খুঁজিতেছি। আশাকরি একদিন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিব, আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত অপরকে তাহা দান করিতেও পারিব।

"একটা ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শরীর এবং আত্মা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নিজেকে এত সুখী মনে হইতেছে যে, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।"

নিবেদিতা—(৬। ৬। ৯৮-এর পত্র)

তাঁর নিজস্ব বাসায় ১৬ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা স্থায়ী ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। তাহলেও প্রতিটি দুপুর তিনি শ্রীমার সঙ্গে কাটাতেন। শ্রীমা বাস করতেন অতি নিকটেই। গ্রীষ্মকালে তিনি নিজের কক্ষেই নিবেদিতাকে বিশ্রামের অনুমতি দিয়েছিলেন। ঘরটি ঠাণ্ডা, আসবাবপত্র প্রায় নেই বললেই চলে। মসৃণ লাল মেঝের ওপর পর পর মাদুর বিছানো; প্রতিটির ওপর বালিশ ও মশারি। এ বাড়ির ওপর তলা থেকে শ্রীমা প্রতিদিন গঙ্গা দর্শন করতেন। এই সময়ে তাঁর সেবিকা ও সঙ্গিনীদের মধ্যে ছিলেন গোপালের মা,

যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদি। এরা সবাই বিধবা এবং নিষ্ঠাবতী সাধিকা।

"শ্রীমার গৃহখানি যেন শান্তি ও মাধুর্যের নিলয়। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বেই সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া জপের মালা হস্তে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া জপে মগ্ন হইতেন। নিবেদিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেন, কী ধীর স্থির ভাবে ইঁহারা দীর্ঘকাল বসিয়া আছেন। সূর্যোদয়ের পর গৃহকর্ম আরম্ভ হইত। একটু বেলা হইলে শ্রীমা যখন নিজের ঘরে শ্রীঠাকুরের পূজায় বসিতেন, তখন সকলেই নানাভাবে পূজার আয়োজনে সাহায্য করিতেন। নিবেদিতা দেখিতেন, দীপ জ্বালা, ধূপধুনা দেওয়া, পুষ্প নৈবেদ্য সাজানো প্রভৃতি কাজগুলিতে সকলেরই কী গভীর নিষ্ঠা! মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম এবং তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া গল্পগুজব। লক্ষ্মীদিদি তাঁহার স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তার সহিত বিভিন্ন দেবমূর্তির নকল এবং নানা প্রকার পালার অভিনয় দেখাইয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। সন্ধ্যা হইবামাত্র গল্প-গুজব হাস্য-পরিহাস সব থামিয়া যাইত। ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখানো হইতেই সকলে একান্ত ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে প্রণাম করিয়া শ্রীমা ও গোপালের মা'র পাদবন্দনা করিতেন। তারপর সকলেই জপে বসিতেন; আর নিবেদিতা শ্রীমার পার্শ্বে বসিবার সৌভাগ্য লাভে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন[১]।"

স্বামীজীর প্রধান উপদেশ ছিল তাঁর পাশ্চাত্যের শিষ্য ও শিষ্যাদের প্রতি,—ভারতবর্ষ ও তার সাধনাকে ভালোবাসো, এ দুটি তত্ত্বকে জানো এবং এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করো। শ্রীমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করার ফলে নিবেদিতা ভারতবর্ষ ও তার সাধনাকে জানার সুযোগ পেলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। শ্রীমা ও তাঁর পরিমণ্ডল নিবেদিতার কাছে হয়ে উঠলো ভারতীয় জীবন ও ধর্ম সংস্কৃতির একটি পবিত্র উৎসস্থল।

---

১ ভগিনী নিবেদিতা : মুক্তিপ্রাণা

নিবেদিতা সহজাত শুভ সংস্কার এবং প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। তাই প্রথম দর্শনের দিনেই শ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের মধ্যে যে পার্থক্য, তা বুঝে নিতে তাঁর দেরি হয় নি। আলমোড়ায় অবস্থানকালে তাঁর এক বন্ধুকে শ্রীমাকে প্রথম দর্শনের এক মনোজ্ঞ বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন—

"অনেকবার ভাবিয়াছি, তোমাকে সেই পবিত্রা মহিলার কথা বলিব। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী। নাম সারদা। একজন হিন্দু বিধবার মতই তাঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র। এই শুভ্র শাড়ীটি তাঁহার সারা দেহ পরিবেষ্টন করিয়া মাথা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। এ যেন পাশ্চাত্য দেশের সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন। তাঁহাকে ভাল করিয়া জানিলে বুঝা যায়, তাঁহার মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি এবং তৎপরতার কী চমৎকার প্রকাশ। তিনি মাধুর্যের প্রতিমূর্তি—এত শান্ত, নম্র, স্নেহপ্রবণ, আবার ছোট বালিকার মতই সদা উৎফুল্ল। বরাবরই তিনি ছিলেন রক্ষণশীলা, কিন্তু আশ্চর্য, পাশ্চাত্যবাসিনীগণকে দেখিবার পরমুহূর্তে তাঁহার রক্ষণশীলতার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তিনি আমাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করায় সকলেই খুব আশ্চর্য হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই আচরণ আমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছে, আর আমার ভবিষ্যৎ কাজের সম্ভাবনাকে যতখানি সফল করিয়া তুলিয়াছে, আর কিছুই তেমন পারিত না।

"তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালে চোদ্দ-পনেরো জন উচ্চবর্ণের মহিলা তাঁহার সেবা পরিচর্যা করেন; এবং তিনি অপূর্ব কৌশল ও ভালবাসার দ্বারা তাঁহাদিগকে সদা শান্তির মধ্যে রাখেন। সত্যিই, শক্তিরূপিণী এবং মহানুভবা রমণীগণের তিনি অন্যতমা, যদিও বাহিরে নিতান্ত সরল ও সহজ।"

নিবেদিতা এবং পাশ্চাত্যের অপর শিষ্য শিষ্যাদের নিয়ে হিমালয়ের কোলে আলমোড়া অঞ্চলে কিছুকাল বাস করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর রওনা হন কাশ্মীর ও অমরনাথ তীর্থের দিকে। এ সময়ে

অমরনাথ দর্শন ও ক্ষীরভবানীতে জগজ্জননীর পূজা ও ধ্যান মননের ফলে স্বামীজীর দেহে মনে ও সারা সত্তায় জেগে ওঠে পরম অনুভূতি ও দিব্য চেতনা। তাঁর এই চৈতন্যময় দিব্যসত্তার পরিচয় নিবেদিতার জানা ছিল না। এ যাবৎ বেদান্তের প্রতিভাধর প্রচারক ও আত্মত্যাগী বীর সন্ন্যাসীরূপেই নিবেদিতা তাঁকে দেখে আসছিলেন। এবার তাঁর নয়ন সমক্ষে প্রকটিত হলো স্বামীজীর মহিমময় সদ্‌গুরু-স্বরূপ। এই দর্শনের ভেতর দিয়ে দেবমানব বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ করলেন নিবেদিতা। নূতন ক'রে করলেন আত্মসমর্পণ।

বান্ধবী মিসেস হ্যামণ্ডকে এসময়কার বিস্ময়কর বিবরণ জানাচ্ছেন নিবেদিতা তাঁর এক চিঠিতে :

—এবার যা বলবো তাতে চমকে যাবে। এক সপ্তাহের জন্য হিমালয়ের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম—১৮০০০ ফুট উঁচুতে! স্বামীজীর সঙ্গে হিমবাহ দেখতে গিয়েছিলাম, বাইরের লোকের এইটুকু জানলেই চলবে, বাকি অংশ নাই বা জানলে। আসলে আমরা পবিত্র অমরনাথের গুহায় তীর্থযাত্রা করতে গিয়েছিলাম, যেখানে স্বামীজী আমাকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন বিশেষভাবে।

স্বামীজীর কাছে গভীর-গম্ভীর সেই ক্ষণ। তিনি একেবারে আত্মনিমজ্জিত—যদিও গুহামধ্যে মাত্র দু-মিনিট ছিলেন, তারপরেই নির্গত হয়ে আসেন, পাছে ভাবাবেগে আত্মহারা হয়ে যান। দারুণ শ্রান্তও হয়ে পড়েছিলেন ; দীর্ঘ মারাত্মক পথ ভেঙে তাঁকে উঠতে হয়েছিল, হৃদ্‌যন্ত্রও দুর্বল ছিল। কিন্তু তারপর থেকে সে কী বিশ্বাস আর সাহস আর আনন্দ তাঁর! তিনি বললেন, শিব তাঁকে অমর বর দিয়েছেন, এরপর স্বেচ্ছায় ভিন্ন মৃত্যু নেই তাঁর। তাঁর সঙ্গে যে যেতে পেরেছি, এতে আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই আমার। এ আমার নিত্য স্মৃতি হয়ে রইল নিশ্চয়ই, এবং তিনি সত্যই শিবের কাছে আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।...তাঁর মুখে সেকথা শোনার পর থেকে আমি দারুণ দ্রুতবেগে হিন্দু হয়ে উঠেছি ভাবাদর্শে।

তাঁর দিব্যানুভূতিতে গভীরভাবে, তীব্রভাবে, আমি আনন্দিত।

কিন্তু আমার দারুণ যাতনার কথাও ভাবো, প্রিয় নেল আমার,—যাঁকে আমি পূজা করি, তিনি আমার সামনে অন্তরলোকে পূর্ণ হয়ে বিদ্যমান, অথচ আমি তো বাইরের রূপদর্শনের অতিরিক্ত কিছু পেলাম না! স্বামীজী সে অনুভূতিকে আমার কাছে জীবন্ত করতে পারতেন—কিন্তু তিনি রইলেন আত্মমগ্ন।

এখনো পর্যন্ত সেই সময়টির দিকে ফিরে চাইলে আমার হৃদয় দারুণ ক্ষোভে ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবে যায়। সে আমারই দোষ জানি, রাজাও আমাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন, এবং বিচিত্রভাবে আমি তাঁর মনের নিকটতর হয়েছি, এই তীর্থযাত্রার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞও, তবুও—প্রায় মুঠোয় পেয়ে হারানোর তিক্ত দুঃখের শেষ কোথায়—সে সৌভাগ্য হয়ত জীবনে আর আসবে না! আমার মন ক্ষোভে-রোষে আচ্ছন্ন ছিল, তিনি কথা কইতে চাইলেও আমি শুন্‌তে চাই নি।

প্রিয় নেল, আমার কেমন যেন মনে হয়, তোমার সাহসী প্রাণে সান্ত্বনার আশ্রয় আছে, তাই তোমায় বলছি,—যদি তাঁর কাছে আমি বেসুরো হয়ে না বাজতাম! যদি আমি গোটা ব্যাপারটির অংশ হয়ে উঠতে পারতাম—একটু ধৈর্য ও সহানুভূতির দ্বারা। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। একমাত্র সান্ত্বনা ক্ষতি যা, তা আমার, কিন্তু কী না ক্ষতি!

তুমি জানো কি, আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনি যদি 'গুরু' কথাটিকে বাস্তব ক'রে তুলতে না চান, তাহলে আমরা পরস্পর শুধু সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কি! এই বলে তাঁকে তিরস্কার ক'রে নিজেকে কঠোরভাবে গুটিয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু তিনি মধুরতম মনোভাবে ছিলেন—এতটুকু রাগ নয়—আমার সুখসুবিধার দিকে শুধু লক্ষ্য। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন, আমি ক্লান্ত। নিজের বিষয়ে অধিক কিছু বলতে তিনি পারছিলেন না। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে এসে তিনি বললেন,—'মার্গট, ও বস্তু তোমাকে দেওয়ার ক্ষমতা নেই—আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস নই।'

অপরূপ ! অসচেতন দীনতার চরম ।

কিন্তু তুমি জানো, এই অনিবার্য দুঃখভোগের অন্যতম কারণ আছে জাতিগত সংস্কারের মধ্যে । আমার আইরিশ স্বভাব সব কিছু প্রকাশ করে—হিন্দু সে রকম প্রকাশের কল্পনাও করে না । তার স্বামীজী গুরুগিরি সম্বন্ধে কিভাবে না সঙ্কুচিত, অপর পক্ষে আমি তাকেই সর্বদা চাইছি, ইত্যাদি, এই যথেষ্ট স্বার্থপরতা । যাই হোক্ মনে রেখো, আমি বাইরের অজস্র লোককে বলব, আমি অমরনাথে গিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে যে-কথা বললাম, তা বলব না কাউকে, এবং তুমিও, আমি দৃশ্য দর্শনে গিয়েছিলাম, এর অতিরিক্ত এই তীর্থ-যাত্রা সম্বন্ধে আসল কথা কারো কাছে ভাঙবে না ।[১]

আর একটি প্রাণখোলা চিঠিতে লিখেছেন নিবেদিতা তাঁর বান্ধবী নেল হ্যামণ্ডকে[২] :

—শিশুর মতো তাঁর কথা—জগজ্জননীর বিষয়ে ; কিন্তু তাঁর সত্তা ও স্বর—সে একেবারে ঈশ্বরের । অন্তর্ধৃত পবিত্র গাম্ভীর্য ও আনন্দ শিহরণ একই সঙ্গে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল তাঁর উপস্থিতি থেকে—এমনই তার সুমহিম রূপ যে ঘরের দূর প্রান্তে সরে গেলাম নীরবে পূজার জন্য—সর্বক্ষণ । 'তারকার জন্ম আমরা দেখেছি, আমরা জেনেছি গূঢ় অর্থের একটি প্রকাশ ।' সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখছেন—এ তেমনই এক সান্নিধ্য, যাঁর নয়ন পূর্ণ হয়ে আছে ঈশ্বরের রূপে । তাঁর কাছে এই মুহূর্তে লোককল্যাণ কর্মের চিন্তাও অসহ্য । 'শুধু মা-ই' সক্রিয়া । 'দেশপ্রেম ভুল, সব ভুল' ফিরে এসে তিনি বললেন, 'সব কিছু মা । সব মানুষই ভালো । শুধু আমরাই সকলের নিকট যেতে পারি না ।··· আমি আর শিক্ষা দেব না কখনো । আমি কে, যে শিক্ষা দেব ?'

এই মুহূর্তে নীরবতা, তপস্যা, আর প্রত্যাহারই তাঁর কাছে জীবনের মূল বস্তু এবং সে প্রত্যাহার এমনই পবিত্র যে, তাকে স্পর্শ

---

১ নিবেদিতা লোকমাতা : শঙ্করীপ্রসাদ বসু । ২—ঐ

করার চিন্তাও করা যায় না। মনে হয় তাঁকে দেখে—'জগন্মাতার সঙ্গে সজ্ঞানে অবস্থিত নয় এমন একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই।'

এই অপূর্ব গ্রীষ্মকালের দিকে ফিরে তাকাই যখন, তখন সবিস্ময়ে ভাবি, ভাবের এমন সমুচ্চ স্তরে অবস্থানের দুর্লভ সৌভাগ্য পেলাম কি করে? এই মাসগুলিতে মহান্ ধর্মীয় ভাবসমূহের আলোকধারায় সিঞ্চিত ও সঞ্জীবিত হয়েছি; আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ মানুষের চেয়ে ঈশ্বরই অধিক বাস্তব হয়েছেন। আর গতকাল সকালের শেষ কয়েক ঘণ্টা তো আমরা রুদ্ধশ্বাসে ঘনীভূত স্তব্ধ হয়েছিলাম, নড়তেও সাহস করি নি, যখন তিনি মায়ের কাছে গান গাইছিলেন, আর আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এখন তিনি শুধু ভালবাসা—ভালবাসা। অধৈর্যের বাষ্প পর্যন্ত নেই, অন্যায়কারী অত্যাচারী সম্বন্ধেও নয়,—এখন শুধু শান্তি আর ত্যাগ আর ভাবাবেশ। 'স্বামীজী আর নেই, চিরতরে বিদায় নিয়েছেন'—তাঁর শেষ কথা যা আমি শুনেছি।

(১৩. ১০. ৯৮) 'মৃত্যুরূপা কালী' কবিতাটি লেখার পর থেকে স্বামীজীর অন্তর্মুখীনতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে একদিন তিনি সকলের অজান্তে নিঃশব্দে চলে যান ক্ষীরভবানীর পবিত্র তীর্থকুণ্ডে। সেখানে আটদিন ছিলেন, যার বিষয়ে কিছু লেখা শক্ত, কারণ, তা এতই ঐশ্বরিক। সেখানে নিশ্চয় তিনি দারুণ দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এক অপরাহ্ণে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ জ্যোতির্ময়। 'মা' ছাড়া মুখে আর কথা নেই। বললেন, অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তারপর থেকে তাঁর সাক্ষাৎ প্রায় মেলেই নি। তিনি একাকী রইলেন। 'মায়ের কোলে শিশুর মত আছি'—নিজেই বললেন, কী করে আমি তোমাকে অনির্বচনীয় জিনিস বর্ণনা করব। কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকলে যা দেখতে সেই কথাই তোমাকে জানাতে চাই। আমি জানি, এগুলিকে তুমি কেবল সংবাদ বলেই নেবে না, গভীর পবিত্র বলে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করবে।

আমার নিজের মনে হচ্ছে (আমার কাছে সেইটাই বড় কথা)

স্বামীজীর মধ্যে তপস্যার বেগ এত প্রবল যে, তিনি হয়ত আর কখনই পাশ্চাত্যে যাবেন না, বা শিক্ষা দেবেন না। যদি তিনি মৌনের ব্রত নেন বা চিরতরে তপস্যার জন্য প্রস্থান করেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। কিন্তু অপরপক্ষে একথাও সত্য হতে পারে, তাঁর ক্ষেত্রে এই ভাব শক্তির উৎস নয়, বরং আত্মতৃপ্তির হেতু। সুতরাং আমি অনুমান করি, এই ভাবের উপরেও তিনি নিজেকে, উত্তোলন করে বিশ্বের কাছে জ্ঞান ও ত্রাণের বিশাল উৎস হয়ে দাঁড়াবেন। জীবন থেকে সুখের ও সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষা চলে গেছে, বেহিসেবীপনা বা অবিবেচনা অদৃশ্য, তার জায়গায় এসেছে ব্রহ্মাণ্ডের মতই বিরাট আত্মার প্রকাশ, বিক্ষত যাতনাতে, কিন্তু প্রেমে পরিপূর্ণ। যখন তিনি কথা বলেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, এই ভাবই ফুটে ওঠে। তার কিছু কিছু মুখ ফুটে বলতে গেলেও যেন বাক্যের অতীত সেই মহিমা নষ্ট হয়। অদ্ভুত কথা হল, তাঁর সামনে এখন যে ধরনের কথা অযোগ্য মনে হয় না, তা হচ্ছে কোনো রসিকতা বা মজার গল্প, যা আমাদের সকলকে হাসিয়ে দেয়। বাকি সময়ে, প্রতি মুহূর্তের ঐশী স্বরূপ আমাদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়।

আরও কিছু বলতে হবে? তাঁর শেষ কথা যা শুনেছি 'স্বামীজী আর নেই'—পুনশ্চ 'যন্ত্রণার মধ্যেও পরম আনন্দ আছে।' কারো বিরুদ্ধে রূঢ় বক্তব্য নেই। এমনই ভাববিশালতার মধ্যে যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।

পুনশ্চ তিনি বললেন, তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি 'কালী দি মাদার' কবিতার প্রতিটি শব্দের অনুধ্যান তাঁকে এবার করতে হবে। গতকাল তাঁর কথামত কবিতাটির প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে পড়তে হল তাঁর কাছে।

তিনি কথা বলে চলেছিলেন 'মার' বিষয়ে কথা, তাই তাঁর শব্দগুলি গরীয়ান্। চলে যাবার আগে মার সান্নিধ্যের স্পর্শ অনুভব করিয়ে দিয়ে তবে গেলেন। গতকাল আমি না বলে পারি নি রুদ্ধ-শ্বাসে—'ঈশ্বর'—তাঁর সম্বন্ধে।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর দর্শনে শিবভক্ত উমাভক্ত বিবেকানন্দ যেন উথ্‌লে উঠেছিলেন, রূপান্তরিত হয়েছিলেন নূতনতর উপলব্ধি ও দিব্য চেতনায়। এই রূপান্তর এবং দিব্য চেতনার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন নিবেদিতা তাঁর 'দ্য মাস্টার' গ্রন্থে। লিখেছেন :

—স্বামীজী ফিরে এসেই গাঁদা ফুলের মালা ছড়াটি নীরবে আমাদের মস্তকে একে একে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমাদের একজনের হাতে মালাটি অর্পণ করার পরে বললেন, 'এটি মাকে নিবেদন করেছিলাম।' তারপর বললেন, 'আর হরি ওঁ নয়, এখন শুধু মা, মা। হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা একেবারে নীরব। চিন্তার তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে যায় এমনি এক মহাভাবে স্থানটি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—কথা বলতে চাইলেও পারতাম না। আবার আপন মনে বলতে থাকেন, 'আমার সব দেশপ্রেম গেছে। সব গেছে। এখন শুধু—মা, মা!'

একটু থেমে আবার শোনা গেল তাঁর ভাব গদ্‌গদ কণ্ঠের উক্তি, 'আমি ভুল করেছিলাম। মা স্পষ্ট বলে দিলেন, 'যদি অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার মূর্তি নষ্ট করে, তাতে তোর কি! তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?—তাই দেশপ্রেম নিয়ে আর মাতামাতি আর নয়। আমি এখন শিশুসন্তান।'

মুণ্ডিত মস্তক, সন্ন্যাসের গেরুয়া পরিহিত, স্বামীজীর দর্শনে তাঁর ক্ষীরভবানীর তপস্যাময় রূপটি ভেসে উঠলো নিবেদিতার মানসপটে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

কল্পনানেত্রে দেখলাম—উপবাস, পূজা, কুণ্ডে পায়স ও বাদাম ভোগদান এবং জনৈক পণ্ডিতের শিশুকন্যাকে প্রতিদিন কুমারী উমারূপে পূজা। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আর কোনো কামনা নেই, শুধু ফিরে চাই সেই গঙ্গাতীরের মৌনী, নগ্ন পরিব্রাজকের জীবন। আর কিছু নয়, কিছু নয়, স্বামীজী মরে গেছেন—চিরতরে চলে গেছেন। জগৎকে শিক্ষা দেবার দায় বইব আমি? আমি কে? সবই আস্ফালন, অহঙ্কার। আমাকে মায়ের প্রয়োজন নেই, তাঁকে

প্রয়োজন আছে আমার। এ বোধ যখন জাগে, তখন কাজ মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।'

বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের ক্ষমার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজী। বলেছিলেন—প্রেমই একমাত্র উপায়। যদি কেউ আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করে, তাহলে তাকে ভালবাস, ভালবেসে যাও যে পর্যন্ত না তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

নিবেদিতার লেখায় আরো পাই, "যখন স্বামীজী দিব্যভাবে ভরপুর হয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন, তখন যে সর্বাতিশায়ী মহাপ্রাণ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল তাঁর ভেতরে, তা প্রকাশ করব ভাষায়, সে সাধ্য আমার কই ?"

গুরুর সহিত কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিবেদিতার জীবনে এনে দিয়েছিল এক বিরল সৌভাগ্য। অমরনাথ দর্শন করানোর পর সেই পরমপ্রভু অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গের কাছে নিবেদিতাকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন স্বামীজী। সেই সুযোগে, ঐ মহাতীর্থে অবস্থান করার সময়ে গুরুর এক নূতন মহিমময় রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল নিবেদিতার নয়ন সমক্ষে। দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, তাঁর এই গুরু একজন প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরনির্দিষ্ট ব্রত উদ্‌যাপনের পর গুরু যে আত্মার গভীরে ডুবে গিয়েছেন, আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছেন, এ তত্ত্বটিও এ সময়ে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল নিবেদিতার কাছে।

গুরুর জ্যোতিঃঘন সত্তার স্পর্শ লাভে ধন্য হয়েছিলেন নিবেদিতা। শুধু তাই নয়, স্বামী বিবেকানন্দের আত্মিক জীবনের ধ্রুবজ্যোতি উত্তর জীবনে তাঁকে টেনে নিয়েছিল তাঁর নির্দিষ্ট জীবনব্রত ও কর্ম-সাধনার দুরূহ পথে। বাগবাজারের ক্ষুদ্র স্কুলটি থেকে শুরু করে নিবেদিতার কর্মকাণ্ড প্রসারিত হয়েছিল সারা ভারতবর্ষে। গুরুর কৃপায় উদ্দীপিতা হয়ে সারা ভারতের মর্মমূলে অপার প্রাণশক্তির ধারা সঞ্চারিত করেছিলেন তিনি।

স্বামীজী চেয়েছিলেন, নিবেদিতা বাগবাজারে মা-সারদামণির

ঘনিষ্ঠ পরিবেশে বাস করুন। এর ফলে শ্রীমা এবং তাঁকে ঘিরে যে সব স্ত্রীভক্ত ও সেবিকারা রয়েছেন, তাঁদের স্পর্শগুণে নিবেদিতা প্রকৃত ভারতীয় জীবনধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারবেন, বিশেষ ক'রে শ্রীমার স্নেহ ও আশীর্বাদে তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন হবে ত্বরান্বিত।

স্বামী বিবেকানন্দের এ আশা সফল হয়েছিল। এখানকার পরিবেশে থাকার ফলে নিবেদিতা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ক'রে নিতে পেরেছিলেন, গণ্য হয়েছিলেন রক্ষণশীল পল্লী বাগবাজারের এক অন্তরঙ্গ সেবিকারূপে।

ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে নিষ্ঠার প্রয়োজন। তাই স্বামীজী তাঁকে নির্দেশ দেন, "তোমাকে লোকজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ একেবারে ছাড়তে হবে এবং রীতিমতো নির্জনে বাস করতে হবে। তোমার চিন্তা, প্রয়োজন, ধারণা, অভ্যাস এসব হিন্দুভাবাপন্ন হওয়া চাই। তোমার জীবন হবে ভেতরে বাইরে যথার্থ নিষ্ঠাবতী হিন্দু ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারিণীর মতো। আর এই ব্রহ্মচর্য-ব্রত সাধনের উপায় তুমি নিজে থেকেই জানতে পারবে যদি যথেষ্ট আগ্রহ থাকে। কিন্তু অতীত জীবন তোমাকে একেবারে ভুলতে হবে। এমন কি তার স্মৃতি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।"

এ নির্দেশ পালনে নিবেদিতা সক্ষম হয়েছিলেন, তবে পাশ্চাত্য জীবনের স্মৃতি ও সংস্কার গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে তাঁকে কিছুটা বিব্রত করতো বই কি।

সে-বার বাগবাজারে বলরাম ভবনে এসে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটা দিন অবস্থান করছেন। এ সময়ে নিবেদিতা প্রতিদিন বিকেলে এসে গুরুর চরণে প্রণাম জানিয়ে যেতেন, ধর্মীয় নির্দেশ ও প্রাচীন ভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুটা সময় অতিবাহিত হতো।

সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, তবুও নিবেদিতার দেখা নেই। স্বামীজী তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, আর বার বার তাঁর কথা জিজ্ঞেস করছেন সবাইকে।

নিবেদিতা যখন উপস্থিত হলেন, তখন রাত হয়ে গিয়েছে। তাঁর প্রণাম গ্রহণের পর বিরক্ত কণ্ঠে স্বামীজী প্রশ্ন করেন, "কোথায় ছিলে এতক্ষণ, বলতো ?"

নিবেদিতা দুঃখিত ও অনুতপ্ত। মৃদুকণ্ঠে জানালেন, একজন ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে শহরের কয়েকটি অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন, অনিবার্য কারণে তাঁর ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছে।

এবার তিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন স্বামীজী, "তুমি ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণ করেছো। সন্ধ্যের পর কোনো পুরুষের সঙ্গে দেখা করা তো তোমার উচিত নয়। আমার এখানে যখন আসবে, তখনো সন্ধ্যের আগেই নিজের আবাসে চলে যাবে, নিজস্ব জপ ধ্যান করবে। আর কখনো যেন এমনটি না হয়।"

নত মস্তকে নিবেদিতা গুরুকে জানালেন, "আর কখনো এমন ভুল হবে না।"

এক হস্তে ছিল গুরুর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, আর এক হস্তে ভারতীয় সাধনা দানের দাক্ষিণ্য। এরই ভেতর দিয়ে বিবেকানন্দ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর মানসপুত্রী নিবেদিতাকে।

এ প্রসঙ্গে মুক্তিপ্রাণা লিখেছেন, "ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণপূর্বক নিবেদিতা যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে জীবন পুরুষদিগের পক্ষে যেরূপ, তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ। আর সেই জীবন যাপনের জন্য নিবেদিতা কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করিতেন! তাঁহার আহার ছিল ফল ও দুধ, বহু সময়ে শুধু খাটের উপর তিনি শয়ন করিতেন। অসহ্য গরমেও তাঁহার কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা দূরে থাক, একখানি টানা পাখাও ছিল না। পাশ্চাত্য দেশের মঠগুলিতে সন্ন্যাসিনীগণ যে কঠোর জীবন যাপন করেন, নিবেদিতার কঠোরতা তাহা অপেক্ষা কম ছিলনা। স্বামীজী তাঁহাকে জোর করিয়া কোন আদেশ দিতেন না, কিন্তু সর্বদাই আদর্শটি সামনে রাখিতেন। পাশ্চাত্য জীবন ভোগসর্বস্ব, আবার নিবেদিতার মধ্যে ছিল আবেগ-পরায়ণতা। সুতরাং সময় সময় স্বামিজী দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর

সংযমের আদর্শ বর্ণনা করিয়া বলিতেন,—ভাবোচ্ছ্বাসের নামগন্ধও না রেখে আত্মানুভূতির চেষ্টা কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে বাগবাজারে নিবেদিতার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সেদিনও মঠের কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী সঙ্গে নিয়ে নিবেদিতাকে দেখতে এসেছেন।

স্বামীজীর বিদেশিনী শিষ্যা নিবেদিতার খ্যাতি তখন কলকাতায় ও সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা তাঁকে কলকাতার সুধী সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সময় পেলেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাগবাজারে নিবেদিতার গৃহে এসে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে যেতেন।

সেদিনও ঠাকুর বাড়ীর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী এবং আরও কয়েকটি ব্রাহ্ম নেতা নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে স্বামীজী হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত। নিবেদিতা তো গুরুর আকস্মিক আগমনে মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কিভাবে তাঁর অভ্যর্থনা করবেন, সেবা করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

চেয়ারে আরাম করে বসেই স্বামীজী হৃষ্ট মনে বলে ওঠেন, "নিবেদিতা, আমার জন্য এক ছিলিম তামাক সেজে আনতো। পারবে তো তুমি?"

"নিশ্চয় পারবো, স্বামীজী," উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দেন নিবেদিতা। তাঁর আনন্দ যে আর ধরে না।

স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট একজোড়া হুঁকো-কলকে সেখানে রাখা ছিল। ছিলিম সাজতেন স্বামীজীর পুরুষ-ভক্ত ও ব্রহ্মচারীরা। এবার এই সেবার অধিকারটি লাভ ক'রে নিবেদিতা যেন আনন্দে নৃত্য করছেন।

কিছুক্ষণ পরে ছিলিম তৈরী করে, কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে, নিবেদিতা বসবার ঘরে স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত। গুরুসেবার আনন্দে আর জ্বলন্ত কল্কের আগুনের আঁচে তার চোখ মুখ ঝলমল করছে।

স্বামীজী নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে নিবেদিতার হাত থেকে হুঁকোটি নিলেন, অর্ধনিমীলিত নয়নে ধূমপান করতে লাগলেন।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলারা নীরব বিস্ময়ে স্বামীজী আর তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছেন।

সেদিন নিবেদিতাকে দিয়ে ছিলিম তৈরি করার পেছনে স্বামীজীর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের একদল লোকের ধারণা ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সাহেব-মেম শিষ্যদের হাতে রাখতেন তোয়াজ করে এবং অতিরিক্ত মান-সম্ভ্রম দেখিয়ে। এ ধারণাটি যে একেবারে ভিত্তিহীন, পাশ্চাত্যের শিষ্য ও শিষ্যেরা যে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দেশ ও ধর্মের আকর্ষণেই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই স্বামীজীর সেদিনকার এই তামাকু-দৃশ্যের অবতারণা। তাছাড়া, মনস্বিনী, প্রতিভাময়ী, বৃটিশ তনয়া নিবেদিতা যে সত্য সত্যই গুরুর চরণে আত্ম-নিবেদিতা, সেই তথ্যটিও সেদিন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো সবার দৃষ্টিতে।

কলকাতার প্লেগ মহামারীর সময়ে বাগবাজার অঞ্চলের মানুষের কাছে নিবেদিতার এক নূতন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, তিনি গণ্য হয়েছিলেন দৈবপ্রেরিতা এক মহীয়সী নারী রূপে।

প্রত্যক্ষদর্শী ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর লিখেছেন, 'এই সঙ্কট সময়ে বাগবাজার পল্লীর প্রতি বস্তিতে ভগিনী নিবেদিতার করুণাময়ী মূর্তি লক্ষিত হইত। আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি অপরকে সাহায্য দান করিতেন। একবার একজন রোগীর ঔষধপথ্যাদির ব্যয় নির্বাহার্থে তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুগ্ধপান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন দুগ্ধ ও ফলমূলই ছিল তাঁহার আহার।'

স্বামী সদানন্দ ছিলেন এই ত্রাণকর্মের প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্মী। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন নিবেদিতা।

রাস্তা পরিদর্শন করতে এসে নিবেদিতা একদিন দেখেন, ধাঙড়েরা পালিয়েছে, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধে চারদিক ভরে গেছে। এ দেখে তিনি নিজেই ঝাড়ু হস্তে নিয়ে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে তখনি লেগে পড়েন। এ দেখে পাড়ার ছেলেরা লজ্জিত হয়ে ওঠে, রাস্তা পরিষ্কার করার কাজ তারা নিজেরাই শুরু করে দেয়।

মারাত্মক প্লেগ রোগের ভয় উপেক্ষা করে, কি সাহস ও ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে নিবেদিতা রোগীর শুশ্রূষা করতেন, তার প্রাণস্পর্শী বিবরণ আমরা ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের লেখায় পাই :

'১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগ সংহাররূপে দেখা দেয়। পূর্ববৎসর তাহার আবির্ভাব সূচনায়, বিধিব্যবস্থার বিভীষিকা ভয়ে ভীত জনগণ শহর হইতে পলায়ন করে। এই বৎসর ছোটলাট সার জন উডবার্ন আশ্বাস দেন, কোন রোগীকে বলপূর্বক গৃহান্তরিত করা হইবে না।... সেই সময়ে একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলি ধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা ; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন।

'সেই দিন প্রাতে বাগবাজারে কোন এক বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন। আমি বলিলাম—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। বাগদীবস্তিতে কিরূপে বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা সম্ভব, তাহার আলোচনা ইত্যাদি করিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ সাবধান হইতে বলিলাম। অপরাহ্নে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-জীর্ণ কুটিরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটিরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও

তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুইদিন পরে শিশুটি এই করুণাময়ীর স্নেহতপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।'

নিবেদিতার চরম আত্ম-উৎসর্গের এই ভাবমূর্তিটি দিন দিন ভাস্বর হয়ে উঠছিল কলকাতার অধিবাসীদের দৃষ্টিতে।

ব্রহ্মচর্য ব্রত ধারণের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সাধ্যমতো নিবেদিতা এ ব্রত পালনও ক'রে আসছেন। এবার মনে তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করবেন। স্বামীজী কি তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন না?

১৯০১ সাল। স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে অসুস্থ হয়ে রয়েছেন। নিবেদিতা একদিন গুরুকে দর্শন করতে গেলেন। কথাপ্রসঙ্গে নিবেদন করলেন, "স্বামীজী, সন্ন্যাস জীবনের যোগ্যতা লাভের জন্য এরপর আমায় কি করতে হবে?"

"তুমি যেমন আছো, তেমনি থাকো," সংক্ষেপে মন্তব্য করেন স্বামীজী, নয়ন দুটি মুদিত করে ডুবে যান নিজের মধ্যে। তারপর এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথাই তাঁকে বলতে শোনা গেল না।

নিবেদিতা প্রাণে পেলেন দারুণ আঘাত। বহুল আকাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস-ব্রত আর হয়তো তাঁর উদ্‌যাপন করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, তিনি যে জানেন, স্বামীজী অতিশয় দৃঢ়চেতা পুরুষ, একবার যে সিদ্ধান্ত স্থির করেন, সহসা তার নড়চড় হয় না।

আশিস্‌পূত প্রিয় শিষ্যার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রটি কি সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের মানসপটে ফুটে উঠেছিল? তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, নিবেদিতা সর্ব সংস্কার-দগ্ধীকৃত সন্ন্যাসের পবিত্র দায়িত্ব বহন করতে পারবেন না? নিবেদিতার দ্বৈতসত্তা, বিশেষ ক'রে তাঁর উত্তর জীবনের রাজনীতি-মুখীনতা তাঁকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মূল ভাবধারা থেকে, মঠ ও মণ্ডলী থেকে, দূরে সরিয়ে নেবে—এ তথ্যটি কি পূর্বাহ্নেই ভেসে উঠেছিল স্বামীজীর প্রজ্ঞানময় দৃষ্টিতে?

১৯০২ সাল। স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানতন্ময়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। মহাকর্মী, মহাবেদান্তী, এবার পরিণত হয়েছেন মহামায়ার কোলের এক শিশুরূপে। নিবেদিতা সেদিন বেলুড় মঠে গিয়েছেন, স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকটি সমস্যার কথা তাঁকে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু সেই শক্তিধর আচার্য যেন আর নেই, জাগতিক সমস্ত কিছু কর্ম ও চিন্তাভাবনা থেকে মনকে তিনি একেবারে উঠিয়ে নিয়েছেন।

শিষ্যার দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে স্বামীজী সেদিন বলেন, "আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, নিবেদিতা। একটা মহা তপস্যা আর ধ্যানের ভাব আমায় আশ্রয় করেছে।"

বড় আচম্বিত, বড় রূঢ়—আসন্ন বিচ্ছেদের এই সংবাদ। মর্মাহত হয়ে নিষ্পলক নেত্রে গুরুর দিকে তাকিয়ে থাকেন নিবেদিতা। স্বামীজী আরো কয়েক বৎসর বেঁচে থাকবেন, তাঁকে পরমাশ্রয় দিয়ে ঘিরে রাখবেন, এই আশাই ছিল নিবেদিতার মনে। এবার বুঝলেন তা হবার নয়। সূর্য এবার অস্তাচলমুখী।

সেদিন ছিল একাদশী। স্বামীজী নিজে কিছু আহার করেন নি, কিন্তু মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মানসপুত্রী নিবেদিতাকে খাওয়ানোর জন্য। নিবেদিতার আহার শেষ হলো, পরম স্নেহে তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন স্বামীজী। যত্ন ক'রে তোয়ালে দিয়ে নিজে তাঁর হাত মুছিয়েও দিলেন।

নিবেদিতা প্রতিবাদ জানান, "স্বামীজী, এ আপনি কি করছেন? আমারই যে প্রয়োজন আপনাকে সেবা করা।"

"জানতো, যিশু তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন," প্রশান্ত স্বরে উত্তর দেন স্বামীজী।

নিবেদিতা বলতে যাচ্ছিলেন, "সে তো তাঁর অন্তিম কালে--" কিন্তু কথাটি উচ্চারণ করার মতো সামর্থ্য আর তাঁর রইলো না।

দুদিন বাদেই প্রত্যূষে নিবেদিতার ভবনের দ্বারে এসে করাঘাত করেন বেলুড় মঠের এক ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মানন্দজী সংবাদ পাঠিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহজগতে নেই।

স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নিবেদিতা, তারপর উপস্থিত হন বেলুড় মঠে। তাঁর রাজার, তাঁর অধ্যাত্মপিতার প্রাণহীন দেহ শয্যায় পড়ে রয়েছে। নিঃশব্দে তাঁর পাশে গিয়ে বসেন নিবেদিতা, একটি হাত পাখা নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো বাতাস করতে থাকেন। নয়নে তাঁর একবিন্দু অশ্রুও নেই, দুঃসহ শোকের বজ্রাঘাতে অশ্রুর উৎসও সেদিন বুঝি শুকিয়ে গেছে।

নব গৈরিক বস্ত্রে আর রাশি রাশি পুষ্পমালায় সাজিয়ে, আরতি করে, স্বামী বিবেকানন্দের দেহ গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হলো। অগণিত ভক্তের নয়ন সমক্ষে অগ্নিতে তা হলো ভস্মসাৎ।

'স্বামীজীর গৈরিক বস্ত্রের একটি টুকরো যদি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাখা যেত !'—চিতার পাশে বসে ভাবছিলেন নিবেদিতা। ভাবনার ফল ফললো অচিরে। কে যেন তাঁর আস্তিন ধরে টানলো। তাকিয়ে দেখলেন, জ্বলন্ত চিতা থেকে হাওয়ায় উড়ে গৈরিক বাসের একটি ছিন্ন খণ্ড এসে পড়েছে তাঁর পাশে। সাগ্রহে তখনি সেটি কুড়িয়ে নিলেন নিবেদিতা।

গুরুর তিরোধানের পরে, নিবেদিতার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে, প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর দ্বৈত সত্তা। একটিতে দেখি তাঁকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা রূপে, শ্রীমা সারদামণির 'খুকী' রূপে। শ্রীমা ও তাঁর ভক্ত সঙ্গিনী গোপালের মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতির স্নেহাশিস্ পেয়ে, মধুর সান্নিধ্য পেয়ে, সত্যকার ভারতীয় সাধনা ও আধ্যাত্মিক ধারায় নিরন্তর তিনি অভিসিঞ্চিত হচ্ছেন।

এই সঙ্গে দেখতে পাই নিবেদিতার ব্যক্তিসত্তার আর এক ভাস্বর রূপ, শৌর্যময়ী রূপ। সেখানে ভারতমন্ত্রে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, জাতির উজ্জীবন-শক্তিরূপিণী হয়ে, দশপ্রহরণধারিণীর মতো, ভারতের দিকে দিকে, ইউরোপে আমেরিকায়, শিখাময়ী হয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

শ্রীমা সারদামণি বলতেন ভক্তদের, "নিবেদিতার সরলতা, বিশ্বাস

ও গুরুভক্তির তুলনা নেই। ও হচ্ছে বিদেশী ফুল, নরেন ওকে এনেছে ঠাকুরের পূজোয় লাগবে বলে।"

নিবেদিতাও শ্রীমার পবিত্র সঙ্গের জন্য, তাঁর সেবার জন্য, দিনের পর দিন উন্মুখ হয়ে থাকতেন। অবসর পেলেই ছুটে যেতেন তাঁর শান্তিময় সান্নিধ্যে।

মা-সারদামণি সম্পর্কে নিবেদিতা বলতেন, ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা হচ্ছেন—তিনিই। অথচ স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের কিছুদিন পরে এই শ্রীমা-ই যেদিন তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন, সেদিন নিবেদিতা তা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। বলা বাহুল্য, এ সিদ্ধান্তটি তাঁকে নিতে হয়েছিল গুরু বিবেকানন্দের প্রতি একৈকনিষ্ঠার জন্য।

সেদিন বিকেলবেলায় নিবেদিতা মা-সারদামণির কাছে গিয়েছেন। মা বললেন, "খুকী, কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি—তুমি গেরুয়া পরে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছো। নরেন চলে গিয়েছে, তোমায় সে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়ে যেতে পারে নি। তা হলে, তুমি কি আমার কাছে সন্ন্যাস নেবে?"

শান্ত স্বরে নিবেদিতা জানান, "নূতন ক'রে আর সন্ন্যাস নেবো না, মা। স্বামীজী আমায় যা দিয়ে গিয়েছেন, তাই হবে আমার এই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল। শিবের মন্ত্র তাঁর কাছে আমি পেয়েছি, তাই তো শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মন্ত্র।"

"দ্যাখো, দ্যাখো, খুকীর কি অসীম গুরুভক্তি!" সবার কাছে নিবেদিতার সুখ্যাতি করতে থাকেন সারদামণি।

সিদ্ধা সাধিকা গোপালের মাকে নিবেদিতা দেখতেন নিজের ঠাকুমার মতো। নিবেদিতার আগ্রহে ও শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়ে গোপালের মা'র মতো নিষ্ঠাবতী বৃদ্ধ বিধবাকে শেষ জীবনে নিবেদিতার সেবা গ্রহণ করতে হয়েছিল বৎসরের পর বৎসর। নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে থাকতেই গঙ্গাতীরে তাঁর অন্তর্জলী করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর 'দেবী অঘোরমণি' গ্রন্থে শ্রীমা'র বাস-ভবনের পুণ্যময় পরিবেশের এক রম্য চিত্র এঁকেছেন। এতে নিবেদিতার এক মধুর মূর্তি ফুটে উঠেছে :

'২।১ বাগবাজার স্ট্রীটের উপর শ্রীমা'র ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতি বৈকালে এক বিরাট আনন্দের হাট ঠাকুরঘরেই বসিত। মা স্বয়ং উপস্থিত। চতুর্দিক হইতে বাবুরাম মহারাজের মা, বলরাম-গৃহিণী, যোগীন মা, গোলাপ মা, অসীমের মা, মেনীর মা, মাষ্টারমশাইর গৃহিণী, গৌর মা প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা ভক্তবৃন্দ পরস্পর মিলিতেন। অঘোরমণিকেও মধ্যে মধ্যে ইহার ভিতর একজন প্রধানারূপে দেখা যাইত। নিবেদিতাও তাঁহার নিকটবর্তী স্কুলবাটী হইতে এই আসরে যোগদান করিতেন।

'একসময় কয়েকদিন উপরি উপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম পবিত্রাত্মা লক্ষ্মীমণি দেবী সকলকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছিলেন। ...গোলাপ মা তাঁহার জামাতা পাথুরিয়াঘাটার রাজা সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি হইতে নানারূপ পিতলের গহনা—বালা, হার, অনন্ত, বাজু, রূপার পাইজোর প্রভৃতি যোগাড় করিয়া সুন্দর নববস্ত্রে লক্ষ্মীমণিকে বৃন্দের ভূমিকায় সুসজ্জিতা করিতেন। লক্ষ্মীদেবী বাল-বিধবা, তাঁহাকে এমনই দেখিতে সোনার গৌরীর মতো, কোন অলঙ্কার আভরণের প্রয়োজন ছিল না, তবু বৃন্দের ভাবটি স্পষ্ট ও চাক্ষুষ করিবার জন্য ঐ সজ্জা। তিনি চমৎকার নকল করিতে পারিতেন। গলাও মিষ্ট। অসম্ভব রকমের স্মরণশক্তি ছিল। পালাকে পালা এক একদিন দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া লক্ষ্মীদেবী গাহিতেন।

'নিবেদিতা রামপ্রসাদের গান শুনিতে বিশেষ ভালবাসিতেন। বাংলা কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। রামপ্রসাদী শুনিবার জন্য তাঁহাকে পালার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইত। কীর্তন শেষ হইয়া গেলে লক্ষ্মীদেবী ফরমাস-মাফিক প্রসাদী সুর ধরিতেন।

'নিবেদিতা বালিকার ন্যায় আমোদ ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। একদিন তিনি থাবা গাড়িয়া মেঝেতে চতুষ্পদ সিংহ হইয়া গেলেন

এবং পিঠের উপরে লক্ষ্মীদেবীকে চাপাইয়া জগদ্ধাত্রী বানাইলেন। মুখে ঠিক সিংহের মতো তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য সকলে হাসিয়া লুটোপুটি।

'ইহা ছাড়া মালকোঁচা বাঁধিয়া বলরামের নৃত্যানুকরণেও লক্ষ্মীদেবীকে চমৎকার মানাইত।'

আনন্দময়ী লক্ষ্মীদেবীকে নিবেদিতা ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা জানাতেন প্রবীণা সাধিকা গোপালের মা'কে। আর পূজা করতেন সঙ্ঘমাতা ও অধ্যাত্ম-সাধনার উৎস শ্রীমা সারদামণিকে।

লক্ষ্মীদিদি যে জীবন্মুক্ত—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তা নিজ মুখে এক সময়ে বলে গিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মিস্ ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন তাঁর এক চিঠিতে—"সেদিন রাত্রে লক্ষ্মীদিদি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে (লক্ষ্মীদিদির বিষয়ে) কী কথা বলেছিলেন জানালেন, 'তুই এখনই অপর পারে—জীবন্মুক্ত।' লক্ষ্মীদিদি সকল কিছু সুখদুঃখের অতীত। তাঁর কাছে এ সবই খেলা। কিছুই স্পর্শ করে না তাঁকে। এ সমস্ত কথাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য—কিন্তু কী অদ্ভুত লাগল তাঁর নিজ মুখ থেকে শুনতে। অথচ তিনি একেবারে অহংশূন্য।"

নিবেদিতার দ্বৈতসত্তার সংগ্রামকুশলা ও দীপ্তিময়ী রূপটি আমরা দেখি তাঁর ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিরাট কর্মক্ষেত্রে। ভারতের প্রাণশক্তি ও ধর্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবনের জন্য তাঁর প্রয়াসের যেন বিরতি নেই, তাঁর শক্তি-বিচ্ছুরণের যেন অবধি নেই।

তাই দেখি, দেশের মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা দিচ্ছেন নিবেদিতা। অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় কলাশিল্পের নব নব সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন তিনি। জাপানী শিল্পী ওকাকুরাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন; নন্দলাল প্রভৃতি তরুণ শিল্পীদের পাঠাচ্ছেন অজন্তার চিত্রের অনুলিপি আনতে। মডার্ন রিভিউ-তে ভারতীয় শিল্পকলার জয়গানে ও বিদগ্ধ সমালোচনায় তিনি মুখর।

ডঃ দীনেশ সেন ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন,

নিবেদিতা রাত জেগে তার সম্পাদনা করছেন, নূতন করে কতো অংশ নিজেই লিখে দিচ্ছেন।

বিজ্ঞানী ডঃ জগদীশ বসু হয়েছেন তাঁর 'খোকা'—তাঁর মানসপুত্র। উদ্ভিদের প্রাণস্পন্দন ডঃ বসু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে প্রমাণ করেছেন। তাঁর আশা, সব জড় বস্তুরই যে প্রাণ আছে, তাও অচিরে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন। শুনে নিবেদিতার আনন্দের অবধি নেই। তবে তো আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা বেদান্তের তত্ত্বই হবে সমর্থিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় বেদান্ত বলে আসছে—এই বিশ্বসৃষ্টি জড় নয়, প্রাণময় এবং চৈতন্যময়।

ডঃ বসুর বিজ্ঞান প্রবন্ধের সম্পাদনা করতে, আর তাঁর বিদেশ সফরের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজেও এগিয়ে আসতে দেখছি অফুরন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন নিবেদিতাকে।

ভারতীয় কংগ্রেসের নেতাদের, গোখলে থেকে তিলক অরবিন্দ অবধি, সবাইর চোখে নিবেদিতার পরামর্শ ও নিবেদিতার লেখনীর সাহায্য মহামূল্যবান।

বালগঙ্গাধর তিলকের অগ্নিক্ষরা লেখায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পুণার চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দুজন ইংরেজ অফিসারকে নিহত করেন, বিচারে তাঁদের ফাঁসী হয়। এই দুই বীর শহিদের জননীকে, পুণায় গিয়ে, শ্রদ্ধা জানান নিবেদিতা। তাঁকে বলে আসেন, "আপনি ধন্যা, বীরপ্রসবিনী। নিজ পুত্র দুটিকে হারিয়েছেন বটে, কিন্তু তার বদলে পুত্ররূপে পেয়েছেন গোটা ভারতের মুক্তিকামী বীর তরুণদের।"

সারা ভারতের দিকে দিকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন নিবেদিতা। বরোদায় গিয়ে অরবিন্দকে বলছেন, "আপনি এখানে বসে কেন? আপনার স্থান বাংলার বিপ্লব ঝটিকার কেন্দ্রে।"

আবার এই সঙ্গে বাংলার যুবক বিপ্লবীদের মুক্তিসংগ্রামে অজস্র প্রেরণা তিনি দিয়ে চলেছেন, কখনো বা সাক্ষাৎভাবে করছেন তাদের পরিচালনা। জাতীয় জীবনের পাহাড়চূড়ায়, কোথায় কোন্ দিকে, নিবেদিতা সিংহিনীর মতো দৃপ্তভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নেই?

প্রতিভাময়ী নিবেদিতা, শিখাময়ী নিবেদিতা, এবং লোকমাতা নিবেদিতা তাঁর রূপে ও গুণে সে সময়ে ধাঁধিয়ে দিয়েছেন সবাকার নয়ন। দেশপ্রেমিক ও বিদগ্ধ ভারতীয় মাত্রেই নিবেদিতার ভাব-ঐশ্বর্য এবং দিব্যোজ্জ্বল অমানবীয় রূপের ছটায় অভিভূত। এ প্রসঙ্গে ভারতের অদ্বিতীয় কলাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি আমরা উদ্ধৃত করছি ঃ

"...আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাষ্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। সেদিন একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। কতো বড় বড় রাজারাজড়া, সাহেব মেম গিসগিস করছে। অভিজাত বংশের বড় ঘরের মেম সব। কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধবারই কত কায়দা ; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাসানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব—যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেয়েরা সব তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কানাকানি করতে লাগল। উড্রফ, ব্লাণ্ট এসে বললে, 'কে এ ?' তাঁদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।

"সুন্দরী—সুন্দরী কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।

"নিবেদিতা মারা যাবার পর একটি ফটো গণেন মহারাজকে দিয়ে যোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মত আর্টিষ্টিক নজর বড় কারো ছিল না—আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল—সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন

আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, 'এ কার ছবি ?' বললুম, 'সিস্টার নিবেদিতার।' তিনি বললেন, 'এই সিস্টার নিবেদিতা ? আমার একখানি এই রকম ছবি চাই।' বলেই আর বলা-কওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা ক'রে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে, সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয়, তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত!"

স্বামীজীর ভারতমন্ত্রে উদ্বোধিতা হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিতা। ভারতের মুক্তি ও ধর্মসংস্কৃতির উজ্জীবনের যে মহান্ স্বপ্ন দেখতেন স্বামীজী, তাকে রূপ দেবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন তাঁর এই শিষ্যা। রাজনীতির আবর্তে, আর এজন্য এমনকি চরমপন্থী সহিংস রাজনীতির আবর্তেও, নিজেকে অবলীলায় তিনি টেনে আনেন।

এক্ষেত্রে রাজনীতির গণ্ডীবহির্ভূত, স্বামীজীর গঠিত, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্ভুক্ত থাকা আর তাঁর পক্ষে সঙ্গত নয়, সম্ভবও নয়। তাই মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেদিন ডাকিয়ে আনান নিবেদিতাকে, মঠের সদস্যপদ থেকে তাঁকে ইস্তফা দিতে বলেন।

মঠাধ্যক্ষের এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝতে নিবেদিতার দেরি হয় নি, তৎক্ষণাৎ তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে অপসারিত ক'রে নিলেন মঠ থেকে। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ক'রে তিনি জানালেন,—মঠ স্বামীজীর সুযোগ্য গুরুভ্রাতাদের দ্বারা চালিত হচ্ছে, একথা তিনি আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে মঠ থেকে সরিয়ে নিলেও, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করতে, তাঁদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে, ভবিষ্যতে কোনোদিনই তিনি পশ্চাদ্‌পদ হবেন না।

ভারতে রাজনৈতিক ও ধর্ম-সংস্কৃতির মঞ্চে নিবেদিতার মর্যাদা ও নেতৃত্ব তখন তুঙ্গে অবস্থিত। কুটিল প্রকৃতির এক শ্রেণীর দেশনেতা

আশা করেছিলেন, নিবেদিতা ও রামকৃষ্ণ মিশনের এই আকস্মিক বিচ্ছেদ পরিণত হবে তীব্র সংঘর্ষে এবং তাঁরা তখন কৌতুক দেখবেন। নিবেদিতা তাঁদের সে সাধে সেদিন বাদ সাধলেন। গুরুর আত্মার ধ্রুবজ্যোতিকে নয়ন সমক্ষে নিবদ্ধ রেখে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে তিনি সরে দাঁড়ালেন। দেখা গেল, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মহান সৃষ্টি নিবেদিতার আর এক মহিমময়ী রূপ!

প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে এবং দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন নিবেদিতা। অগ্নিবর্ষী অজস্র লেখা[১] ও বাগ্মিতার কঠোর শ্রম তো রয়েছেই, তদুপরি চলছে জ্বলন্ত উল্কার মতো দেশে বিদেশে পরিক্রমা। এ সবের ফলে তাঁর দৃঢ় স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হয়ে যায়। বন্ধুরা সবাই অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

১৯১১ সালের প্রথম ভাগ। বরাবরকার মতো সেবারও ব্যবস্থা হয়েছে, নিবেদিতা ডঃ জগদীশ বসু ও অবলা বসুর সঙ্গে দার্জিলিঙে যাবেন। কিছুদিনের জন্য একটানা পূর্ণ বিশ্রাম এবার তাঁর দরকার, নইলে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আর কোনো আশা নেই।

নিবেদিতার মনপ্রাণ সারা সত্তা এ সময়ে ক্লান্তিতে দুর্বলতায় মুহ্যমান। তাছাড়া, চির বিদায়ের ছবিটিও বার বার ভেসে উঠতে থাকে তাঁর মনে। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ জাগে,—হায়, কত কিছু তাঁর করার ছিল স্বামীজীর ধ্যানের ভারতের উজ্জীবনে। আর তা বুঝি সম্ভব হলো না।

দার্জিলিঙ রওনা হবার আগে বাগবাজারে উদ্বোধন ভবনে যাঁরা তখন অবস্থান করছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নিবেদিতা। যোগীন-মাকে প্রণাম করে আপন মনে তিনি বলে ওঠেন, "যোগীন-মা, মনে হচ্ছে, এই আমার শেষ দেখা।"

---

১ নিবেদিতার লিখিত কল্যাণকর গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রধান: দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম্; ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ, নোট্স অব সাম্ ওয়ানডারিংস, ফুট্‌ফলস্ অব হিস্টরি, ইত্যাদি।

"না—না, এ অলক্ষুনে কথা বলতে নেই, নিবেদিতা," যোগীন-মা ব্যথিতা হয়ে বলেন।

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—এই শেষ।"

দার্জিলিঙে যাবার পর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, মারাত্মক পার্বত্য আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন নিবেদিতা।

নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার নীলরতন সরকার তখন দার্জিলিঙে উপস্থিত। সংবাদ পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন। তাঁর এবং বসুদম্পতির চেষ্টায় চিকিৎসা ও সেবার সকল কিছু সুব্যবস্থাই করা হয়। কিন্তু নিবেদিতা দ্রুত এগিয়ে চলেন মহাপ্রয়াণের পথে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর। সকাল তখন সাতটা। চির-বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে, অন্তর্লীন অবস্থায়, অস্ফুটস্বরে ইংরেজীতে যা বল্‌লেন নিবেদিতা, তার মর্ম: "নৌকো ডুব্‌ছে। কিন্তু আমি জ্যোতির্ময় সূর্যের উদয় এবার দর্শন করবো।"

একটা দিব্য জ্যোতির আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল। সেবক সেবিকারা চমকে ওঠেন এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করে।

"তুমি যা কিছু করো, যেখানে থাকো, আমি তোমার পাশে আছি এবং থাকবো—হ্যাঁ হাতীকা দাঁত—মরদ কি বাত," জীবিত থাকতে বার বার নিবেদিতাকে আশ্বাস দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। এবার প্রিয় শিষ্যার, প্রিয় মানসতনয়ার, মরদেহ ত্যাগ করার সময়েও গুরু তাঁর সেকথা কি রক্ষা করেছিলেন? এগিয়ে এসেছিলেন কি তাঁকে বিদেহমুক্তি দিতে? শেষ লগ্নে নিবেদিতার আননের জ্যোতির্ময় দীপ্তি সেই ইঙ্গিতই সেদিন বহন করে এনেছিল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর আত্মাহুতির পরম সার্থকতা। দিব্যলোকে, রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে, ঘটেছিল তাঁর উত্তরণ।
